দিব্য জীবন বার্ত্তা

প্রথম খণ্ড

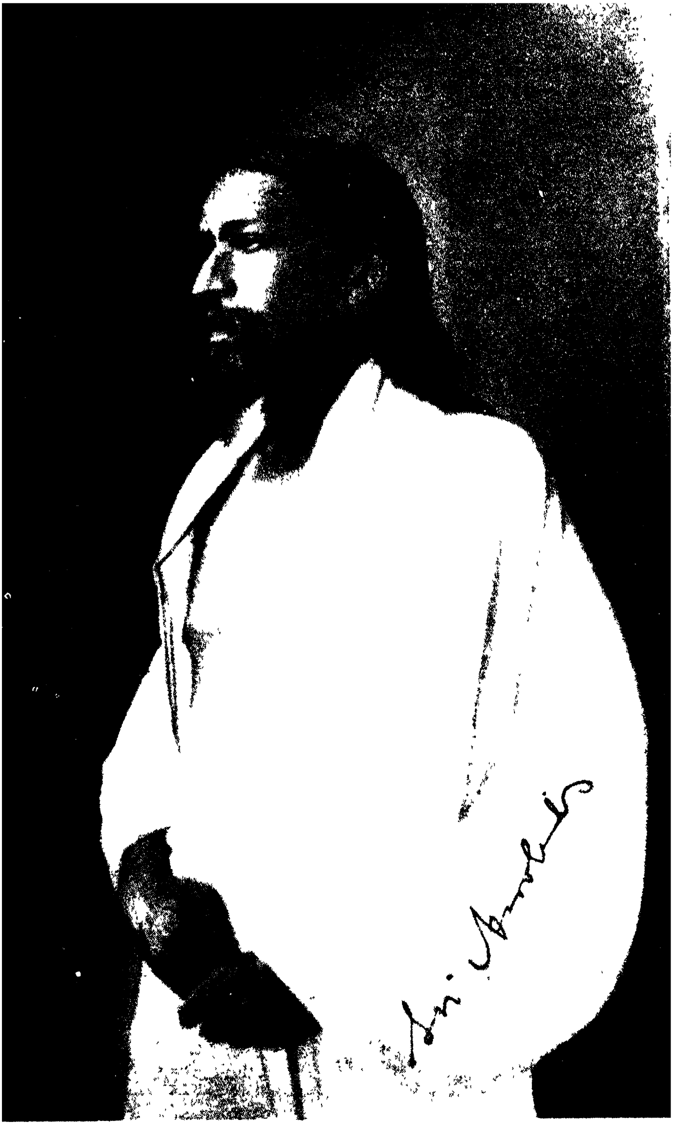
সর্ব্বগত ব্রহ্ম এবং বিশ্ব

শ্রীঅরবিন্দ

প্রকাশক—
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ
১৯৫৩

৩৮নং শিবনারায়ণ দাস লেনস্থ
রতিকান্ত ঘোষ দ্বারা
ঘোষ মেসিন প্রেসে
১ হইতে ৬৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত
এবং বাকি সমস্ত
লক্ষ্মীসরস্বতী প্রেসে
২০৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬
রামকৃষ্ণ পান দ্বারা মুদ্রিত।
বাঁধিয়েছেন
৮।২, ভবানী দত্ত লেনস্থ
ন্যাশনাল বাইণ্ডার্স কলিকাতা।



SRI AUROBINDO

অনুবাদকের নিবেদন

দিব্য জীবন বার্ত্তা (১ম খণ্ড) শ্রীঅরবিন্দের Life Divine (vol I) গ্রন্থের মর্ম্মানুবাদ, আক্ষরিক অনুবাদ নহে। প্রথমে মনে করিয়াছিলাম একটু সংক্ষেপে প্রতি অধ্যায়ে শ্রীঅরবিন্দ যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম যতটুকু বুঝিয়াছি তাহাই বলিব। সেইজন্য প্রথম দুই তিন অধ্যায়ে মূল হইতে অল্প কিছু বাদ দিয়াছি, কিন্তু পরে মনে হইল, সেরূপ করিলে শ্রীঅরবিন্দের কথা স্পষ্টরূপে প্রকাশ: করিবার পক্ষে বাধা হইবে, কারণ অপ্রয়োজনীয় কোন কথাই তিনি বলেন নাই। তারপরে যতদূর পারিয়াছি মূলে যাহা আছে তাহার সকল ভাব রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এ অতি কঠিন কার্য্যে কতদূর সফলকাম হইয়াছি তাহা সুধীগণের বিচার্য্য।

শ্রীঅনির্ব্বাণ কৃত অতি সুন্দর অনুবাদ থাকিতে কেন এ দুরূহ কার্য্যে আমি হস্তক্ষেপ করিয়াছি তাহার একটা কৈফিয়ৎ দিতে চাই। সে অনুবাদের অতি উচ্চাঙ্গের ভাষা মাধুর্য্য ও কবিত্বময়, ওজোগুণ সম্পন্ন ওরূপ বৈশিষ্ট-পূর্ণ ভাষা আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাই আমি মনে করি শ্রীঅনির্ব্বাণের 'দিব্য জীবন' বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থের অন্যতম। কিন্তু তৎসত্বেও তাহাতে বাঙ্গালা ভাষাতে সাধারণতঃ চলিত নাই, সংস্কৃত শাস্ত্রের তাঁহার নিজের বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডার হইতে, তেমন কথা এত অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছেন যে সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে গ্রন্থখানা অতি দুরূহ হইয়াছে। যাঁহারা ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ এমন অনেকেও Life Divine পড়িয়া ভালভাবে বুঝিতে পারেন না। অথচ তাহাতে যে অমৃতময় ভাবধারার প্রবাহ আছে, যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রায় সকল দর্শন ও সাধন পথের সমন্বয় ও সামঞ্জস্য আছে, যে পরম আশা ও আশ্বাসের বাণীর সাক্ষাৎ তাহাতে পাওয়া যায়, তাহা আর কোথাও তেমন ভাবে আছে বলিয়া আমি জানি না বা বিশ্বাসও করি না। এই অমূল্য সম্পদ সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের হাতে তুলিয়া দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা

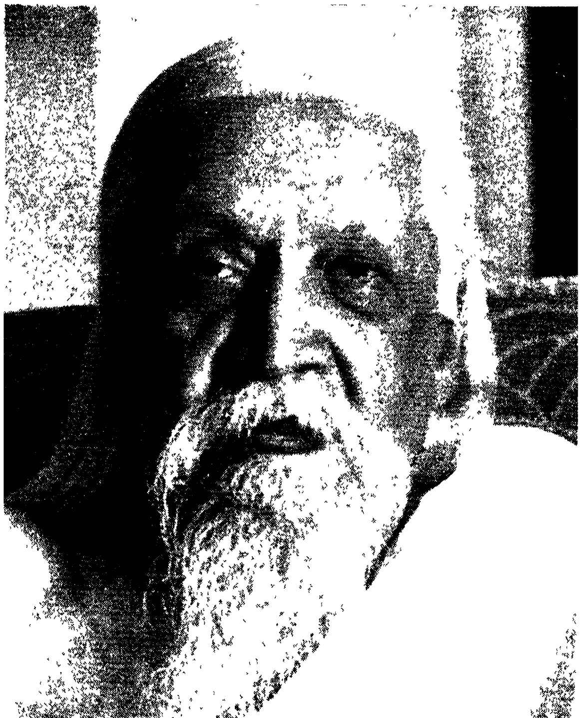
আমাকে মাঝে মাঝে আকুল করিত। এমন সময় অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য ভাষায় Life Divineএর একটা অনুবাদ করিতে আমি অনুরুদ্ধ হই। নিজের অযোগ্যতা এবং অপটুতার স্পষ্ট জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও এই প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া পারি নাই। কার্য্যারম্ভ করিয়া শ্রীশ্রীমার নিকট আমার সঙ্কল্পের কথা জানাই এবং তাঁহার অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি। তাহার পর প্রায় একবৎসরব্যাপী যত্ন ও চেষ্টার ফলে মূল সম্বন্ধে আমি যাহা বুঝিয়াছি এবং ভাষায় তাহার যে রূপ দিবার প্রয়াস পাইয়াছি, তাহা পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিতেছি। যাঁহারা ইংরাজী জানেন না অথবা যাহা জানেন তাহার সাহায্যে Life Divine বুঝিতে পারেন না তাঁহাদের পক্ষে শ্রীঅরবিন্দের ভাবধারা বুঝিতে ইহা কথঞ্চিৎ সাহায্য করিলেও আমার শ্রম সার্থক মনে করিব।

এই অনুবাদ কার্য্যে যে সমস্ত বন্ধু আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন এবং যাঁহারা মুদ্রাঙ্কনের ব্যয় নির্ব্বাহে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

অবশেষে সানন্দ চিত্তে জানাইতেছি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত এই বইএর আদ্যোপান্ত পড়িয়া ও সংশোধন করিয়া দিয়া আমাকে অশেষ কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। ইতি—

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু।

সূচীপত্র



SRI AUROBINDO

প্রথম অধ্যায়

মানুষের আস্পৃহা

যে সমস্ত উষা অনন্তকাল ধরিয়া পরপর আসিতেছেন তাহাদের প্রথমা এই উষাও সেই লক্ষ্য অনুসরণ করিয়া চলিতেছেন, যে লক্ষ্য ধরিয়া পূর্ব্ববর্ত্তিনী উষাসকল বিশ্বাতীত সত্তাতে মিলিয়া যাইতেছেন; এই উষা আত্মবিস্তার করিতেছেন, যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহাদিগকে ফুটাইয়া তুলিতেছেন, মরিয়াছিল এমন কাহাকেও জাগাইয়া দিতেছেন।······কি তাহার লক্ষ্য যখন তিনি সামঞ্জস্য বিধান করেন সেই সমস্ত উষার সঙ্গে পূর্ব্বে যাহারা দীপ্তিমন্ত ছিলেন এবং এখন যাহারা দীপ্তিমন্ত হইবেন? পুরাতন উষাদের জন্য তিনি ব্যাকুলা এবং তাহাদের আলোককে পরিপূর্ণ করিয়া তোলেন; তাহার দিব্যপ্রভা সম্মুখের দিকে বিস্তৃত করিয়া যোগস্থাপন করেন বাকী সেই সমস্ত উষার সঙ্গে যাহারা পরে আসিবেন। কুৎস আঙ্গিরস—ঋগ্বেদ (১।১১৩।৮, ১০)

বিশ্বে এই যে দিব্যশক্তি তাহার দিব্যজন্ম বা আবির্ভাব তিন ধারায় ঘটে—তাহারা সত্য, তাহারা কাম্য। অনন্তের মধ্যে বিস্তারলাভ করিয়া তিনি চলেন প্রকাশ্যে; তাহার দীপ্তি পবিত্র ও আলোকময় এবং সব কিছুকে পরিপূর্ণ করিয়া তোলে।······ মর্ত্ত্যের মধ্যে যিনি অমৃত এবং যিনি সত্যকে পাইয়াছেন, তিনি দেবতা, তিনি বীর্য্যরূপে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আমাদের মধ্যস্থিত দিব্য শক্তিসমূহকে ফুটাইয়া তুলিতেছেন।······হে মহাবীর্য্য তুমি উত্থিত হও, সমস্ত আবরণ বিদীর্ণ কর, ভাগবদ বিভূতি আমাদের মধ্যে ফুটাইয়া তোলো।

বামদেব—ঋগ্বেদ (৪।১।৭; ৪।২।১; ৪।৪।৫)

স্মরণাতীত কাল হইতে দেখা গিয়াছে যে যখনই মানুষের চিত্ত জাগরিত হইয়াছে, তখনই তাহার চিন্তা-জগতের সর্ব্বোচ্চ স্তরে যাহা অবস্থিত তাহাতে পৌছিতে চাহিয়াছে। ভগবানের দিকে যাইবার আকূতি, পূর্ণতা প্রাপ্তির আবেগ, নিখাদ সত্য এবং অবিমিশ্র আনন্দের সন্ধান, অমরত্ব ও অমৃতত্বের একটা বোধ ও তল্লাভের ইচ্ছা তাহার মধ্যে দেখা দিয়াছে। মাঝে মাঝে এ সমস্ত তাহার কাছে অস্পষ্ট ও সংশয়সঙ্কুল হইয়া উঠিলেও সে অস্পষ্টতা এবং সংশয় চিরস্থায়ী হইতে পারে নাই। তাইতো মানব-জীবনের ইতিহাসে দেখিতে পাই প্রাচীন উষা পুনঃ পুনঃ আসিয়াছে—তাহার কাছে অবিশ্রান্ত অভীপ্সার বাণী বহন করিয়া। বর্ত্তমান যুগে আমরা দেখিতে পাই মানুষ যখন বিশ্লেষণ দ্বারা বাহ্য প্রকৃতিকে জয় করিয়া, জলে, স্থলে, আকাশে, বাতাসে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে তখনও তাহার অতৃপ্ত অন্তরে সেই আদিম অভীপ্সা পুনরায় জাগিয়া উঠিতেছে। ভগবান, আলোক, স্বাধীনতা, অমৃতত্ব যেমন পুরাকালে তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আস্পৃহার বস্তু ছিল আজিও যেন তাহাই রহিয়াছে।

অহমিকাক্লিষ্ট এই পাশব চৈতন্যের পক্ষে দিব্য পরমপুরুষকে জানা বা পাওয়া অথবা তাহার সহিত এক হইয়া যাওয়া, আমাদের জড় মনের অস্পষ্ট প্রদোষালোক অতিমানসের পরিপূর্ণ জ্যোতিরুচ্ছ্বাসে উদ্ভাসিত করা, আধিব্যাধি-প্রপীড়িত মানব-জীবনের ক্ষণিক তৃপ্তির মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দ ও শান্তির প্লাবন প্রবাহিত করা, বাহ্য জগতের যান্ত্রিক নিয়তি ও নিয়মের মধ্যে অনন্ত স্বাধীনতাকে স্থাপিত করা, সদাপরিবর্ত্তনশীল মর্ত্ত্যদেহে অমৃতময় শাশ্বতজীবনকে আবিষ্কার এবং লাভ করা, —এমনি করিয়া জড়ের মধ্যে পরমদেবতাকে প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠিত করা, ক্রমপরিণতিশীল প্রকৃতির চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সাধারণ জড়বুদ্ধি ইহা স্বীকার করিতে চায় না, সে মনে করে বর্ত্তমানে তাহার চৈতন্য যে অবস্থায় পৌছিয়াছে তাহাই তাহার সম্ভাবনার শেষ সীমা। এ আদর্শ যখন বর্ত্তমান জীবন ও চৈতন্যের বিরোধী তখন ইহা নিশ্চয়ই মিথ্যা এবং নিষ্ফল। কিন্তু যদি আমরা গভীর ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করি তবে দেখিব যে এই বিরোধ প্রকৃতির অনভিপ্রেত তো নয়ই, বরং তাহার কর্ম্মপদ্ধতির সহিত গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট।

মূলতঃ জড়জীবন এবং মনের সকল ক্ষেত্রে প্রকৃতি সৌষম্য ও সমন্বয় খুঁজিতেছে। মানুষের জীবনে যে বিরোধ ও বেসুর আছে তাহাতে

তাহার মনের ব্যবহারিক বা পাশব অংশ তৃপ্ত থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার মন যখন পূর্ণরূপে জাগ্রত হয় তখন এ তৃপ্তি রাখা অসম্ভব। বাহিরের বিরোধ ও বেসুর যতই প্রবল হয়, যতই তাহাদের মিলন করা অসম্ভব মনে হয়, ততই বৃহত্তর ভাবে প্রবুদ্ধ মনে তাহাদিগকে সমন্বিত করিবার চেষ্টা চলিতে থাকে। প্রকৃতির মধ্যে নানা বিরোধের যে সমন্বয় সাধিত হইতেছে তাহা আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাইতেছি। যে জড়ের প্রকৃতি অসাড়তা তাহার মধ্যে প্রাণের বিপুল ক্রিয়াশীল প্রকৃতিকে রূপায়িত করিয়া প্রাণী-জগতের উদ্ভব হইয়াছে এবং সেখানে তাহার ক্রমশঃ উৎকর্ষ সাধন চলিতেছে। ইহার পূর্ণ পরিণতি হইলে প্রাণীদেহ অমরত্ব লাভ করিবে। আবার একটা বড় বিরোধ আমরা দেখিতে পাই চৈতন্যময় মন এবং যাহা স্পষ্টতঃ সচেতন নয় সেই প্রাণ ও জড়ের মধ্যে। এখানেও এই বিরোধের এক আশ্চর্য্য সমন্বয় হইয়াছে মানবদেহে, এখানেও শেষ মহাশ্চর্য্য সাধিত হইবে যখন মনকে সত্য এবং আলোক খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে না কিন্তু একটা সাক্ষাৎ এবং পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়া মন কার্য্যতঃসর্ব্বশক্তি-মত্তা লাভ করিবে। সুতরাং বিরোধ ও প্রতিকূলতা দেখিলেই ভীত হইবার কারণ নাই। বিরোধের মধ্য দিয়া সমন্বয় ফুটাইয়া তোলাই প্রকৃতির কার্য্যপদ্ধতি।

ক্রমপরিণতি ক্ষেত্রে আমরা জড়ে প্রাণ এবং প্রাণে মনের উদ্ভব দেখিতে পাই বটে কিন্তু তাহার কারণ খুঁজিয়া পাই না। বেদান্ত এ বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, জড়ে প্রাণ এবং প্রাণে মন সংবৃত হইয়া গুপ্তভাবে অবস্থিত আছে, ইহা স্বীকার করিলে কারণ পাওয়া যায়। মানস-চৈতন্য সংবৃত হইয়া প্রাণ এবং প্রাণ সংবৃত হইয়া জড়ে পরিণত হইয়াছে। তাই জড় হইতে প্রাণ এবং প্রাণ হইতে মনের বিকাশ সম্ভব হইয়াছে। একথা স্বীকার করিলে আর একটু অগ্রসর হইয়া আমরা বলিতে পারি— যে অমনী বা মনের অতীত এক চেতনা সংবৃত হইয়া মনে পরিণত হইয়াছে। মন হইতে আবার সেই চৈতন্যের প্রকাশ হইতে পারে। ইহা স্বীকার করিলে মানুষের মধ্যে ভগবান, আলোক, আনন্দ, স্বাধীনতা, অমরত্ব প্রভৃতির জন্য যে আকুল আকুতি আছে—যাহা সকলের মধ্যে সমান পরিমাণে প্রকাশিত না থাকিলেও অল্পাধিক পরিমাণে সকলের মধ্যে প্রকাশিত দেখিতে পাই—তাহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

উর্দ্ধগতিশীলা যে প্রকৃতি এখানে জড়ের মধ্যে প্রাণের এবং প্রাণের মধ্যে মনের বিকাশের আবেগ সঞ্চার করিয়া তাহা সিদ্ধ করিয়াছে, সেই প্রকৃতি এখন মনের উপরের তত্ত্ব ফুটাইয়া তুলিতে চায়; তাহারই অলঙ্ঘনীয় আবেগ এই আকুতিরূপে প্রকাশ পাইয়াছে ইহা বুঝা সহজ ও স্বাভাবিক হয়। ইহা বলা হইয়াছে যে প্রাণীদেহের জীবন্ত বীক্ষণাগারে প্রকৃতি তাহার যুগ যুগান্তের সাধনায় মানুষ গড়িয়া তুলিয়াছে; তাহা হইলে মানুষের প্রাণ মনের বীক্ষণাগারে তাহারই সচেতন সহযোগিতায় অতিমানব বা দেবতা গড়িবার সাধনাই হয়ত চলিতেছে, অথবা আমরা কি ইহাই বলিতে পারি না যে মানুষের এই মর্ত্ত্য আধারে দিব্যপুরুষকে মূর্ত্ত করিবার সাধনাই চলিতেছে? কারণ উর্দ্ধগমনের মধ্যে প্রকৃতি তাহার মধ্যে যাহা সুপ্ত বা গুপ্তভাবে আছে শুধু তাহা প্রকাশ করিতে যে চায় তাহা নহে, পরন্তু তাহার যে আত্মস্বরূপ আজ তাহার কাছে গুপ্ত এবং অন্ধকারাবৃত আছে তাহারও স্পষ্ট এবং প্রকাশ্য অনুভূতি এবং সিদ্ধিও তাহার কাম্য। অতএব এই প্রগতির পথে কোথাও প্রকৃতিকে থামিতে বলিতে পারি না—যদি সে আরও অগ্রসর হইয়া তাহার বর্ত্তমান প্রকাশের অতীত ক্ষেত্রে পৌছিতে চায়, তবে কোন কোন ধর্ম্মবাদীর মত তাহার এ চেষ্টাকে বিকৃতস্পর্দ্ধা বা যুক্তিবাদীর মত ইহাকে কল্পনার বিকার বা বিভ্রম বলিতে পারি না। একথা যদি সত্য হয় যে জড়ের ভিতরে দিব্য পুরুষই সংবৃত হইয়া আছেন এবং প্রকাশমানা এই প্রকৃতি তাহার গোপনসত্তায় শ্রীভগবানের সহিত একীভূত, তবে অন্তরে ও বাহিরে শ্রীভগবানের প্রকাশ ও অনুভব করা মর্ত্ত্য মানুষের চরম ও পরম পুরুষার্থ।

চিরন্তন সমস্যা এবং পরম বিস্ময়ের বিষয় এই যে প্রাকৃত পাশবদেহে শাশ্বত সত্য ও সম্ভাবনা ফুটিয়া উঠিতেছে, মর্ত্ত্য আধারে অমৃতত্বের একটা আস্পৃহা বা সত্য বাস করিতেছে, এক সার্ব্বভৌম বিশ্বচৈতন্য বহু সীমিত চিত্ত এবং খণ্ড অহং এর মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে, বিশ্বাতীত অনির্দ্দেশ্য দেশ কালের অতীত অথচ যাহা হইতে দেশ কাল ও জগৎ জাত হইয়াছে সেইরূপ এক সত্তা সদা বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং মানুষ এই দুই ভাবের নিরন্তর অবস্থায় অবস্থিত থাকিয়াও উচ্চতর অবস্থার অনুভূতি ও

সাক্ষাদ্দর্শন লাভ করিতে পারে, এবিশ্বাস মানুষের সহজাত সংস্কার, তাহার বোধিলব্ধ জ্ঞান এবং গভীর বিচারশীল বুদ্ধি স্বীকার ও সমর্থন করে। প্রথম দৃষ্টিতে ইহা প্রহেলিকা বা অসম্ভব বোধ হইলেও তাহার মার্জ্জিত বুদ্ধি অথবা বোধিচৈতন্যের উন্মেষে প্রস্ফুটিত সহজ জ্ঞান ও অভীপ্সা সেই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিতে চায়। সাধারণ তর্কবুদ্ধি অনেক সময় বলে যে এসব সমস্যার সমাধান আজিও হয় নাই, সুতরাং ইহাদিগকে বাদ দিয়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সমূহের সমাধান চেষ্টায় আমাদিগের নিযুক্ত থাকা উচিৎ। বস্তু-তান্ত্রিকের এ উপদেশ মানুষ বহুবার শুনিয়াছে কিন্তু তবুও পুনরায় এ সমস্ত জানিতে এবং পাইতে চাহিয়াছে, বরং বাধা পাইয়া তাহার জ্ঞানের পিপাসা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। সেই পিপাসার ফলে সাধক-জীবনে সত্যের নব নব রূপ ফুটিয়াছে। যে প্রাচীন ধর্ম্মমত সমূহ সংশয় দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে অথবা যাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য লুপ্ত হইয়াছে তাহার স্থানে দেখা দিয়াছে নব নব ধর্ম্মের নূতন আকার ও শক্তি। সত্যের পরিপূর্ণরূপ মানুষ প্রথমেই দেখিতে পায় না, অনেক সময় অন্ধ কুসংস্কার বা যুক্তিহীন বিশ্বাসের মধ্য দিয়াই তাহার প্রথম আভাস জাগে, কিন্তু তাহার প্রকাশ অস্পষ্ট ব্যাহত বলিয়াই তাহাকে অস্বীকার করা বা তাহার মূল আরো গভীরভাবে অনুসন্ধান না করা একপ্রকার অন্ধতা। যে সত্যের স্ফুরণ বিশ্বের নিয়তি, তাহার সাধনার পথ দুর্গম ও কষ্টসাধ্য অথবা তাহার পরিণাম প্রত্যক্ষের অগোচর হইলেও তাহাকে ত্যাগ করা উচিৎ নয়। ত্যাগ করিলে প্রকৃতির সত্যকে অস্বীকার করা হইবে এবং তাহার গোপন ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হইবে, বরং যে আকৃতিকে বিশ্বজননী মানুষের ভিতর জাগাইয়া রাখিয়াছেন অভীপ্সার অনির্ব্বাণ গোপন শিখারূপে, তাহাকে স্বীকার করিয়া লইয়া পূর্ণভাবে প্রজ্জ্বলিত করা তাহার পৌরুষের যথার্থ পরিচয়। এ আলোক আজ তাহার কাছে কুণ্ঠিত বা স্তিমিত হইলেও ইহার ক্ষণিক আভাস সে মাঝে মাঝে যখন পাইয়া আসিতেছে তখন সেই আলোকের ইসারাতেই সে তাহার প্রকৃত পথ, মানব-জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য দেখিতে ও জানিতে পারিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দুইটী নাস্তি বাদ

(১)

জড়বাদীর নাস্তি

তিনি তপস্যার দ্বারা চিৎশক্তিকে উদ্বোধিত করিলেন এবং জানিলেন যে অন্ন বা জড় ব্রহ্ম। কারণ জড় হইতে সকল সত্তা জাত হয়, জাত হইয়া জড় দ্বারা তাহারা বর্দ্ধিত হয় এবং এখান হইতে যখন চলিয়া যায় তখন জড়ের মধ্যেই অনুপ্রবিষ্ট হয়। তারপর তিনি তাঁহার পিতা বরুণের কাছে গিয়া বলিলেন—"ভগবন্, আমাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ দান করুন।" কিন্তু তিনি তাহাকে বলিলেন "চিৎশক্তিকে আবার তোমার মধ্যে উদ্দীপ্ত কর, কারণ শক্তিই ব্রহ্ম।"

তৈত্তিরীয় উপনিষদ (৩।১—২)

এই জগতে ভাগবত বা দিব্য জীবন প্রতিষ্ঠার বা মরণশীল স্থূল পার্থিব জীবনকে অমরত্ব ও অমৃতত্বের ভাবে রূপায়িত করিবার জন্য দুইটী সত্যকে জানা ও স্বীকার করা প্রয়োজন। নানা দেহের মধ্যে যিনি বাস করিতেছেন, এই সদা পরিবর্ত্তনশীল নানা সাজে যিনি সজ্জিত হইতেছেন, তিনি নিত্য শাশ্বত পরমপুরুষ এবং এই সমস্ত দেহ ও সাজের যে জড়-উপাদান তাহাও তাঁহারই সাজের ও বাসের উপযুক্ত, সার্থক ও মহান্—এইউভয়ই সত্য না হইলে জগতে দিব্য জীবন ফুটিতে পারে না।

প্রাকৃত বুদ্ধির নিকট চিৎ ও জড় এ দুইটী একান্ত বিরোধী তত্ত্ব। তাই স্থূল জগতে দিব্য জীবন প্রতিষ্ঠা অসম্ভব মনে করিয়া, জীবন ও দেহ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া বা তাহাদের এড়াইয়া ব্রহ্মে অনুপ্রবিষ্ট হইবার যে চেষ্টা দেখিতে পাই তাহার প্রতিকার হইতে পারে, যদি

উপনিষদে যে সত্য উক্ত হইয়াছে যে 'জড় ও ব্রহ্ম' তাহাকে বুঝি ও স্বীকার করি এবং জড় জগতকে শ্রীভগবানের দেহ বলিয়া যে বর্ণনা করা হইয়াছে সে বর্ণনার পূর্ণ মূল্য দিই। চিৎ এবং জড়ের মধ্যে আপাত দৃষ্টিতে এতই বিভেদ দেখা যায় যে তাহারা যে মূলতঃ একই, একথা আমাদের পক্ষে বুঝা আরও কঠিন হয় যদি এ দুএর মধ্যে ধারাবাহিক আরও যে কতকগুলি পর্ব্ব আছে যথা প্রাণ, মন, মনের উচ্চতর ভূমিসকল এবং অতিমানস, তাহাদিগকে স্বীকার না করি। তখন মনে হয় চিৎ ও জড় যে বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ দেখিতেছি তাহা সুখের বা শান্তির কারণ হয় নাই, এ বিবাহ বিচ্ছেদই সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়।

আমরা যদি বলি যে কেবলমাত্র এক অদ্বিতীয় পুরুষ বা বিশুদ্ধ এক চিন্ময় সত্তা এবং যাহার ক্রিয়া যন্ত্রের মত পরিচালিত হয় এমন একটী অচিৎ বস্তু বা শক্তিরূপা প্রকৃতিমাত্র আছে তবে আমাদের বুদ্ধি ও জীবনকে চলার পথে ইহাদের একজনকে অস্বীকার করিয়া অপরকে সত্য বলিয়া মানিতে হয়। তখন আমাদের চিন্তা, হয় চিৎকে কল্পনার ভ্রান্তি অথবা জড়কে ইন্দ্রিয়বোধের ভ্রান্তি মনে করিয়া বসিবে। তখন জীবন ও চিন্তাধারা হয় চিৎস্বরূপের পরমানন্দের দিকে আকৃষ্ট হইয়া, মিথ্যা এবং অসার ভাবিয়া জগত হইতে, এমন কি নিজের নিকট হইতে পলাইতে চাহিবে অথবা নিজের অমৃতময় স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া ভগবানকে অস্বীকার করিয়া পশুত্বের সাধনাতেই মগ্ন হইবে। তাই দেখিতে পাই সাংখ্য দর্শন চিৎ স্বরূপ নিষ্ক্রিয় পুরুষ এবং জড়াত্মিকা বোধহীনা ক্রিয়াশীলা প্রকৃতির মধ্যে কোন সাম্য খুঁজিয়া না পাইয়া প্রকৃতির সহিত সকল সম্বন্ধ শূন্য হইয়া যেখানে প্রকৃতি তাহার নিষ্ফল ক্রিয়ার প্রতিবিম্ব আর ফেলিতে পারিবে না, পুরুষকে সেই তার পরিণাম-শূন্য পরম প্রশান্তি বা স্বরূপে অবস্থিতিতে পৌঁছিতে বলিয়া জড় ও চিতের একান্ত বিরোধ মিটাইতে চাহিয়াছে। শঙ্করও তাহার জীবজগৎ পরিশূন্য ব্রহ্ম এবং বহু নাম-রূপাত্মিকা প্রকৃতির মধ্যে মিলন অসম্ভব বোধ করিয়াছেন, তাই তিনি পরম সৎ স্বরূপের শাশ্বত নৈঃশব্দের মধ্যে বহুধা বিচিত্র হইলেও মিথ্যা প্রকৃতির একান্ত অবসান করাইয়া এ দ্বন্দের মীমাংসা করিতে চাহিয়াছেন।

জড়বাদীর সমাধান ইহা অপেক্ষা সহজ। ঈশ্বর বা চিৎসত্তাকে অস্বীকার করিয়া জড় বা শক্তিকে একমাত্র তত্ত্ব বলিয়া স্থির করিয়া জড়বাদএকরূপ বাস্তব এক অদ্বৈতবাদ খাঁড়া করিয়াছে যাহা সহজেই বুঝা বা বুঝানো যায়। কিন্তু জড়বাদীর পক্ষেও তাহার এ উক্তি কঠোরভাবে বজায় রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। গভীরভাবে চিন্তা করিয়া তাহাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে তাহার কল্পিত সে অদ্বয় তত্ত্বও অকর্ত্তা পুরুষ বা অশব্দ আত্মার মতই প্রত্যক্ষের অগোচর ও অজ্ঞেয়।

কিন্তু এইরূপে বিরোধের এক কোটিকে মিথ্যা বলিয়া অন্য কোটিকে মানিতে গেলে মানুষের মন ও বুদ্ধি তৃপ্ত হয় না অথবা তাহার জীবন সার্থক ও পরিপূর্ণ হয় না। সে চায় এক পরিপূর্ণ সমন্বয়ের পথে তাহার অন্তর-চৈতন্যকে পর্ব্বে পর্ব্বে অগ্রসর হইতে হইবে। এখন জড়কে বাহির হইতে দেখিয়া ও বিশ্লেষণ করিয়া বিজ্ঞান চলিতেছে, সেই বিশ্লেষণ প্রাণ ও মনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াই হউক অথবা ভিতরের দিকে তাকাইয়া অন্তরের আলোকে আলোকিত করিয়া সমন্বয়ের দৃষ্টি সাহায্যেই হউক তাহাকে এমন ক্ষেত্রে পৌছিতে হইবে যেখানে বহু বিচিত্র প্রকাশের শক্তিকে অস্বীকার না করিয়া চরম ঐক্যের এক পরম প্রশান্তির দেখা পাওয়া যাইবে। সেইরূপ উদার সমন্বয়ের মধ্যে সমস্ত বিরোধের অবসান হইবে এবং আমাদের প্রাণ ও মন এখানে নানারূপে যে এক পরমসত্তার প্রকাশের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে এই মূল সত্য আবিষ্কৃত হইবে। এই সত্যের সন্ধান পাইলে আমাদের বুদ্ধি চক্রাকারে ভ্রমণ ছাড়িয়া এমন এক সত্য কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হইবে যেখানে উপনিষদের ব্রহ্মের মত বিশ্বের বহুবিচিত্র কর্ম্মে সানন্দে রত থাকিয়াও স্বপ্রতিষ্ঠায় ধ্রুব ও অচঞ্চল ভাবে অবস্থিত থাকিতে পারিবে।

কিন্তু যখন ছন্দোভঙ্গ হইয়াছে, ভেদ ও বিরোধ দেখা দিয়াছে তখন এই দুই তত্ত্বের একটীকে ভুলিয়া বা অস্বীকার করিয়া অন্যটীকে সত্য বলিয়া একান্তভাবে ধরিবার একটা উপযোগিতা আছে। ইহা হইতেই সেই পরম সাম্যে ফিরিয়া আসিবার পথ পাওয়া যাইবে। ফিরিয়া আসিবার পথে চিৎ ও জড়ের মধ্যবর্ত্তী মন ও প্রাণের একতরকে একান্ত-ভাবে ধরিয়া একপ্রকার মতবাদ খাঁড়া করা যাইতে পারে। তখন মনের

ধারণা বা জীবনের শক্তিকে একমাত্র মৌলিক তত্ত্ব এবং অন্য সমস্ত তত্ত্ব পদার্থ বা ভাব তাহা হইতে জাত হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু এরূপ ব্যতিরেকী (exclusive) মীমাংসায় একটা অবাস্তবের সংস্পর্শ যেন সর্ব্বদা লাগিয়া থাকে, যে মন শুধু ভাব লইয়া কারবার করে সে মন এ সিদ্ধান্তে তৃপ্ত হইলেও মনের যে বাস্তববুদ্ধি আছে সে ইহাকে একস্থানে ক্রমাগত অস্বীকার করিতে থাকে। সে মন জানে যে তাহার পিছনে এমন কিছু আছে যাহা শুধু মাত্র ভাব নয় অথবা এমন কিছু আছে যাহা শুধু মাত্র প্রাণবায়ুর লীলা নয়। প্রাণ বা মনকে একান্ত ভাবে না ধরিয়া চিৎ বা জড়কে পরমতত্ত্ব বলিয়া ধরিলে বরং মন কিছুক্ষণ স্বস্তি পায়। একান্তভাবে এ দুইটীকে পৃথকভাবে দেখিবার পর ইহাদের সমন্বয়ে সফলভাবে পৌছানো যাইতে পারে। স্বভাবতঃ ইন্দ্রিয়বোধ সত্তার অংশগুলিকেই স্পষ্টরূপে দেখিতে পারে, ভাষাও তখনই স্পষ্ট হইয়া উঠে যখন বিভক্ত ও সীমাবদ্ধ কোন কিছুকে সে প্রকাশ করে। এই ইন্দ্রিয়বোধ ও ভাষার সাহায্য লইয়াই বুদ্ধিকে চলিতে হয়, তাই যখন সে একত্ব খোঁজে তখন তাহার সম্মুখে উপস্থিত বহু বৈচিত্র্যকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একাকার করিয়া কোন প্রকারে একত্বে পৌছান ছাড়া অন্য উপায় খুঁজিয়া পায় না। তাই একত্বে পৌছিবার জন্য কার্য্যতঃ সে জড় ও চিতের একেকে রাখিয়া অপরকে অস্বীকার করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। এ দুইএর মূল সত্যকে আবিষ্কার করিতে হইলে মনের পক্ষে হয় নিজেকে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে অথবা বিকাশ ধারা পূর্ণ করিয়া এমন এক সত্যে পৌছিতে হইবে যাহা কোন বিশেষণ দ্বারা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না—অথচ তাহা যে কেবলমাত্র সত্য তাহা নহে, আমরা অনুভব দ্বারা তাহাকে লাভ করিতেও পারি। আমরা যাত্রা শেষ করিয়া পথের মধ্যে কোন স্থানে থামিয়া যাইতে যদি না চাই তবে যে পথে চলি না কেন অবশেষে আমাদিগকে এই সত্যেই পৌছাইতে হইবে।

তাই আজ আমরা আবার সেই দুটী চরম মতের সম্মুখীন হইয়াছি। বহু পরীক্ষা ও সমীক্ষা দ্বারা এ দুইটী পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়াছে, অনেক যুক্তি বিচার ও অভিজ্ঞতা দ্বারা ইহারা সমর্থিত হইয়াছে বটে, কিন্তু বিশ্বমানবের সহজবুদ্ধি,

যে সকল সত্যের গোপন বিচারক, সার্ব্বভৌম সত্যের রক্ষক ও প্রতিনিধি সে ইহার কোনটীকেই পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হইতে পারিতেছে না। ইহার একটীকে বলিতে পারি জড়বাদীর নাস্তি, যাহা জড়কে, জগৎকে, প্রকৃতিকে সত্য বলিয়া চিৎকে, আত্মাকে বা পুরুষকে অস্বীকার করিয়াছে, অপরটীকে সন্ন্যাসীর নাস্তিবাদ বলিতে পারি যাহা ইহার ঠিক বিপরীত, যাহা চিৎকে বা আত্মাকে একমাত্র সত্য পদার্থ বলিয়া জড় জগৎ বা প্রকৃতিকে মিথ্যা বলিয়াছে। জড়বাদ ও সন্ন্যাসীর নাস্তিবাদ যথাক্রমে ইউরোপে এবং ভারতে প্রাধান্য লাভ করিয়া অন্য সকল মত ঢাকিয়া ফেলিতে এবং জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিয়াছে। ভারতে ইহার ফলে আত্মার পরমৈশ্বর্য্য (অথবা সেই পরমৈশ্বর্য্যের) একদিক উদ্ঘাটিত হইয়াছে বটে কিন্তু জীবনের বা জগতের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সে হইয়াছে প্রায় দেউলিয়া, ইউরোপ তেমনি জাগতিক ধন সম্পদের, পার্থিব শক্তির বিপুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিলেও আত্মজ্ঞানের ক্ষেত্রে হইয়াছে প্রায় তেমনি দেউলিয়া। পরস্পর বিরোধী এই যে দুইটী মত, দুইটী আদর্শ আজ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে এক হিসাবে ইহাকে শুভলক্ষণ বলিতে হইবে। কারণ এই দুইটীর প্রত্যেকের মধ্যে যে ন্যূনতা আছে তাহা আজ বিবেকীর দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছে এবং এক নূতন সমৃদ্ধতর সুরে অন্তর ও বাহির, চিৎ ও জড়ের সমন্বয় সাধন, মানবের ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত পূর্ণ জীবনের জন্য যে একান্ত প্রয়োজন এবোধ জাগিয়া উঠিয়াছে।

জড়বাদীর নেতি বা নাস্তিকতাতে মানুষ হয়ত সহজে আকৃষ্ট হইতে পারে কিন্তু তাহাকে ভাঙ্গা বা খণ্ডন করা সন্ন্যাসীর নেতি বাদের মত শক্ত নয়। তাহার ভুল ভাঙ্গিবার অস্ত্র তাহার নিজের মধ্যেই রহিয়াছে। জড়বাদীর সবচেয়ে প্রধান অস্ত্র অজ্ঞেয়বাদ। প্রকট জগতের পিছনে কি আছে তাহা জানা যায় না ইহাই সে বলে। কিন্তু ক্রমশঃ সে অজ্ঞেয় তত্ত্বের সীমানা অতিরিক্ত বাড়াইয়া যাহা জানা যায় অথচ এখনও জানিতে পারা যায় নাই তাহাও জানা যাইবে না ইহা বলে। তাহার যুক্তিধারা এই—চক্ষু কর্ণ নাসিকাদি আমাদের বাহ্য ইন্দ্রিয় সমূহই আমাদের জ্ঞান-লাভের একমাত্র উপায়। আমাদের বুদ্ধি যতই ঊর্দ্ধে উঠুক না কেন সে

কখনও ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সীমা ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। ইন্দ্রিয় যে সমস্ত বিষয় বুদ্ধির কাছে উপস্থিত করে বুদ্ধিকে কেবলমাত্র তাহা লইয়াই চলিতে হইবে। ইন্দ্রিয়বোধকে সেতুরূপে ব্যবহার করিয়া সে বোধের বাহিরে বা উপরে গিয়া ইন্দ্রিয় অপেক্ষা কম সীমাবদ্ধ ও অধিকতর শক্তিশালী কোন বৃত্তিতে পৌঁছিয়া তাহার সাহায্যে জ্ঞানলাভ করা যায় একথা সে কিছুতেই স্বীকার করিবে না।

এ ধরণের অযৌক্তিক যুক্তির দুর্বলতা সহজেই ধরা পড়ে! ইহার বিরুদ্ধে যে অগণিত প্রমাণ ও অভিজ্ঞতা আসিয়া উপস্থিত হইতেছে সে সমস্তকে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করিয়া অথবা তাহাদের বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া এ মতকে বাঁচিয়া থাকিতে হয়। মানুষের ভিতর যে সমস্ত মহৎ এবং সার্থক বৃত্তি কোথাও স্পষ্ট কোথাও অস্পষ্ট কোথাও বা গুপ্তভাবে অবস্থিত আছে যাহা ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের খবর দিতে পারে তাহাদিগের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, জড়ের মধ্যে যাহার প্রকাশ নাই এমন অতিপ্রাকৃত ঘটনাকে বুঝিতে এবং অনুসন্ধান করিতে বিরত থাকিয়া অথবা সে সমস্তকে জড় শক্তির গৌণক্রিয়া বলিয়া একটা কপটতার সাহায্যে এ মতকে বজায় রাখিতে হয়। মন হইতে জড়ের আড়ষ্ট সংস্কার মুছিয়া ফেলিয়া মন ও অতিমানসের স্বক্ষেত্রে যদি ইহাদের গতি ও ক্রিয়া দেখিতে যাই তখন দেখিব আমাদের সম্মুখে এমন সমস্ত ঘটনা এবং অভিজ্ঞতা বহুল পরিমাণে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে যাহাদিগকে জড় বিধানের সংকীর্ণ-গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ বাধা যায় না। এই সমস্ত অভিজ্ঞতা আমাদিগকে দেখিতে বাধ্য করিবে যে ইন্দ্রিয় ক্ষেত্রের সীমার বাহিরে যাহা সত্যই অজ্ঞেয় নয় এমন অনেক জিনিষ আছে। আরও দেখাইবে যাহা ইন্দ্রিয়-সংবিতের নিয়ন্ত্রণ মানে না বরং যাহারাই ইন্দ্রিয়গণকে নিয়ন্ত্রিত করে, অনুভব করিবার এমন সমস্ত শক্তি ও বৃত্তি আমাদের মধ্যে আছে—যাহাদের সাহায্যে অতীন্দ্রিয় জগতের বিষয় আমরা জানিতে পারি। ইহা হইলেই জড়বাদীর অজ্ঞেয়ত্বের যুক্তিধারার ভ্রম ধরা পড়ে এবং তখন উদারতর এবং প্রশস্ততর দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সত্যানুসন্ধানের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়।

যুক্তি যাহার ভিত্তি এমন এক জড়বাদ কিছুদিন হইতে মানুষকে পরিচালিত করিতেছে কিন্তু তাহাতে তাহার উপকারও হইয়াছে প্রচুর। অলৌকিক তত্ত্বের

যে সমস্ত প্রমাণ ও অভিজ্ঞতা মানুষের নিকট উপস্থিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, অপক্ক এবং অপরিশীলিত মন লইয়া তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিলে এই সব অলৌকিক সত্য অনেক সময় কিম্ভূতকিমাকার হইয়া উঠে এবং নানা অনর্থের সূচনা করে। অতীতে অনেক সময় এইরূপ কণিকা-প্রমাণ সত্যের চারিপাশে এত বিস্তৃত ও বিকৃত কুসংস্কার ও মতবাদ জড় হইয়াছে যাহাতে সত্য জ্ঞানের পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। সে সময় এ মিথ্যার সঙ্গে সত্যের কণাটুকুকেও একেবারে দূব করিয়া দিয়া আবার সত্যের নূতন অভিযান আরম্ভ করা প্রয়োজন হইয়াছিল। জড়বাদের মধ্যে যে যুক্তিপ্রবণতা আছে তাহা মানুষের এই পরম উপকার কবিয়াছে।

সুতরাং জ্ঞানের পথে আমাদিগকে শুদ্ধ, সংস্কৃত এবং মার্জ্জিত বুদ্ধি লইয়া চলিতে হইবে। মানুষকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড় জগতের সত্যের কঠোর শাসন দ্বারা অনেক সময় তাহার অতীন্দ্রিয় ক্ষেত্রের চলনের ত্রুটিকেও সংশোধন করিয়া নিতে হয়। এমনকি একথা পর্য্যন্ত বলা চলে যে জড় জগতের অটল ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াই আমরা জড়াতীত সত্যের পূর্ণ সাক্ষাৎকার এবং অধিকার পাইতে পারি। উপনিষদ 'পদ্ভ্যাম্ পৃথ্বী' 'পৃথিবীপাজস্যম্' 'এই পৃথিবীর বক্ষে তাহার চরণ স্থাপিত' এই বলিয়া এই সত্যেরই ইঙ্গিত করিয়াছে। তাই একথা সত্য যে পার্থিব জগতের জ্ঞান আমাদের যত সুনিশ্চিত এবং সম্প্রসারিত হইবে, আমাদের উচ্চতর জ্ঞানের এমন কি ব্রহ্মবিদ্যার ভিত্তিও ততই উদার, গভীর ও দৃঢ় হইবে। অতএব জড়বাদীর মতবাদের মোহকে অতিক্রম করিয়া যাইবার সময় আমাদিগকে দেখিতে হইবে জডবাদ সত্যের যে দিককার প্রতি আলোকপাত করিয়াছে তাহা যেন উপেক্ষা না করি। জড়বাদ খণ্ডনের অতি আগ্রহে আমরা যেন তাহার দেওয়া সত্যের একটী কণিকাও না হারাই। বরং ভগবানের মহিমা বুঝিবার জন্য নিরীশ্বরবাদ এবং জ্ঞানের অনন্ত প্রসারের জন্য অজ্ঞেয়বাদ প্রকারান্তরে সাহায্যই করিয়াছে ইহা যেন মনে রাখি। এ জগতে ভ্রান্তি চিরকাল সত্যের পরিচারিকা এবং পথপ্রদর্শিকার কার্য্য করিয়া আসিয়াছে। কারণ ভ্রান্তি প্রত্যুত অর্দ্ধ সত্য, সীমার মধ্যে থাকে বলিয়াই তাহাতে পদস্খলন আছে। এমন কি অনেক সময় সত্যই ভ্রান্তির মুখোশ পরিয়া গোপনে তাহার শেষ লক্ষ্যে উপস্থিত হয়। বিজ্ঞানের যে মহৎ যুগ আমরা

অতিক্রম করিয়া যাইতেছি সে সময় ভ্রান্তি যেমন সত্যের বিশ্বস্ত পরিচারিকার কার্য্য করিয়াছে, যেমন নিষ্ঠার সহিত ছলনাশূন্য হইয়া নিজের সীমার মধ্যস্থিত জ্ঞানের আলোকে দীপ্তিমন্ত হইয়া সত্যের অর্দ্ধ প্রকাশমাত্র করিয়াছে তাহা বাস্তব জ্ঞানহীন ধৃষ্ট উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনার চেয়ে যে অনেক শ্রদ্ধেয় তাহা কে অস্বীকার করিবে?

একরকম অজ্ঞেয়বাদ সকল জ্ঞানের শেষ কথা। যে পথেই আমরা চলি না কেন অবশেষে আমরা দেখি এক অজ্ঞেয় তত্ত্বই বিশ্বরূপে, জড়, প্রাণ, ইন্দ্রিয় বুদ্ধি, ভাব, অধ্যাত্ম প্রভৃতি কতরূপে আমাদের কাছে প্রতিভাত হইতেছে। সে তত্ত্ব যতই আমাদের কাছে সত্য হইয়া উঠে ততই বেশী করিয়া বুঝিতে থাকি যে তাহা বাক্য ও মনের অগোচর "ন তত্র বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ।" কিন্তু মায়াবাদী জগতের নামরূপের অবাস্তবতা যেমন অতি মাত্রায় বাড়াইয়া তুলে, তেমনি যিনি বাক্য মনের অজ্ঞেয় তাহার অজ্ঞেয়তাকেও আমরা অতি মাত্রায় বাড়াইয়া তুলিতে পারি। যখন তাহাকে অজ্ঞেয় বলি তখন এই অর্থে বলি যে যে মন এবং বাক্য ভেদজ্ঞান হইতে জাত এবং ভেদদর্শন করানই যাহাদের ধর্ম্ম সে মন ও বাক্য দিয়া তাহাকে ধরিতে পারি না বটে কিন্তু চৈতন্যের পরম প্রসারণ দ্বারা তাহার সহিত একাত্মবোধ জাগিলে তাহাকে জানা যায় একথা বলা চলে। ইহা নিশ্চিত যে সে জানাকে বাক্য বা মন দ্বারা প্রকাশ করা যায় না কিন্তু একাত্মবোধে সে উপলব্ধি হইলে জগতের নিখিল প্রতীকের মধ্য দিয়া তাহাকে দেখা যায় এবং আমাদের অন্তর ও বাহিরের জীবনে এক দিব্য রূপান্তর ঘটে।

যাহা অজ্ঞাত তাহাই যে অজ্ঞেয় হইবে ইহা ঠিক নহে। যদি আমরা অজ্ঞানে ডুবিয়া থাকিতে না চাই অথবা যদি আমাদের জ্ঞানের প্রথম সীমা সকলকে ছাড়াইয়া উঠিতে চাই তবে বর্ত্তমানে জগতের সকল অজ্ঞাত পদার্থের জ্ঞান আমাদের মধ্যে ফুটিতে পারে, কারণ সকল পদার্থ জানিবার বৃত্তিসকল মানবরূপী এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে আছে, শুধু আছে নয় সে সমস্ত বৃত্তি মানবের পরিণতির এক অবস্থায় নিশ্চয় ফুটিবে। মানুষের মধ্যে আত্মোপলব্ধির যে দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা ও আকূতি আছে তাহার ফলে, আমাদের বুদ্ধি এ সমস্ত অন্তর্নিহিত শক্তিকে সঙ্কুচিত করিতে চাহিলেও তাহাতে সফল হইতে পারে না। যখন আমরা জড়ের রহস্যোদ্ঘাটনের চেষ্টার ফলে তাহার গোপন শক্তিসমূহকে আয়ত্ত করিব তখন জড়ের যে জ্ঞান আমাদিগকে অস্থায়ী সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছে

তাহাই যেন আমাদিগকে বলিবে 'বাহির হও ছুটিয়া চল জ্ঞানের আরও যত ক্ষেত্র আছে তাহাদের অভিমুখে'—"নিরারত" (ঋগ্বেদ)। আধুনিক জড়বাদের লক্ষ্য যদি হইত শুধু মূঢ়ের মত জড় জীবনকে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকা তাহা হইলে মানুষের প্রগতি বহু বিলম্বিত হইতে পারিত কিন্তু জড় বাদীরও মর্ম্মসত্য জানার অভীপ্সা, জ্ঞানান্বেষণ, তাই সে মধ্য পথে থামিয়া থাকিতে পারিবে না। যেমন সে ইন্দ্রিয় জ্ঞানের এবং ইন্দ্রিয়বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত বিচারবুদ্ধির সীমায় আসিয়া পৌছিবে তাহার জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইবার সেই আকূতি, সেই প্রবেগই তাহাকে সীমার বাহিরে লইয়া যাইবে। এখন যেরূপ ঐকান্তিকতা এবং প্রবল আবেগে যে দৃশ্য জগৎ জয়ে অগ্রসর হইয়াছে আমরা আশাকরি সীমার বাহিরে গিয়া অতীন্দ্রিয় বিষয়েও সেইরূপ একান্তভাবে প্রবলবেগে অগ্রসর হইবে।

শুধু চরম-তত্ত্ববিদ্যায় নয়, জ্ঞানের সাধারণ ধারাতেও দেখিতে পাই যে বিভিন্ন পথে চলিয়াও জ্ঞানের বিভিন্ন ধারা অনেক সময় একই সত্যে পৌছিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই যে উপনিষদের বৈদান্তিক ঋষিগণ যে ভাবে ও ভাষায় সত্য সমূহ বলিয়া গিয়াছেন প্রায় সেই ভাবে ও ভাষায় তাহাদের ধারণা বিজ্ঞান বহুস্থানে সমর্থন করিতেছে। শুধু তাই নয় বর্ত্তমান বিজ্ঞানের আবিষ্কারের নবীন আলোকে প্রাচীন বেদান্তের অনেক সত্য আমাদের কাছে আরও স্ফুটতর হইয়াছে, তাহাদের ভিতরকার পূর্ণ অর্থ ও মর্ম্মসত্য প্রকাশ পাইয়াছে। যেমন ধরা যাইতে পারে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের এই উক্তিটী "বহুনামেকং বীজং বহুধা যঃ করোতি" 'বহুর একটী বীজ বিশ্বশক্তি বহুধা রূপায়িত করিয়াছে'। বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে বেদের উক্তি—'এক মূলতত্ত্ব বহুরূপে রূপায়িত হইতেছে' ইহাই যেন সমর্থন করিয়া বিজ্ঞান বহুত্বের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া এক অদ্বৈতবাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। জড় ও শক্তির (matter and energy'র) দৃশ্যতঃ যে ভেদ আছে তাহাতে এ অদ্বৈতবাদ খণ্ডিত হইতেছে না। কারণ বৈজ্ঞানিকের মতেও মূল জড় তত্ত্ব সাংখ্যের প্রধানের মতই অতীন্দ্রিয় অব্যক্ত পদার্থ। বস্তুতঃ বিজ্ঞানেরও ক্রমশঃ বেশী করিয়া এবোধ জাগিতেছে যে জড়ের রূপে এবং জড় শক্তির রূপে আমাদের ভাবনায় ছাড়া অন্য কোন ভেদ নাই।

কোন অজ্ঞাত শক্তি রূপায়িত হইয়া জড়রূপে ফুটিয়া উঠিতেছে ইহাই তাহার শেষ পরিচয়। প্রাণের গভীর রহস্য আজিও আমরা ভেদ করিতে পারি নাই,

জড় রূপের আধারে বন্দী একটা অস্পষ্ট সংবেদন রূপে যে শক্তি প্রকাশিত হইতেছে তাহাকে আমরা প্রাণ বলিয়া মনে করি। ভেদাত্মিকা যে অবিদ্যা দ্বারা আমরা আবৃত হইয়া আছি তাহাই আমাদিগকে জড় ও প্রাণের মধ্যে এক সমুদ্র ব্যবধান দেখাইতেছে। এই অবিদ্যার কবল হইতে যখন মুক্ত হইব তখন বৈদিক ঋষি যাহাকে ত্রিভুবন বলিয়াছেন সেই জড় প্রাণ ও মন যে একই বিশ্বশক্তির ত্রিধা প্রকাশ বা রূপায়ণ তাহা বুঝিতে পারিব। তখন এক নিশ্চেতন জড়শক্তিই যে মননের জননী এ ধারণা আর টিকিতে পারিবে না। যে শক্তি বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছে তাহা যে একটা ইচ্ছাশক্তি ছাড়া অন্য কিছু হইতে পারে না ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। ইচ্ছা বা সঙ্কল্পের অর্থই এই যে ইহা প্রবৃত্তি বা কর্ম্ম ও তাহার পরিণামের দিকে প্রযুক্ত একটা চেতন শক্তি।

এই ইচ্ছা এই কর্ম্ম ও পরিণামের স্বরূপ কি? ইহা পরমচৈতন্যের আত্ম সংবৃতি (Involution) এবং আত্মবিবৃতি (Evolution) ছাড়া আর কিছু না। তিনি আত্মচৈতন্য ক্রমশঃ সংবৃত বা সঙ্কুচিত করিয়া নিশ্চেতন এবং জড়ে পরিণত হইয়াছেন। আবার জড়ের সেই গুপ্ত অবস্থা হইতে নিত্য নূতন সম্ভাবনাকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতেছেন। এ ইচ্ছা মানুষের মধ্যে অন্তহীন প্রাণ, অসীম জ্ঞান এবং অকুণ্ঠ শক্তি ফুটাইয়া তুলিতে চাহিতেছে। তাই ত [illegible] জ্ঞান এই মর্ত্ত্যদেহে মৃত্যুকে জয় করিতে, তাহার চির অতৃপ্ত জ্ঞানের বিপুল প্রসার করিতে, জড়শক্তিতে পূর্ণশক্তিশালী হইবার স্বপ্ন দেখিতেছে। দেশ ও কালের গণ্ডি সে কাটাইয়া উঠিতে চাহিতেছে। তাহার সিদ্ধির যে সীমা আছে, (জগতে অসম্ভব বলিয়া যে কিছু আছে, ইহা যেন আর সে মানিতে চাহিতেছে না। বোধ হইতেছে যে মানুষ যাহা সতত ইচ্ছা করে তাহা অবশেষে করিবার সামর্থ্য সে লাভ করে,) কারণ সমষ্টি মানবের চেতনাতে অবশেষে তাহা লাভ করিবার শক্তি ফুটিয়া উঠে—ব্যক্তিকে উপায় স্বরূপ ব্যবহার করিয়া কিন্তু যদি আমরা গভীরতরভাবে পর্য্যবেক্ষণ করি তবে বুঝিব যে ইহা সমষ্টি-মানবের ইচ্ছা শক্তি বলেই হয় নাই, পরন্তু অতিচেতন কোন মহাশক্তি ব্যক্তি চেতনাকে কেন্দ্র ও সাধনোপায় করিয়া সমষ্টির উদার পরিবেশের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। যিনি নরকে নিজের প্রতিবিম্বরূপে গড়িয়া তুলিয়াছেন সর্ব্বশক্তিমান সেই নারায়ণই ব্যষ্টি ও সমষ্টির ভিতর দিয়া তাঁহার একত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং সর্ব্বশক্তি ও ঐশ্বর্য্যের আভাস

এইভাবে ফুটাইয়া তুলিতেছেন। "মর্ত্ত্যের মাঝে যিনি অমৃত সেই ভগবানই অন্তরে শক্তিরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া জগৎকে এই পরিণতির পথে লইয়া চলিয়াছেন।" আধুনিক জগৎ নিজের লক্ষ্য সজ্ঞানে না জানিয়াও তাহার সকল কর্ম্মে ও সাধনায় অবচেতন ভাবে বিশ্বশক্তির এই দিব্য প্রেরণাকেই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে।

জড় জগতের এই শক্তিলাভের একটী সীমা ও বাধা তবু এখনও আছে। সীমা, কেন না এ জ্ঞানের ক্ষেত্র এখনও জড় জগৎ, বাধা, কেন না এ শক্তিকে এখনও জড় যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু বিজ্ঞান যে ভাবে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে এ বাধা ও সঙ্কোচও যে দূর হইবে তাহাই যেন মনে হয়। বেতার বার্ত্তায় আমরা একটা নূতন ধারার সন্ধান পাই ; যেখান হইতে বার্ত্তা প্রেরিত হয় এবং যেখানে তাহা গৃহীত হয়এই দুই স্থানে মাত্র যন্ত্রের ব্যবহার এখন চলিতেছে। মধ্যবর্ত্তী ক্ষেত্রে যন্ত্রের প্রয়োজন এখন দূরীভূত হইয়াছে। বিজ্ঞানের জ্ঞানের সীমা যতই অজড়ের দিকে পৌছাইতে থাকিবে ততই যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা এবং অধীনতা কমিতে থাকিবে। কারণ যখন জড়াতীতের গতি প্রকৃতি বুঝা যাইবে তখন শুধু মনঃ-শক্তিদ্বারা জড়শক্তির প্রশাসন কৌশল আবিষ্কৃত হইবে এবং জড়-যন্ত্রের সাহায্য না লইয়া বার্ত্তা প্রেরণ সম্ভব হইবে। এ সত্য যখন আমরা ঠিক বুঝিতে পারিব তখন আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে অতিবিশাল সম্ভাবনার দিক্ চক্রবাল উদ্‌ঘাটিত হইবে।

একথা হয়ত সত্য যে জড় জগতের অব্যবহিত ঊর্দ্ধভূমির জ্ঞানলাভ করিলেও এবং তথা হইতে শক্তি প্রয়োগের সামর্থ্য জন্মিলেও আমাদের সকল সঙ্কোচ বা বাধা কাটিবে না, কারণ তত্তৎ জগতের বিধান আমাদের মানিয়া চলিতে হইবে। আমাদের পূর্ণ-মুক্তি হইবে—যখন আমাদের অহংযন্ত্র সূক্ষ্ম হইতে হইতে, শূন্যে মিলাইয়া যাইবে এবং যখন আর নানা ভাবনাকে জোড়াতালি দিয়া আমাদিগকে একত্ব গড়িয়া তুলিতে হইবে না পরন্তু যে পরম এক বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন তাহার পরম প্রকাশে আমাদের ভিতর বাহির একাকার হইয়া যাইবে। আমাদের মধ্যে বিশ্বজ্ঞানের অবাধ প্রকাশ হইবে এবং বিশ্বশক্তির উপর অকুণ্ঠ অধিকার বা যোগীজন বাঞ্ছিত স্বরাজ্য এবং সাম্রাজ্য লাভ করিব। সালোক্য মুক্তির সহিত সাধর্ম্ম্য মুক্তি আমাদের অধিগত হইবে অর্থাৎ ভগবৎ প্রকৃতি লাভ করিয়া ভগবদ্ ভাবে বিভাবিত হইয়া তাঁহার সহিত নিত্যযুক্ত হইয়া বাস করিবার পরম স্বাধীনতা ও অধিকার প্রাপ্ত হইব।

তৃতীয় অধ্যায়

দুইটী নেতিবাদ

(২)

সন্ন্যাসীর নেতিবাদ

এ সমস্তই ব্রহ্ম, এই আত্মাই ব্রহ্ম এবং এই আত্মা চতুষ্পাৎ। ইনি নির্ব্বিশেষ, অচিন্ত্য, ব্যবহারিক জগতের অতীত, ইহাতে সমস্ত স্থির হইয়া আছে।

মাণ্ডুক্য উপনিষদ (২।৭)

বিশ্বচেতনার পরপারে যাহা শুধু আমাদের ব্যক্তিগত অহংকে নয় বিপুল বিশ্বকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, নিখিল ব্রহ্মাণ্ড যাহার অপরিমেয় পটভূমিকায় অতি তুচ্ছ একটা ক্ষুদ্র ছবি মাত্র, এরূপ এক বিশ্বাতীত চৈতন্য আছে। ইহা সমস্ত বিশ্ব ও তাহার ক্রিয়াবলিকে ধারণ করিয়া অথবা কেবল উপদ্রষ্টারূপে বর্ত্তমান আছে। অতি বিশাল এই বিশ্বপ্রাণকে ইহা আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে অথবা আপন আনন্ত্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে।

জড়বাদী তাহার দিক হইতে যেমন বলিতে পারে জড়ই সত্য পদার্থ, যাহার সম্বন্ধে আমরা একরূপ নিশ্চিত হইতে পারি তাহা এই ব্যবহারিক জগৎ; তাহার অতীত যদি কিছু থাকে তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়, একেবারে অসৎ বা শূন্য না হইলেও মনের একটা স্বপ্ন, সত্যবস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন একটা ভাবনা মাত্র; ঠিক তদ্রূপ সন্ন্যাসী বিশ্বাতীতের ভাবে বিমুগ্ধ ও বিভোর হইয়া তাহার দিক হইতে বলিতে পারে যে শুদ্ধ চিৎই সত্য, ইহাই জন্ম, মৃত্যু ও পরিণাম রহিত একমাত্র তত্ত্ব, এই ব্যাবহারিক জগৎ মন ও ইন্দ্রিয়ের সৃষ্ট কল্পনা বা স্বপ্ন, শুদ্ধ ও শাশ্বত জ্ঞান হইতে পরাঙ্‌মুখ চিত্তের একটা মিথ্যা জ্ঞান মাত্র।

যুক্তি ও অনুভবের সাক্ষ্য পরস্পর বিরোধী এ উভয় মতের অনুকূলে সমানভাবে উপস্থিত করা যাইতে পারে। জড়বাদ ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাক্ষীকে মাত্র বিশ্বাস করিতে বলে, ইন্দ্রিয়দ্বারা জড়জগৎ অনুভূত হয় সুতরাং ইহা সত্য, জড়াতীত কিছু অনুভূত হয় না সুতরাং অতীন্দ্রিয় যাহা কিছু তাহা মিথ্যা বা অ-সৎ (non-existent) ইন্দ্রিয়ের এই দাবী যে সত্য নয় তাহা সহজেই প্রমাণ করা যায়। যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কেবল তাহাকেই সত্য মনে করিবার অভ্যাসের ফলে জড়বাদী বলে যে জড়াতীত কোন সত্য নাই কিন্তু জড়জগতে এমন সব সূক্ষ্ম পদার্থ আছে যাহা ইন্দ্রিয় দিয়া ধরিতে না পারিলেও তাহাদের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করা জড়বাদীর পক্ষেও অসম্ভব। তাহার যুক্তি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় জড়াতীত কিছু নাই ইহা প্রমাণ করিতে গিয়া সে ধরিয়া লইয়াছে যাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয় তাহা সত্য নহে। ইহাতে যাহা প্রমাণ করিতে হইবে তাহাকেই ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, নিরপেক্ষ ভাবে দেখিলে এরূপ বিচারের কোন মূল্য নাই—[এরূপ ভুল বিচারকে ইংরাজীতে argument in a circle বলে—ন্যায়শাস্ত্র মতে সিদ্ধসাধন]।

ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহাকে ধরা যায় না এমন জড়বস্তু যে কেবল আছে তাহা নহে, আমাদের মধ্যে এমন সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়বোধ বা দৃষ্টিশক্তি আছে যাহা দ্বারা জড়-ইন্দ্রিয়ের সাহায্য না লইয়াও জড়বস্তুকে জানা যায়। যাহাদের উপাদান এবং গঠনপ্রণালী আমাদের স্থূলজগতের মত নয় এমন সকল অতীন্দ্রিয় বস্তু বা জগতের সঙ্গেও এই সমস্ত সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় আমাদিগকে পরিচিত করাইয়া দিতে পারে।

মানুষের মধ্যে যখন চিন্তাশক্তির প্রথম উন্মেষ হইয়াছে সেই বহু পুরাকাল হইতে অতীন্দ্রিয় বস্তু ও জগৎ সম্বন্ধে মানুষ তাহার বিশ্বাস ও অনুভবের কথা বলিয়া আসিতেছে। মধ্যে জড় জগতের রহস্যনির্ণয়ের জন্য মানুষের মন একান্তভাবে অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন এ সমস্ত বিষয়ের আলোচনাতে তাহার উৎসাহ কমিয়া গিয়াছিল কিন্তু নূতন ভাবের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা আবার এ সমস্তের দিকে তাকাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এ সমস্ত বিষয়ের প্রমাণ এমনভাবে বাড়িয়া চলিতেছে যে যাহাদের মন কেবলমাত্র অতীতের মোহে আবিষ্ট অথবা যাহাদের বুদ্ধি শাণিত থাকা সত্ত্বেও অনুভব এবং অনুসন্ধানের স্বরচিত সঙ্কীর্ণ গণ্ডির বাহিরে কিছু দেখিতে চায় না কিম্বা যাহারা পূর্ব্বযুগের

মৃত বা মুমূর্ষু মতবাদগুলিকে রক্ষা করিবার একান্ত চেষ্টা করা এবং তাহাদের পুনরাবৃত্তি করাই যুক্তি এবং জ্ঞানালোক বলিয়া ভুল করে তাহারা ছাড়া অন্য সকলে অতীন্দ্রিয় বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছে। এই সমস্ত প্রমাণের মধ্যে দূর-অনুভূতি (প্রাকাম্য) বা তদনুরূপ অলৌকিক রহস্যের কোন কোন বাহ্য-বিভূতিকে এখন আর কেহ বড় সন্দেহের চক্ষুতে দেখে না।

রীতিমত ভাবে অনুসন্ধানের ফলেও জড়াতীত তত্ত্বের আভাস মাত্র মানুষ পাইয়াছে বলিতে হয়, যে আভাস পাইয়াছে তাহাও অপূর্ণ এবং অস্পষ্ট। কারণ যেভাবে যে পদ্ধতিতে এবিষয়ের গবেষণা চলিয়াছে তাহা এখনও অনেকটা অপক্ক এবং দোষত্রুটীপূর্ণ, তৎসত্বেও আমাদের বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা জানা যায় না জড়-জগতের তেমন অনেক তথ্য পুনরাবিষ্কৃত এই সমস্ত সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় আমাদিগকে দিয়াছে। সেই সমস্ত সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় আমাদিগকে জড়াতীত জগতের সংবাদ যখন দিতে আসে তখনই তাহাদের সাক্ষ্য মিথ্যা হইবে একথাও সমর্থন করা যায় না। সকল সাক্ষ্যকে এমন কি আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয় দত্ত সাক্ষ্যকেও যুক্তিদ্বারা পরীক্ষা করিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া যেমনভাবে বুঝিয়া লইতে হয়, তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্র, বিধান এবং পদ্ধতির সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিয়া তবে তাহাদিগকে যেমন গ্রহণ করিতে হয়, এ সমস্ত সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যকে তেমনি ভাবে বুঝিতে এবং গ্রহণ করিতে হইবে একথা খুবই সত্য। কিন্তু জড়জগতের সত্যের জড় ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধ হইয়া আত্মপরিচয় দিবার যেমন দাবি আছে, বৃহত্তর অনুভূতির ক্ষেত্রে সূক্ষ্মতর উপাদানে গঠিত বস্তু ও জগতের তদুপযোগী সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধ হইয়া আত্মপরিচয় দিবার ঠিক তেমনিভাবে দাবি নিশ্চয়ই আছে। এই জগতের অতীত মহান্ রূপরেখায় যাহাদের রূপায়ন, বিপুল শক্তি ও বিধানের যাহারা আধার সেইরূপ অনেক জগৎ আছে। তাহাদের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য তদুপযোগী জ্যোতির্ম্ময় বৃত্তি ও সাধন আমাদের মধ্যে আছে। তথা হইতে তাহাদের শক্তির আবেশ এই জড় আবেষ্টনে এই জড় দেহে অনেক সময় নামিয়া আসে এবং এইখানেই তাহাদের প্রকাশ ক্ষেত্র গড়িয়া তোলে। তাহারা যে আলোর দূত পাঠায় তাহাদের কাছে তাহাদের পরিচয়ও কিছু পাওয়া যায়।

আমাদের সকল অনুভবের মূলে রহিয়াছে চৈতন্য যাহাকে সাক্ষী-চৈতন্য বলা যায়। বিশ্বজগৎ তাহার অনুভবের ক্ষেত্র এবং ইন্দ্রিয়গণ অনুভবের দ্বার

বা উপায়। জড় জগৎ এবং তাহার বস্তুনিচয় হউক অথবা জড়াতীত বস্তু বা জগৎই হউক, জগৎ এক বা বহু হউক এই সাক্ষী-চৈতন্যের কাছে সত্য বলিয়া যাহা প্রতিভাত হইবে কেবলমাত্র তাহাই সত্য বলিয়া আমরা জানিব। মানুষ জগৎকে নিজ চৈতন্যে বিষয়রূপে প্রতিভাত দেখিতে বাধ্য; কারণ—ইহা মানব-চৈতন্যের বৈশিষ্ট্য। এক পক্ষের যুক্তি এই…মানুষের এইভাবে দেখা শুধু মানুষের দেখার বেলায় সত্য তাহা নহে। সমস্ত জগৎ ব্যাপারেটা এইরূপ, এখানে এক সাক্ষী-চৈতন্য আছে, জগতের সমস্ত পদার্থ ক্রিয়া বা ভাব এই সাক্ষী-চৈতন্যের বিষয়; সাক্ষী থাকিবে না সাক্ষ্য বা বিষয় ও ক্রিয়া থাকিবে ইহা হইতে পারে না, কারণ এই চৈতন্যের মধ্যে এই চৈতন্যের জন্যই বিশ্ব বর্ত্তমান রহিয়াছে, বিশ্বের বা তাহার কোন ক্রিয়ার তদতিরিক্ত কোন স্বাধীন সত্তা নাই। জড়বাদীর পক্ষ হইতে ইহার এই উত্তর দেওয়া হয় যে জড়জগতের একটা শাশ্বত সত্তা আছে তাহা কাহারও দ্বারা সৃষ্ট নহে। এজগতে জীবন এবং মনের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও ইহা বর্ত্তমান ছিল এবং প্রাণ ও মনের ক্ষণিক দীপ্তি আবার যেদিন নির্ব্বাপিত হইয়া তাহাদের বিলয় হইবে সেদিনও জড় জগৎ থাকিবে। তত্ত্ব জিজ্ঞাসার বিপরীতমুখী এ ধারা দুইটীর ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে মূল্য খুব বেশী। কারণ এই তত্ত্ববিদ্যা হইতে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া উঠে যাহা দ্বারা তাহার জীবন, যে জন্য সে সাধনা করে সেই লক্ষ্য এবং যেখানে তাহার শক্তি নিবদ্ধ রাখে সেই ক্ষেত্র পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত হয়। কেননা ইহার মূলে রহিয়াছে 'বিশ্ব সত্য কিনা' এবং তদপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয় 'মানব জীবনের মূল্য কি' এই গুরুতর প্রশ্ন।

জড়বাদের সিদ্ধান্তকে যদি আমরা একান্ত করিয়া ধরি তবে দেখিব যে ব্যক্তির বা জাতির জীবন ও নিয়তি আমাদের কাছে তুচ্ছ এবং অসম্ভব হইয়া উঠিবে। এ মতে ভালভাবে আমরা ইহাই জানিব যে ব্যক্তি নাড়ীচক্রের বা স্নায়ু-মণ্ডলীর বিকার হইতে জাত ক্ষণস্থায়ী এবং জাতি তাহারই একটু দীর্ঘতর কালস্থায়ী একটা মিথ্যা মানসিক বোধ মাত্র। তখন ন্যায়তঃ হয় এই ক্ষণস্থায়ী জীবন হইতে যতটা সুখ ও ভোগ আদায় করা যায় তাহা করা উচিত হইবে (—যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ) না হয় জাতি ও ব্যক্তির নিঃস্বার্থ কিন্তু লক্ষ্যহীন সেবায় জীবন কাটাইতে হইবে। আমরা যে জড়শক্তির তাড়নায়

কাজ অথবা ভোগ করি তাহা আমাদিগকে ক্ষণস্থায়ী এবং মিথ্যা একটা জীবন দিয়া বিভ্রান্ত করে অথবা নৈতিক এবং মানসিক পূর্ণতার মিথ্যা একটা মহত্তর বোধ দিয়া বঞ্চনা করে। জড়বাদও শেষকালে আধ্যাত্মিক অদ্বৈত বাদের মত সদসদাত্মিকা এক মায়াতে আসিয়া পৌছে। সৎ, কেন না ইহা প্রত্যক্ষ এবং ইহাকে স্বীকার না করিয়া পারা যায় না, অসৎ, কেননা ইহা প্রাতিভাসিক এবং ক্ষণস্থায়ী। অপর পক্ষে বাহিরের এই জগৎ মিথ্যা, মায়াবাদের এই মতের উপর যদি বেশী জোর দিই তবে অন্য পথে জড়-বাদের সিদ্ধান্তের অনুরূপ কিন্তু তদপেক্ষা কঠোরতর এক সিদ্ধান্তে পৌছিব। তখন বলিব এই জগৎ, আমাদের অহং, মানবের জীবন স্বপ্নের মত অলীক, ইহাদের কোন লক্ষ্য নাই, প্রাকৃত জীবনের অর্থশূন্য জটিল জালের এই বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া এক নির্ব্বিশেষ সৎ বা এক পরম অ-সতের মধ্যে বিলীন হইয়া যাওয়া মানবজীবনেব যুক্তিযুক্ত সার্থকতা।

আমাদের প্রাকৃত জীবন হইতে যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি, তাহাকে ভিত্তি করিয়া যুক্তি-তর্ক দ্বারা এ রহস্য আমরা সমাধান করিতে পারিব না। অনুভূতির যেখানে অভাব বা ফাঁক আছে সেখানে শুধু বিচার দ্বারা স্থির সিদ্ধান্তে পৌছানো যায় না। আমাদের প্রাকৃত চেতনায় একদিকে যেমন আমরা দেহধারী ব্যক্তিচেতনাব অতিবিক্ত বিশ্ব-মন বা অতিমানস বলিয়া যে কিছু আছে তাহা স্পষ্টভাবে অনুভব করি না, অপরদিকে আমাদের অন্তরাত্মাকে দেহের উপর পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেই হইবে, দেহ পাতের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও লয় হইবে অথবা দেহকে ছাপাইয়া গিয়া তাহার সম্প্রসারণ যে একেবারে অসম্ভব জোর করিয়া এরূপ বলিবার কোন প্রামাণ্য অনুভবও আমাদের নাই। সুতরাং হয় আমাদের চৈতন্যের ক্ষেত্রের আরও সম্প্রসারণ করিয়া না হয় জ্ঞানলাভের যে যন্ত্র আমাদের আছে তাহার অপ্রত্যাশিত উৎকর্ষসাধন করিয়া আমাদিগকে মায়াবাদ ও জড়বাদের এই প্রাচীন তর্কের সমাধান করিতে হইবে।

সন্তোষজনক ভাবে চৈতন্যের এই সম্প্রসারণ করিতে হইলে ব্যক্তিগত চৈতন্যের অন্তর্জীবন সম্প্রসারণ করিয়া তাহাকে বিশ্বচেতনায় পৌছিতে হইবে, কারণ যে সাক্ষীচৈতন্যের কথা উক্ত হইয়াছে সে সাক্ষীচৈতন্য যদি সত্যই থাকে তবে তাহা

জগতে জাত ব্যক্তিগত শারীর চৈতন্য বা মন নহে। পরন্তু যিনি বিশ্বচৈতন্য, নিখিল বিশ্বে সর্ব্বগত ভাবে বা অন্তর্যামী বোধি-চৈতন্যরূপে নিত্য প্রতিষ্ঠিত, বিশ্ব তাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে তাহারই শাশ্বত ও সত্য প্রকাশরূপে, অথবা তাহারই জ্ঞান ও শক্তির প্রভাবে তাহা হইতে জাত হইয়াছে এবং তাহাতেই লয় পাইবে। যুগপৎ যিনি প্রাণবন্ত পৃথিবী এবং সজীব মানব দেহের মধ্যে শান্ত ও শাশ্বতরূপে অবস্থিত আছেন এবং ভিতর হইতে ইহাদিগকে ফুটাইয়া তুলিতেছেন, যিনি মন ছাড়া মনন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ছাড়া দর্শনাদি করিতে পারেন, শারীরচৈতন্য নয় তিনিই বিশ্বের সাক্ষীচৈতন্য ও প্রভু।

মানুষের মধ্যেও বিশ্ব-চেতনার প্রকাশ যে হইতে পারে এ সম্ভাবনা আধুনিক মনোবিজ্ঞানও ধীরে ধীরে স্বীকার করিতেছে, আমাদের জ্ঞানলাভের আরও যে সূক্ষ্ম উপায় আছে একথাও মানিতে চাহিতেছে—যদিও ইহার মূল্য এবং শক্তি যখন স্বীকার করিয়াছে তখনও ইহাকে চিত্তবিভ্রমের পর্য্যায়ে ফেলিতে বিরত হয় নাই। প্রাচ্যের মনোবিজ্ঞান ইহাকে সত্য বলিয়া বরাবরই স্বীকার করিয়াছে এবং ইহাকে অনুভব করার দিকে আমাদের ভিতরের পরিণতির গতি রহিয়াছে ইহা বলিয়াছে। আমাদের অহং বোধ যে সীমা নির্দ্দেশ করে তাহাকে অতিক্রম করিয়া যাহা সজীব এবং আমরা যাহাকে নির্জীব মনে করি সে সমস্তই যাহার পক্ষপুট তলে আশ্রিত রহিয়াছে সেই বিশ্বচৈতন্যের সহিত একাত্মতা অনুভব করা যে আমাদের সাধনার লক্ষ্য তাহা স্বীকৃত হইয়াছে।

বিশ্বচেতনার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিশ্ব সত্তার সহিত তাহারই মত আমরা এক হইয়া থাকিতে পারি, তখন আমাদের চেতনার এবং এমনকি ইন্দ্রিয়ানুভবেরও রূপান্তর হইতে আরম্ভ হয়। ফলে আমরা বুঝিতে পারি জড়ও সেই অখণ্ড সত্তা। সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় প্রত্যেক জড় পদার্থ জড় সত্তায় অন্য পদার্থ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও সেই সত্তা এবং তাহার অন্য বহুরূপের সহিত যোগরক্ষা করিয়াছে। তেমনিভাবে মন এবং প্রাণও একেরই বহুরূপে প্রকাশ, প্রত্যেক প্রকাশ পৃথক হইয়াও প্রত্যেকের ক্ষেত্রের অনুরূপ ভাবে অপরের সহিত একত্রে মিলিত হইতেছে। এইভাবে যদি আমরা অগ্রসর হইতে চাই তবে অনেক ধাপের পরে অতিমানসের জ্ঞানলাভ করিব এবং সকল নিম্নতর ক্রিয়া তাহারই ক্রিয়া বলিয়া বুঝিতে পারিব। তখন আমরা যে কেবল বিশ্বচৈতন্যের

অস্তিত্ববোধ লাভ করিব, সজ্ঞানে তাহাকে অনুভব করিতে পারিব তাহা নহে পরন্তু তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহার সহিত এক হইয়া যাইতে পারিব। এখন যেমন আমরা অহং বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছি তখন তেমনি এই অতিমানসে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কর্ম্ম করিতে পারিব, ক্রমশঃ অন্য মন প্রাণ অন্য শরীরের সহিত একত্ব বোধে বেশী করিয়া মিলিত হইব এবং নিজেদের এবং অপরের এমনকি প্রাকৃত জগতের উপর এমন দিব্য প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইব যাহা আমাদের বর্ত্তমান সঙ্কুচিত অহমিকার শক্তির এমনকি কল্পনারও অগোচর।

যে লোক বিশ্বচৈতন্যের এইপ্রকার সংস্পর্শ লাভ করিয়াছে এবং তাহাতে বাস করিতেছে তাহার পক্ষে এ চৈতন্য পার্থিব জগৎ হইতে অধিকতর সত্য। ইহা যে শুধু স্বরূপে সত্য তাহা নহে, ইহা কর্ম্মে এবং পরিণামেও সত্য। এইভাবে যে জগৎ তাহার নিজের আত্মপ্রকাশ সে জগতের কাছে ইহা সত্য এবং জগৎও ইহার কাছে সত্য। কিন্তু স্বতন্ত্র সত্তারূপে জগৎ সত্য নয়। সেই উচ্চতর অবস্থা, যেখানে আমাদের সকল সংস্কার খসিয়া পড়ে, যেখানে চৈতন্য এবং সত্তাতে কোন ভেদ নাই, তাহার ক্রিয়া এবং গতিও স্বপ্ন বা মিথ্যা নহে। তাহার চৈতন্যে অবস্থিত আছে বলিয়াই জগৎ সত্য, কারণ তাহার সত্তার সহিত অভিন্না চৈতন্যময়ী শক্তি এ জগতের স্রষ্ট্রী। বরং জড়ের বিবিক্ত স্বতন্ত্র সত্তা অসম্ভব এবং মিথ্যার ছলনা।

কিন্তু যে চিৎসত্তা এই অতিমানসের স্বরূপ সত্য তিনি একদিকে নিজেকে বিশ্বছন্দে লীলায়িত করিলেও বিশ্বের অতীতও বটে এবং বিশ্ব ভিন্নও তাহার স্বতন্ত্র সত্তা আছে। জগৎ তাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে কিন্তু তিনি জগৎ আশ্রয় করিয়া নাই। আমরা যেমন বিশ্বচৈতন্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত বিশ্ব-সত্তার সহিত এক হইয়া যাইতে পারি—তেমনি এই বিশ্বাতীত চৈতন্যেও আমরা অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারি এবং বিশ্বসত্তাকেও অতিক্রম করিয়া যাইতে পারি, তখন আমাদের মধ্যে জাগে সেই পুরাতন প্রশ্ন 'এই বিশ্বাতীত কি অপরিহার্য্য রূপে জীব-জগৎ-বিশ্ব-বিবর্জ্জিত' 'সেখানে পৌছিলে তাহার সহিত বিশ্বের সম্বন্ধ কি হইবে'।

বিশ্বাতীত অবস্থায় পৌছিবার দুয়ারে উপনিষদ যাহাকে শুদ্ধ ক্রিয়াশূন্য অস্নাবির (স্নায়ুশূন্য) বলেন, যিনি সমস্ত জগতের আশ্রয় স্থান, যাহাতে দ্বৈতের

মালিন্য নাই, ভেদের ব্রণ নাই, বহুত্বের কোন প্রকাশ নাই, অদ্বৈত বেদান্তীরা যাহাকে নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বলেন তাহার সাক্ষাৎ পাই। সাধকের মন যখন মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বগুলিকে বাদ দিয়া হঠাৎ এই স্থানে প্রবেশ করে তখন জগৎমিথ্যা এবং এই অমেয় নৈঃশব্দ্যই একমাত্র সত্য এইরূপ মনে করে। মানুষের মন যে সমস্ত অতিবিশাল এবং প্রতীতিজননক্ষম অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে—এ অনুভূতি তাহাদের অন্যতম। এই বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপের অথবা ইহার অতীত অসম্ভূতির (non-being) যে অনুভূতি হয় সেখানে আমরা দ্বিতীয় নেতিবাদের মূল দেখিতে পাই। সন্ন্যাসীর এই নেতিবাদ অপর প্রান্তস্থিত জড়বাদীর নেতিবাদের অনুরূপ কিন্তু তাহা অপেক্ষা আরও পূর্ণ, আরও চূড়ান্ত এবং আরও বেশী বিপজ্জনক—সেই ব্যক্তি ও জাতির পক্ষে যাহার কানে ইহার সেই গভীর আহ্বানধ্বনি আসিয়া পৌছে।

প্রাচীন আর্য্য জাতি চিৎ ও জড়ের মধ্যে যে সমন্বয়ের সন্ধান পাইয়াছিলেন বৌদ্ধ ধর্ম্ম আসিয়া জড়ের বিরুদ্ধে চিতের বিদ্রোহ তুলিয়া সেই সমন্বয়ের ভিতরে এক বিক্ষোভ আনয়ন করে এবং তাহার পর হইতে ২০০০ বৎসর পর্য্যন্ত এই নেতিবাদ ভারতীয় মনকে প্রধান ভাবে পরিচালিত করিয়াছে। জগৎ মিথ্যা এই বোধই যে ভারতীয় ভাবধারার সর্ব্বস্ব তাহা নহে, যাহারা ইহা স্বীকার করে নাই এমন অনেক দর্শন এবং ধর্ম্মমত ও অভীপ্সা ভারতে দেখা গিয়াছে। চরম পন্থী দার্শনিক মতের যে মিলনের চেষ্টা হয় নাই তাহাও নহে। তৎসত্ত্বেও একথা বলা চলে যে ভারতবর্ষ এই বিশাল নেতিবাদের ছায়াতলেই সে যুগে বাস করিয়াছে এবং সন্ন্যাসীর গৈরিক বাস জীবনের শেষ কাম্য মনে করিয়াছে। বুদ্ধদেব প্রচারিত কর্ম্মের শৃঙ্খল, বন্ধন এবং মুক্তির একান্ত বিরোধ, জন্মেই বন্ধন এবং জন্মরহিত হইতে পারিলেই মুক্তি, এই সমস্ত জ্ঞান আসিয়াছে। তাই প্রায় সকলেই সমস্বরে বলিয়াছেন যে এই দ্বৈতের জগতে স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হইতে পারে না, নিত্য বৃন্দাবনের পরমানন্দ অথবা ব্রহ্মলোকের অন্তহীন রসোল্লাস অথবা অনির্ব্বচনীয় এক নির্ব্বাণ যেখানে এক নির্ব্বিশেষ একত্বের মধ্যে সকল বহুত্বের চির অবসান তাহাই পরম কাম্য। পরবর্ত্তী যুগেও বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত বহু সাধু সন্ত বহু গুরু আসিয়াছেন, ভারতবাসীর হৃদয়ে যাহাদের পবিত্র এবং উজ্জ্বল স্মৃতি রহিয়াছে তাঁহারা এই সুদূর অভিযানের পথেই মানুষকে

ডাকিয়াছেন। বৈরাগ্যই যে জ্ঞান লাভের একমাত্র পথ, পার্থিব জীবন গ্রহণ করা অজ্ঞানের নামান্তর, মানুষের জন্মের খাঁটি ব্যবহার জন্মের শৃঙ্খল হইতে মুক্তি, চিৎ স্বরূপের আহ্বান, জড় হইতে পলায়ন, ইহাই তাহারা বলিয়া আসিয়াছেন।

বর্ত্তমানে সন্ন্যাসীর বৈরাগ্যের যুগ চলিয়া গিয়াছে বা যাইতে বসিয়াছে। তাই এ যুগের মানুষ বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে যে জাতি একদিন মানব-সভ্যতাকে অগ্রগতি দিবার বিপুল দায় বহন করিয়াছে, মানুষের জ্ঞানের ও কর্ম্মের ভাণ্ডারের জন্য নানাপ্রকার সম্পদ আহরণ করিয়াছে সেই প্রাচীন জাতি আজ কর্ম্মক্লান্ত এবং অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে; তাহার প্রাণশক্তিতে ভাটা ধরিয়াছে বলিয়া তাহার কর্ম্মবিমুখতা সমর্থনের জন্য এই বৈরাগ্যের ধুয়া তুলিয়াছে; কিন্তু তাহারা ভুলিয়া যায় যে আমাদের জীবনের সম্ভাবনা সমূহের অতি উচ্চতম শিখরে অবস্থিত এক পরম ও সচেতন অনুভূতির সহিত এই অবস্থা অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত এবং ইহার মধ্য দিয়া সত্তার একটী সত্য বিভাব প্রকাশ পাইয়াছে। তাহা ছাড়া ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে মানুষের পূর্ণতা লাভের পথে এখনও ইহা একটী অপরিহার্য্য উপাদান এবং যতদিন পর্য্যন্ত জীবনের অন্য প্রান্তে মানুষের মন ও প্রাণ পাশবিকতার হাত হইতে মুক্ত না হইতেছে ততদিন এ বৈরাগ্যের বিশেষ সাধনাও শ্রেয়স্কর।

জীবনের সার্থকতার জন্য আমরা একটা বৃহত্তর এবং পূর্ণতর ইতি খুঁজি ইহা ঠিক। আমরা ইহা বোধ করি যে সন্ন্যাসীর আদর্শে বেদান্তের এক মহাসত্য 'একমেবাদ্বিতীয়ং' স্বীকার করা হইয়াছে কিন্তু 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই দ্বিতীয় মহাবাক্যের মর্য্যাদা সেরূপ পূর্ণভাবে দেওয়া হয় নাই। মানুষের আকুল অভীপ্সা ইহাতে যেরূপ উর্দ্ধে ব্রহ্মাভিমুখে গিয়াছে সেইভাবে সেই ব্রহ্মেরই প্রকাশ ক্ষেত্র এই জগতের বুকে ভাগবতী জ্যোতি ও শক্তিকে নামাইয়া আনিবার চেষ্টা হয় নাই। আত্মাতে সত্য যেরূপ পূর্ণ ও সুন্দরভাবে দেখা হইয়াছে জড়ের ক্ষেত্রে তাহার অর্থ তেমনভাবে বুঝা হয় নাই। সন্ন্যাসী পরমতত্ত্বের উত্তুঙ্গ শিখরে পৌছিয়াছে বটে কিন্তু প্রাচীন বৈদান্তিকের মত ব্যাপ্তি ও পূর্ণতা তেমন ভাবে লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু আমাদের পূর্ণতর ইতির ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াও ইহার বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক আবেগ ও আকুতিকে

আমরা যেন ছোট করিয়া না দেখি। আমরা দেখিয়াছি জড়বাদ কিভাবে ভগবদুদ্দেশ্য সাধনে সহায় হইয়াছে কিন্তু একথা আমাদিগকে অকপটে স্বীকার করিতে হইবে যে সন্ন্যাসীর নেতিবাদ সে উদ্দেশ্য সাধনে বৃহত্তর সহায়তা করিয়াছে। জড়বিজ্ঞানের অনেক সত্যের আকার হয়ত ভবিষ্যতে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে তবু আমরা যে বৃহৎ ও পূর্ণ সাম্য চাই তাহাতে বিজ্ঞানের সত্যকে স্থান দিতেই হইবে, তেমনি প্রাচীন আর্য্য সভ্যতা হইতে আমরা যে সত্য পাইয়াছি তাহার পরিমাণ হ্রাস হওয়া বা মূল্য কমিয়া যাওয়া সত্বেও তাহার মধ্যে যে সত্য ছিল তাহাকে রক্ষা করা এবং আমাদের অভীপ্সিত জীবনে তাহাব স্থান দেওয়া আরও বেশী প্রয়োজন একথা যেন না ভুলি।

চতুর্থ অধ্যায়

সর্ব্বগত ব্রহ্ম

যে ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া জানে সে অসৎসমই হইয়া থাকে, ব্রহ্মকে যদি সৎ বা অস্তিস্বরূপ বলিয়া কেহ জানে তাহাকে সৎস্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করা যায়।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ (২।৬)

শুদ্ধ চিৎস্বরূপ যিনি তিনি আমাদের মধ্যে অকুণ্ঠভাবে প্রকাশিত হইতে চান এবং বিশ্বজড় আমাদের প্রকাশের কারণ ও আধার হইতে চায়, জীবনের পূর্ণতার জন্য এ উভয়ের কাহারও দাবি যখন অস্বীকার করিলে চলে না, তখন আমাদিগকে এমন একটী সত্যকে আবিষ্কার করিতে হইবে যেখানে কাহারও মর্য্যাদা ও অধিকার বিন্দুমাত্র খর্ব্ব না করিয়া এ দুয়ের পূর্ণ সমন্বয় সাধিত হইতে পারে। কারণ যেখানেই কোন চরম উক্তি মানুষের মনকে প্রবলভাবে অভিভূত করে সেখানে যে কেবল ভ্রান্তি ও কুসংস্কার মাত্র আছে তাহা হইতে পারে না, আমরা দেখিতে না পাইলেও সেখানে প্রচ্ছন্নভাবে সত্যের এমন একটা বৃহৎ দিক আছে যাহাকে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করিলে আমাদিগকে তজ্জন্য দণ্ডভোগ করিতে হইবে। অনেক সময় আমরা এ উভয়ের মধ্যে একটা জোড়াতালি দেওয়া আপোষ করিয়া কাজ চালাইতে চাই কিন্তু তাহা বেশী দিন টিকেনা, কারণ আপোষ ত সত্যকার সমন্বয় নয়। খাঁটিভাবে সমন্বয় হয় তখন, যখন এমন এক সত্যের সাক্ষাৎ লাভ হয় যাহাতে উভয়ের পূর্ণ পরিচয় উভয়ে পায় এবং যাহার শেষ পরিণাম উভয়ের একাত্মবোধের অন্তরঙ্গতায়। জড় ও চিতের এইরূপ পূর্ণ সমন্বয় সাধন করিয়াই আমাদের জীবনের এমন এক অটল ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে, যেখানে দাঁড়াইয়া জীবন ভিতরে ও বাহিরে পূর্ণ ও সার্থক হইয়া উঠিবে।

আমরা দেখিয়াছি যে বিশ্বচেতনাতে জড় চিতের কাছে সত্য এবং চিৎ জড়ের কাছে সত্য। অহমিকাময় সাধারণ চিত্তে প্রাণ ও মন ভেদের কারণ হইয়া অবিজ্ঞেয় পরমার্থতত্ত্বের ইতি ও নেতিমূলক দুইটী বিভাবের মধ্যে যেন একটা কলহ সৃষ্টি করে। কিন্তু বিশ্বচেতনায় অনুপ্রবিষ্ট হইলে মন যে জ্ঞানের দীপ্তি পায় তাহাতে একত্বের সত্য, বহুত্বের সত্য এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যে সমস্ত যোগসূত্র রহিয়াছে তাহাদের সত্য বুঝিতে পারে। তখন তাহার কাছে সকল বিরোধের শান্তি হয় এবং এক দিব্য সুরসঙ্গতির মধ্যে সকল তারের ঝংকার সমন্বিত হইয়া গিয়াছে দেখিতে পায়, তখন সে মন ভগবান ও জীবের মধ্যে পরম মিলন সাধনের উপায় হয়। তখন অপরোক্ষানুভূতি-লব্ধ জাগ্রত সূক্ষ্মইন্দ্রিয় বোধ যুক্ত সেই মনে জড় চিতের বিগ্রহ, দেহ বা আধাররূপে এবং চিৎ জড়ের আত্মা, সত্য এবং সারতত্ত্বরূপে প্রকাশ পায়। তখন উভয়ের পক্ষে উভয়কে দিব্য সত্য এবং মূলতঃ এক বলিয়া বুঝিতে আর কোন বাধা থাকে না। পরমচৈতন্যময় যে সত্তা আত্মবিস্তার করিয়াছেন ও সমস্ত জড় আকারের মধ্যে বাস করিয়া প্রতিচিৎকেন্দ্র হইতে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, মন ও প্রাণ তাহার রূপায়ন ও যন্ত্র, এ সত্য আত্মপ্রকাশ করে। মন যখন তাহাকে ধারণ ও প্রকাশ করিবার স্বচ্ছ মুকুরে পরিণত হয় এবং প্রাণ যখন নিত্য নবীন রূপ ও ক্রিয়ার মধ্য দিয়া তাহারই অভিব্যক্তির শক্তিস্বরূপ হইয়া উঠে তখন মন প্রাণও সার্থক হইয়া উঠে।

এইভাবে দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি যে এই জগতেই মানুষের পক্ষে দিব্য জীবন লাভের সত্য সম্ভাবনা আছে। এ দৃষ্টি জগৎ এবং পার্থিব পরিণতির মধ্যে একটা সুস্পষ্ট লক্ষ্য এবং সজীব অর্থ দেখিতে পাইয়া যেমন একদিকে বিজ্ঞান সাধনার সার্থকতা দেখাইবে তেমনি অন্যদিকে মানুষের সত্তাকে দিব্য ভাগবৎ সত্তায় রূপান্তর করিয়া সকল প্রধান ধর্ম্ম যে বৃহৎ আদর্শের স্বপ্ন দেখে মানুষের সেই আধ্যাত্মিক আকুতিরও পূর্ণতা সাধন করিবে।

দিব্য জীবনের মধ্যে প্রকাশের দিক দেখিতে গিয়া নিষ্ক্রিয় শুদ্ধ স্বয়ম্ভু নির্গুণ নির্ব্বিকার যে সত্তা, যাহাতে পৌঁছা সন্ন্যাসীর জীবনের পরম পুরুষার্থ, তাহাকে কি অস্বীকার করিব? না, তাহা করিব না, আমরা উভয়কে স্বীকার করিয়া এ উভয়ের মধ্যে এক পরম সমন্বয় আবিষ্কার করিব। দেখিব নির্গুণ নিষ্ক্রিয়

এবং সগুণ সক্রিয় ব্রহ্ম একে অপরকে অস্বীকার করে না, ইহারা এ পরংব্রহ্ম বা পরমতত্ত্বের নেতি এবং ইতিবাচক দুইটী দিক মাত্র। একে অপরকে ছাড়িয়া সত্য নহে। প্রকাশশীলা ক্রিয়াময়ী বিশ্বজননী যাহাকে পরাবাক্ বলা হয়, এই নৈঃশব্দ্যের মধ্য দিয়াই নিত্য প্রকাশিত হন এবং নৈঃশব্দ্যের মধ্যে যাহা গূঢ় (latent) ভাবে স্থিত তাহাকেই জীবজগৎরূপে প্রকাশ করেন। এই যে শাশ্বত নিষ্ক্রিয়তা নিত্য বর্ত্তমান আছে তাহাকেই ভিত্তি করিয়া অগণিত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির অকুণ্ঠিত দিব্য লীলা চলিতেছে। নিষ্ক্রিয়তা ক্রিয়াশীলতাকে সম্ভব করিয়াছে। সম্ভূতির (বা becomingএর) সমস্ত শক্তি ও সম্ভাবনা সেই শাশ্বত নির্গুণ সত্ত্বা হইতে আসিতেছে। তিনি স্বয়ং অপরিণামী হইয়াও অনন্ত সৃষ্টির নিরপেক্ষ ভর্ত্তা ও অনুমন্তা।

মানুষও যখন তাহার অন্তরে এক পরম শান্তি এবং নিষ্ক্রিয়তার সাক্ষাৎ পায় অথচ ইহাও বুঝিতে পারে যে ভিতরের সেই নৈঃশব্দ্য হইতে তাহারই দিব্য আনন্দে ও অনুমোদনে তাহার নিজের ও বিশ্বের অকুণ্ঠ ও অফুরন্ত কর্ম্মধারা প্রবাহিত হইতেছে তখনই সে পূর্ণতা লাভ করে। অতএব নৈঃশব্দ্যের প্রকৃতি যে বিশ্ব কর্ম্মের নিরোধ একথা সত্য নহে। যে মন ইতি এবং নেতির দ্বন্দ্বের মধ্যে বাস করিতে অভ্যস্ত, সেই মন যখন ক্ষর জগতের কোটি হইতে অক্ষরের কোটিতে উপনীত হয় তখন সাধারণতঃ সেই ব্যাপক ও উদার চৈতন্যের অনুভূতি পায় না যে চৈতন্য নিষ্ক্রিয়তা এবং সক্রিয়তা, ক্ষর ও অক্ষর এ উভয় ভাবকে যুগপৎ ধারণ করিয়া আছে। তাই সে ভুল করিয়া ক্রিয়াশীলতাকে, জগৎকে মিথ্যা মনে করে। যিনি জগদতীত অশব্দ তিনি জগৎকে, কর্ম্মকে নিরাকৃত করেন না, পরন্তু ধারণ করিয়া রাখেন; অথবা কর্ম্ম প্রবৃত্তি এবং কর্ম্ম নিবৃত্তি উভয়ই সমভাবে তাহাকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পায় এবং তাহারই অনুমোদনে মানুষ আত্মাতে স্বাধীন ও স্থির অথচ সর্ব্বকর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়াও নিষ্ক্রিয়তা এবং সক্রিয়তার সমন্বয় সাধন করিতে পারে।

আর একটা খট্‌কা উঠিতে পারে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে 'অসদ্বা-ইদমগ্রমাসীৎ ততো বৈ সদজায়ত' অসৎ বা (non-being) ছিল সকলের আগে, তথা হইতে সৎ (existence or being) জাত হইয়াছে। তাহা হইলে অসতের মধ্যে নিশ্চয়ই সকলকে আবার ফিরিয়া যাইতে হইবে, সুতরাং কর্ম্ম ও

জগতের অত্যন্তনিবৃত্তিই শেষ কথা। অনন্ত নিষ্ক্রিয় সৎ স্বরূপের মধ্যে ক্রিয়াশীল বহুত্বের প্রকাশ সম্ভাবনা আছে স্বীকার করিলেও এই অসৎ, যাহা সকল অবস্থার আদিভূত এবং একমাত্র শাশ্বত সত্য, বিশ্বের সকল সম্ভাবনাকে কি প্রকৃতই নিরাকৃত করিতেছে না? কোন কোন বৌদ্ধদর্শনে আমরা যে শূন্যবাদের দেখা পাই, তাহাই যেন এ যুক্তিতে সমর্থিত হয়। এ মতে অহং এর মত আত্মা ও প্রকাশে বা ক্ষণস্থায়ী চিত্তবৃত্তি প্রবাহে একটা বোধ মাত্র, স্বরূপে সত্য নয়।

কিন্তু আমরা আবার শব্দ বা বাক্য দ্বারা ভুল পথে চালিত হইতেছি। আমাদের সঙ্কীর্ণ চিত্ত, দ্বন্দ্ব ও বিরোধের সংস্কারে জর্জ্জরিত, অতিমানস অভিজ্ঞতার অনুবাদ করিতে গিয়া তাহাতেও সেই দ্বন্দ্বের আরোপ না করিয়া পারে না। অসৎ একটী শব্দ মাত্র। এ শব্দের মূলে কি আছে তাহা যখন তলাইয়া বুঝিতে চাই তখন বুঝিব বস্তুর প্রকৃত সত্তা সম্বন্ধে আমাদের যে শুদ্ধতম ধারণা ও সূক্ষ্মতম অভিজ্ঞতা আছে তাহাকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে বলিয়াই ইহাকে অসৎ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অসৎ কেবলমাত্র একান্ত অবাস্তব শূন্যতা নহে। আমরা যাহা জানি বা সচেতন ভাবে আমরা নিজদিগকে যাহা মনে করি সেই অনুভবের ও সেই বিশিষ্ট চেতনার সকল সীমা পার হইয়া যাওয়ার ফলে শূন্যবাদের একটা কল্পনাকে অসৎ নাম দিয়া খাঁড়া করা হইয়াছে। বাস্তবিক দার্শনিকের শূন্যবাদ গভীরভাবে পরীক্ষা করিলে আমরা বুঝিব যে শূন্য আসলে সর্ব্বেরই নামান্তর। মন শুধু সান্তের ধারণায় অভ্যস্ত, তাই অনির্দ্দেশ্য ও অনির্ব্বচনীয় এই অনন্ত মনের কাছে ফাঁকা বা শূন্য বলিয়া মনে হয় কিন্তু বস্তুতঃ এই অসৎই একমাত্র সত্যিকার সৎ। তাই দেখিতে পাই অন্য একখানি উপনিষদ অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি অসম্ভব বলিয়াছে— বলিয়াছে যে, সৎ শুধু সৎ হইতেই জন্মিতে পারে। অসৎ শব্দে একান্ত শূন্যতা না বুঝিয়া যদি বুঝি সত্তা সম্বন্ধে আমাদের সকল ধারণা ও অনুভবের অতীত একটা অনির্দ্দেশ্য তত্ত্ব তবে সে অসৎ হইতে সতের জন্ম হইয়াছে, একথা আর অসম্ভব থাকে না।

যখন বলি অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি তখন কালাতীত তত্ত্বকে আমরা কালের ভিতর টানিয়া আনিতে চাই। কারণ শাশ্বত অসতের মধ্যে কবে

সৎরূপী সর্ব্বের জন্ম হইল বা আবার স্বরূপতঃ মিথ্যা এই সর্ব্ব কবে চিরবর্ত্তমান অসতে লয় পাইবে তাহা ত কেহ বলিতে পারে না। সৎ ও অসৎ এ দুয়ের কথা যদি বলিতেই হয় তবে বলিতে হইবে যে তাহারা পরস্পর মিলিত হইতে না পারিলেও উভয়ই যুগপৎ বর্ত্তমান আছে অথবা কালের ভাষায় উভয়ই শাশ্বত। এই শাশ্বত সত্তাকে কে কেমন করিয়া বুঝাইবে যে সে নাই শুধু অসৎ আছে? সকল অভিজ্ঞতার এরূপ পরম বিনাশের মধ্যে সকল অভিজ্ঞতার মীমাংসা কি করিয়া মিলিবে?

সমস্ত বিশ্বসত্তার অধিষ্ঠান ও আশ্রয় স্থান স্বরূপ হইয়াও এ সমস্ত হইতে মুক্ত ব্রহ্মের অবিজ্ঞেয় স্বরূপকে শুদ্ধ-সত্তা বলা যাইতে পারে। বিশ্বের সমস্ত সত্তা বা সম্ভূতির যত প্রকার ইতিবাচক ভাব বা ধারণা চৈতন্যে সূক্ষ্ম বা জগদতীত অবস্থায়ও জাগিতে পারে তাহা হইতেও নির্ম্মুক্ত তাহার যে পরম স্বাতন্ত্র্য আছে তাহাকেই অসৎ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সত্তার অনন্ত প্রকাশের দ্বারা তাহাকে নিঃশেষ করা যায় না বা কোনপ্রকার প্রকাশের সীমা দ্বারা সীমিত করা যায় না বলিয়াই এই নেতিবাচক অসৎ আখ্যা। কিন্তু তাহা বলিয়া ইতিবাচক সকল বিশ্বসত্তা যে তাহারই সত্য আত্মপ্রকাশ ইহা তাহাতে অস্বীকৃত হয় না। এই ইতিবাদ ও নেতিবাদ পরস্পরকে ধ্বংস করে না, পরন্তু ইহাঁরা উভয়ে উভয়ের পরিপূরক, এ উভয় ভাবের যুগপৎ উক্তির দ্বারা প্রবুদ্ধ মানব সচেতন আত্ম সত্তাকে সত্য বলিয়া যেমন জানিতে পারে, তেমনি ইহার অতীত অবিজ্ঞেয় পরমতত্ত্বকেও সেই সত্য বলিয়া একসঙ্গে বুঝিতে পারে। তাইত বুদ্ধ নির্ব্বাণের পরমপদে আরূঢ় হইয়াও জগতে অতি প্রবল কর্ম্মের আন্দোলন তুলিয়াছিলেন, অন্তশ্চেতনায় নৈর্ব্যক্তিক হইয়াও কর্ম্মে ও জীবনে জগতের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের প্রকাশ তাহাতে সম্ভব হইয়াছিল।

যখন এই সকল কথা গভীরভাবে চিন্তা করি তখন বুঝিতে পারি যে যে সমস্ত কথা আমরা জোর গলায় প্রচার করি তাহার ভিতরে লুকাইয়া থাকে কত ভাবের দৈন্য, ভাষাকে স্পষ্ট করিতে গিয়া ভাবের অস্পষ্টতাকে আরও বাড়াইয়া তুলি এবং ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হই। তখন ইহাও বুঝিতে আরম্ভ করি যে আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্কীর্ণতার জন্য আমরা ব্রহ্মের উপরও সীমার আরোপ করিতে কুণ্ঠিত হই না। আমাদের এই মন অজ্ঞেয়

তত্ত্বের একটী বিভাবের উপর কেন্দ্রীভূত হইয়া তাহাকেই একমাত্র সত্য বলিতে এবং অন্য সব বিভাবকে অবজ্ঞা বা অস্বীকার করিতে দ্বিধাবোধ করে না। আমরা তখন অহংকার বশে নিজের সঙ্কীর্ণ অভিজ্ঞতা এবং তজ্জাত মতবাদ অপরের তদ্রূপ সঙ্কীর্ণ অভিজ্ঞতা ও মতবাদের বিরুদ্ধে খাঁড়া করিয়া তর্কযুদ্ধে লাগিয়া যাই। ইহার চেয়ে অনেক ভাল হয়, যদি সহিষ্ণু হইয়া শিক্ষার্থীর বিনয় লইয়া নিজের পরিণতির দিকে দৃষ্টি রাখি এবং অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের ভাণ্ডার বাড়াইতে চেষ্টা করি। নিজেদের পূর্ণতা সাধনের জন্য যিনি ভাষাতীত তাহার কথা যখন আমাদিগকে ভাষার মধ্যে বলিতেই হইবে তখন তৎসম্বন্ধে এমন বাক্য আমাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে যাহা হইবে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, স্বচ্ছন্দ ও উদার এবং যাহা বৃহত্তম ও পূর্ণতম সুসঙ্গতি স্থাপন করিতে সক্ষম।

সুতরাং আমরা স্বীকার করি যে ব্যক্তিগত চেতনা এমন এক অবস্থায় পৌছিতে পারে যেখানে ব্যবহারিক সমস্ত সত্তা এক অব্যক্তে লয় হইয়া যায়, এমন কি আত্মজ্ঞানের ধারণাও সেখানে অপ্রচুর হইয়া পড়ে। নৈঃশব্দ্যের পরপারে অবস্থিত গভীরতর নৈঃশব্দ্যের মধ্যেও প্রবেশ করা তাহার পক্ষে সম্ভব। কিন্তু ইহাই একমাত্র সত্য নয় অথবা এ অভিজ্ঞতাই আমাদের পূর্ণ ও চরম অভিজ্ঞতা নয়। কারণ আমরা দেখিতে পাই এই নির্ব্বাণ, এই আত্মবিলয় আমাদের অন্তরে পরাশান্তি এবং পরমস্বাতন্ত্র্য দিলেও তৎসঙ্গে বাহিরে এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কামনাবর্জ্জিত অথচ কার্য্যসাধক কর্ম্ম-প্রবাহ সতত বর্ত্তমান থাকিতে পারে। বুদ্ধের শিক্ষার মূলকথা বোধ হয় এই ছিল, ভিতরে নৈর্ব্যক্তিকতা এবং প্রশান্ত রিক্ততাকে রক্ষা করিয়া, অহমিকার উপরে উঠিয়া ব্যক্তিগত কর্ম্মশৃঙ্খল এবং ক্ষণভঙ্গুর নামরূপের অভিনিবেশ হইতে মুক্ত হইয়া সত্য, মৈত্রী ও সততার শাশ্বত সত্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকা; স্থূল দেহধারণের দুঃখ ও যন্ত্রণা হইতে পলায়ন করিবার ক্ষুদ্র আদর্শ তাহার নহে। যে যাহাই হউক না কেন, পূর্ণ সিদ্ধপুরুষের মধ্যে যেমন নৈঃশব্দ্য এবং কর্ম্মধারার পরম মিলন দেখা দিবে তেমনি পূর্ণরূপে সচেতন জীবাত্মা একদিকে যেমন অসতের পরমস্বাধীনতা প্রাপ্ত হইবে তদ্রূপ অন্যদিকে বিশ্ব-সম্ভূতির সঙ্গে সম্বন্ধচ্যুত হইবে না।

এমনি ভাবে বিশ্বচৈতন্যের মধ্যে জড় ও চিতের সমন্বয় সাধন করিয়া অবশেষে বিশ্বাতীত চেতনায় সকল ইতি ও নেতির শেষ সমন্বয় আমরা

দেখিতে পাইব। অজ্ঞেয় তত্ত্বের স্থিতি ও ক্রিয়ার অবস্থা আমরা ইতিবাদের মধ্যে দেখিতে পাই এবং এই সমস্ত স্থিতি ও ক্রিয়ার মধ্যে সর্ব্বদা অনুস্যূত থাকিয়াও তাহা হইতে সে তত্ত্ব সর্ব্বদা নির্মুক্ত, ইহাই নেতিবাদের মধ্যে আমরা আবিষ্কার করি। অবিজ্ঞেয় এমন একটী পরমাশ্চর্য্য ও অনির্ব্বচনীয় কিছু যাহা আমাদের চৈতন্যে সর্ব্বদাই রূপায়িত হইয়া উঠিতেছে অথচ সর্ব্বদা তাহা সে রূপায়নকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছে। আমাদিগকে এক মিথ্যা হইতে অন্য মিথ্যাতে লইয়া গিয়া অবশেষে সব যেখানে লয় পায় এমন এক মায়াময় চাতুরী ইহাকে নিশ্চয়ই বলা চলে না, পরন্তু আমাদের সকল জ্ঞানের অতীত এক পরম জ্ঞানময় সত্তা আমাদিগকে এক সত্য হইতে তদপেক্ষা বৃহত্তর ও গভীরতর সত্যের দিকে পরিচালিত করিতেছেন ইহাই সত্য কথা। ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী বা সর্ব্বগত সত্য, দুরপনেয় ভ্রমের সর্ব্বগত নিমিত্ত তিনি নহেন।

যদি এইভাবে এক পরম ইতিবাদকে সকল দ্বন্দ্বের পরম সমন্বয় ক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করি—বস্তুতঃ ইহা ছাড়া সমন্বয়ের অন্য কোন দৃঢ় ভিত্তি নাই—তবে সেই অবিজ্ঞেয় তত্ত্বের প্রত্যেক প্রকাশ বা বিভাব আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে এবং অন্যান্য প্রকাশ বা বিভাবকে নিরাকৃত বা অযথোচিতভাবে খর্ব্ব না করিয়া পরস্পরের সহিত কি সম্বন্ধ আছে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। সত্য এবং মিথ্যা, আত্মা এবং অনাত্মা, সত্য আত্মা এবং মিথ্যা অথচ সদা বর্ত্তমান মায়া, এইরূপ দুই পরস্পর বিরোধী ভাবে ব্রহ্মকে ভাগ না করিয়া 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই দর্শনই খাঁটি অদ্বৈতদর্শন। একমাত্র ব্রহ্মই আছেন ইহা যদি সত্য হয় তবে যেখানে যাহা কিছু আছে তাহাও ব্রহ্ম ইহাও সত্য। এই ব্রহ্ম ঈশ্বর বা আত্মা যদি অসহায় না হন, যদি তাহার শক্তি অসীম হয়, যদি তিনি স্বয়ংপ্রজ্ঞ এবং সর্ব্বময় হন তবে প্রকাশের বা জগৎ সৃষ্টির মূলে একটা সত্য কারণ বা গূঢ় উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে। সেই গূঢ় উদ্দেশ্য আবিষ্কার করিতে গেলে আমাদিগকে সৃষ্টির মূলে একটা শক্তি, একটা জ্ঞান, সত্তার একটা সত্য বিদ্যমান আছে ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। বৈষম্য ও আপাত-প্রতীয়মান অনর্থ প্রাকৃত জগতের মধ্যে রহিয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে কিন্তু মানুষকে তাহাদের কাছে পরাজয় স্বীকার করিলে চলিবে না। মানুষের অন্তরের গভীরতম সহজবুদ্ধি যে মানুষকে মিথ্যার ছলনা অনুসরণ করিতে

বলে নাই পরন্তু সর্ব্বজয়া এক নিগূঢ়-কল্যাণশক্তিকে খুঁজিতেই নিযুক্ত আছে, ইহাতে তাহার জ্ঞানেরই পরিচয় আছে।

দৃশ্যমান জগতের অজ্ঞান, দুঃখ ও অনর্থে ভীত ও পরাভূত হইয়া আমাদের প্রাকৃত খণ্ড চেতনা ব্রহ্মকে এ সমস্তের দায় হইতে মুক্তি না দিলে চলে না মনে করিয়া এ সমস্তের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মায়া, মার, সয়তান প্রভৃতি ব্রহ্মের বিরোধী কোন স্বয়ংজাত অশুভশক্তি আছে ইহা মনে করে। কিন্তু আমরা ত বলিতে পারি না যে সেই অদ্বিতীয় সত্তা তাহার বাহিরের কিছু দ্বারা বাধ্য হইয়া কোন কিছু করেন, কারণ তদতিরিক্ত কিছু যে নাই। একথাও বলা চলে না যে ব্রহ্মের সত্তার এক দেশে একটা বিরুদ্ধ ভাব আছে যাহা তাহার সমস্ত সত্তার বিরুদ্ধে কাজ করিতে পারে, কারণ তাহাতেও প্রকারান্তরে সেই সর্ব্বময়ের বাহিরে একটা কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়; এমনকি একথাও বলিতে পারি না যাহা কিছু ঘটিতেছে ব্রহ্ম তাহার উদাসীন এবং নিরপেক্ষ দ্রষ্টা মাত্র, কারণ জগৎ সৃষ্টি বা প্রকাশের মূলে যে সংকল্প বা ইচ্ছা রহিয়াছে তাহা ত তদতিরিক্ত আর কাহারও হইতে পারে না। প্রকৃত সত্য এই যে ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়, তিনি ছাড়া আর কিছু নাই। বহু তাহারই প্রতীক, মূর্ত্তি বা বিভূতি।

সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে জগৎ যদি স্বপ্ন বা মিথ্যা বোধ মাত্র হয়, তবু তাহা অখণ্ড এক আত্মস্বরূপের ইচ্ছা হইতে জাত হইয়াছে এবং তাহা তিনিই নিত্য ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। আমাদিগকে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে এ বোধ যে উপাদানে গঠিত তাহা মূলতঃ সত্য স্বরূপ হইতে আসিয়াছে, কারণ জগতের আধার অধিষ্ঠান ও উপাদান সমস্তই ব্রহ্ম। যে স্বর্ণ দিয়া পাত্র গঠিত হয়, সে স্বর্ণ যদি সত্য হয় তবে পাত্র মিথ্যা বা মরীচিকা হইবে কি করিয়া? প্রকৃতপক্ষে জগৎ স্বপ্ন, মিথ্যা এসব শুধু কথার চাতুর্য্য অথবা প্রাকৃত চেতনার সংস্কার। এ সমস্ত কথার মধ্যে কিছু সত্য আছে, সে সত্যের মূল্যও কম নয় কিন্তু তবুও তাহারা সত্যকে বিকৃত করিয়াছে ইহাও ঠিক।

সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বগত এক পরম সত্যের ধারণা লইয়া আমাদের সাধনা আরম্ভ করিতে হয়। এই পরম সত্যের এক কোটিতে সর্ব্বাতীত অসৎ, অন্য কোটিতে বিশ্বজগৎ, কিন্তু এ উভয় কোটি পরস্পর বিরোধী নয়, উভয়ই সেই পরমতত্ত্বের দুইটী বিভাব। বিশ্বে অথবা প্রকাশে, এই তত্ত্বের সর্ব্বোত্তম

অনুভবে আমাদের নিকট যিনি প্রকাশিত হন, তিনি সৎ চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ। আবার বিশ্ব বা প্রকাশের অতীত অবস্থায় তাহারই এক অবিজ্ঞেয় সৎ বা এক অনির্ব্বচনীয় চরম ও পরম আনন্দ স্বরূপের অনুভবও মানুষের মধ্যে জাগিতে পারে। আমরা যদি ইন্দ্রিয় বোধজাত একদেশদর্শী বৃত্তির অধীন না হইয়া প্রযুক্ত বুদ্ধি ও অনুভবের সাহায্যে দেখিতে চেষ্টা করি তবে সকল দ্বৈতলীলার মধ্যেও তাহারই লোকোত্তর মহিমা দেখিতে পাইব। অবশ্য যতদিন আমরা দ্বৈতবুদ্ধিকে অতিক্রম করিতে না পারিতেছি ততদিন শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের দ্বারা এ ধারণা আমাদিগকে বজায় রাখিতে হইবে। কিন্তু বুদ্ধির উচ্চতম দীপ্তি বা বিচারের গভীর প্রসারতা এ বিশ্বাসকে অস্বীকার না করিয়া বরং সমর্থনই করিবে। মানুষের উত্তরায়ণের যাত্রাপথের পাথেয়রূপে তাহাকে এই বিশ্বাস দেওয়া হইয়াছে। তাহার আধ্যাত্মিক পরিণামে এমন একদিন আসিবে যখন এই বিশ্বাস জ্ঞানে এবং পূর্ণ অভিজ্ঞতায় পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

জীবের নিয়তি

তাহারা অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া বিদ্যার দ্বারা অমৃত ভোগ করেন।......তাহারা বিনাশের দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া সম্ভূতি দ্বারা অমৃত ভোগ করেন।

ঈশোপনিষদ (১১,১৪)

এক সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত পরম সৎই সর্ব্বজীবের এবং সর্ব্বসত্তার মূল সত্য। ব্যবহারিক স্থূল জগৎ হইতে আরম্ভ করিয়া অনির্ব্বচনীয় পরম রহস্যের সীমানা পর্য্যন্ত সবিশেষ বা নির্ব্বিশেষ, সাকার বা নিরাকার, সচেতন বা অচেতন প্রভৃতি যত প্রকার দ্বন্দ্ব, বিরোধ বা বহুত্ব আছে সে সমস্তই সেই পরম তত্ত্বের প্রকাশ ও অভিব্যক্তি, অথচ সমস্ত দ্বন্দ্ব ও বিরোধের মধ্যেও সে তত্ত্ব এক এবং অখণ্ড, বহুত্বের সমাহার বা সমষ্টি নহে। বহু বৈচিত্র্য সেই অবিভাজ্য সত্তা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান আছে এবং তাহাতে লয় পাইবে। ব্রহ্মই সকল প্রকাশ ও ভাবের আদি ও অন্ত, একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় কিছু নাই, তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ং।"

কিন্তু ব্রহ্মের এই পরম একত্ব স্বরূপতঃ অনির্ব্বচনীয়। মন দিয়া যখন তাহাকে বুঝিতে চাই, তখন একের পর আর একটা করিয়া অন্তহীন ধারণা ও অনুভবের মধ্য দিয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হয় বটে, কিন্তু তারপর অবশেষে আমাদের বৃহত্তম ধারণা এবং সর্ব্বগ্রাহী অনুভবেও তাহাকে ধরা যায় না একথা আমরা বলিতে বাধ্য হই। তখন ভারতীয় ঋষিরা 'নেতি' 'নেতি' ইহা নয় ইহা নয়, এই সূত্রে যে ভাবে সে তত্ত্বের কথা বলিয়াছেন আমাদিগের প্রত্যয়কে ব্যক্ত করিতে সেই ভাষাই ব্যবহার করিতে হয়।

আমরা যাহাকে আমি বলি অথবা আমাদের বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় আমাদের নিকট যাহা কিছু উপস্থিত করে তাহার সমস্তই স্বরূপতঃ সেই পরমতত্ত্ব ভিন্ন

অন্য কিছু না হইলেও সে তত্ত্ব আমাদের মনের কাছে স্বরূপতঃ অবিজ্ঞেয়। বহু সত্তা, বহু চেতনা, বহু শক্তির মধ্য দিয়া সেই তত্ত্বের প্রকাশ হইতেছে, মন শেষ পর্য্যন্ত এই কথা শুধু বলিতে পারে। অবিজ্ঞেয়কে জানিবার পথে সত্তা চৈতন্য বা শক্তির সেই প্রকাশিত ভাব, রূপ বা ক্রিয়ায় মধ্য দিয়া মনন-ধর্ম্মী মানুষকে অগ্রসর হইতে হয় ইহাও সত্য। কিন্তু একত্বে পৌঁছিবার বা অনন্তকে আমাদের আলিঙ্গনের মধ্যে ধরিবার অতিব্যগ্রতায় যদি তাহার সত্তা, গুণ, শক্তি বা চৈতন্য সম্বন্ধে বৃহত্তম ও মহত্তম যে ধারণা আমাদের মন করিয়া উঠিতে পারে, তাহাতে পৌঁছিয়া, তাহারেই সেই পরমতত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চাই এবং সে ধারণার বাহিরে যাহা আছে তাহাকে বাদ দিয়া ফেলি, তবে আমাদের পক্ষে অবিজ্ঞেয়ের পরম মহত্ত্বকে খর্ব্ব করা হইবে। তাহাতে আমরা যে বোধে পৌঁছিব তাহা সে পরম একত্বের অখণ্ড বোধ নয়। তাহাতে অখণ্ড তত্ত্বকে খণ্ড করিয়া দেখিবার পাপে পাপী হইব।

প্রাচীন বৈদান্তিক ঋষিদের মনে এই ধারণা এত গভীর ছিল যে তাঁহারা সচ্চিদানন্দের অনুভূতিকে আমাদের চৈতন্যের নিকট পরমসত্যের চরম প্রকাশ বলিয়া মনে করিয়াও সেখানে থামিয়া যান নাই। ইহারও অতীত এক অস্তিত্বের অনুভব পাইয়াছিলেন যাহাকে তাহারা 'অসৎ' আখ্যা দিয়াছিলেন—কেননা সৎ চিৎ বা আনন্দ বলিতে আমাদের উচ্চতম ও বিশুদ্ধতম যে ধারণা হইতে পারে ইহা তাহারও উপরে অবস্থিত। বৌদ্ধেরা শাস্ত্র মানে না বলিয়া এদেশের পণ্ডিতেরা কতকটা অযৌক্তিক ভাবে তাহাদিগের মত অবৈদিক বলিয়াছেন কিন্তু তাহাদের শূন্যবাদ মূলতঃ উপনিষদের অসৎবাদ হইতে ভিন্ন নহে। কেবলমাত্র উপনিষদের সমন্বয়মূলক শিক্ষায় আমরা পাই যে সৎ এবং অসৎ পরস্পরকে অস্বীকার বা বিনষ্ট করে না কিন্তু তাহাদের আপাতবিরোধের মধ্য দিয়াই যিনি পরমঅজ্ঞেয় তাহার দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। উপনিষদই শিক্ষা দিয়াছে একত্বকেও বহুত্বকে মানিয়া চলিতে হয়, কারণ বহুও যে স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। বিদ্যা বা একত্বের জ্ঞান দিয়া আমরা ভগবানকে জানিতে পারি, বিদ্যাকে বাদ দিলে অবিদ্যা বা বহুত্বের জ্ঞান 'অন্ধং তমঃ' বা অন্ধকারের রাত্রিকে শুধু প্রকাশ করে অথচ বহুত্বের জ্ঞানকে একেবারে অস্বীকার করিয়া বহু নাই বলিয়া যদি শুধু একত্বকে লইয়া থাকিতে চাই তবে আমরা

'ভূয় ইব তমঃ' যেন আরও গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করি, সে জ্ঞান তখন আমাদের অপূর্ণতারই কারণ হয়। বিদ্যার আলোকে অবিদ্যার ক্ষেত্রকে উদ্ভাসিত করিয়া না দেখিয়া তখন যেন বিদ্যার আলোকে আমাদের চক্ষু ঝলসিয়া গিয়াছে ইহাই মনে হয়।

আমাদের প্রাচীনতম ঋষিগণ যে শিক্ষা দিয়াছেন তাহাতে জ্ঞানের এইরূপ নির্ম্মল ও স্থির দৃষ্টি দেখিতে পাই। সত্যকে আবিষ্কার করিবার ও জানিবার ধৈর্য্য ও বীর্য্য এ উভয়ই তাহাদের ছিল। মানুষের জ্ঞানের সীমাকে তাহারা নত হইয়াই স্বীকার করিয়াছেন। ইহার পরের যুগে হৃদয় ও মনের একটা অধীরতা আসিয়া পড়িল। তখন চরম আনন্দের এবং শুদ্ধ সংবিতের দুর্নিবার আকর্ষণে আকৃষ্ট বুদ্ধি উপর হইতে মুক্তির বাতাস পাইল কিন্তু নিম্নস্থিত অতলের মধ্যে যে পরমরহস্য নিহিত আছে তাহার খোঁজ করিল না। তাই সে বহুত্বকে অস্বীকার করিয়া একত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিল। কিন্তু প্রাচীন জ্ঞানের স্থির দৃষ্টি জানিত যে ভগবানকে খাঁটিভাবে জানিতে গেলে তাঁহাকে সর্ব্বত্র সমানভাবে দেখিতে হইবে। দ্বন্দ্বের লীলাকে বুঝিতে হইবে, তাহার প্রকৃত মূল্যও দিতে হইবে কিন্তু তাহার দ্বারা অভিভূত না হইয়া দ্বন্দ্বের উভয় কোটির মধ্য দিয়া তিনিই প্রকাশ পাইতেছেন, ইহা দেখিতে হইবে। আমাদের এক-দেশদর্শী বিচারবুদ্ধি বলে যে যেহেতু একই সত্য, বহু অবশ্য মিথ্যা হইবে, যেহেতু নির্ব্বিশেষ তত্ত্বই সৎ বা সত্য সুতরাং সবিশেষ অসত্য বা অলীক। এইরূপ বিচার বুদ্ধিকে আমাদের দূরে সরাইয়া রাখিয়া সত্যকে দেখিতে হইবে। আমরা বহুর মধ্যে এককে খুঁজিতেছি ইহা সত্য কিন্তু সেই একত্বে পৌঁছিয়া বহুত্বকে অস্বীকার করিব তাহা নহে, পরন্তু তাহারই আশীর্ব্বাদ লইয়া আসিয়া বহুত্বের মধ্য দিয়া যে একেরই প্রকাশ হইতেছে ইহারই পূর্ণানুভূতি লাভ করিবার জন্য।

মন যখন এক বিশেষ ভূমিতে একটা শক্তিশালী প্রসারতা লাভ করে তখন অনেক সময় একটা একদেশদর্শী দৃষ্টিভঙ্গীকে অতিমাত্রায় প্রাধান্য দেয়। এবিষয়ে আমাদিগকে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। যে মন শুধু ইন্দ্রিয় বোধের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে এবং সত্য ও সত্তাকে জড় আকারের সহিত সদা যুক্ত মনে করিতে অভ্যস্ত, অন্য কোন উপায়ে যে জ্ঞানলাভ হইতে পারে এ অভিজ্ঞতা

যাহার নাই অথবা জড়াতীত কোন সত্য পদার্থের অস্তিত্ব যে মন কল্পনা করিতে পারে না, সেই জড়ভাবাপন্ন মন বলে ভগবান বা জগদতীত কোন কিছু নাই। পক্ষান্তরে যে মন অপার্থিব সত্য বা সত্তার প্রবল অনুভবে ডুবিয়া যায়, আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন সে মন, ইন্দ্রিয় যাহার খবর দেয় সেই জড় জগৎ মিথ্যা এইরূপ মনে করিয়া বসে। ইহাদের কোনটাই আমরা পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না বটে কিন্তু এই উভয় মত যে ধারণাকে বিকৃত করিয়া দেখায় তাহার মধ্যে যে সত্য আছে তাহা আমাদিগকে দেখিতে হইবে। ইহা সত্য যে এই জড়রূপের জগতে আমরা আত্মোপলব্ধির জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি, এখানে যাহা আমাদের প্রাকৃত বা জড় চেতনাকে অধিকার ও উচ্চতর ভূমির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নিম্নতম ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ না করে তাহা আমাদের কাছে পূর্ণরূপে সত্য হইয়া উঠে না। আবার রূপ বা জড়ের অন্যনিরপেক্ষ স্বতন্ত্রসত্তা যে আছে ইহা অজ্ঞানতা জাত মিথ্যা জ্ঞান মাত্র, জড়াতীত ও বিদেহ সত্যের উপাদান হওয়া বা তাহাদের রূপায়িত করিয়া তোলাই জড়ের সত্য পরিচয়। তাহার প্রকৃত স্বরূপে সে ভাগবৎ চৈতন্যের লীলার জন্য তাহা হইতে জাত এবং আত্মার এক বিশিষ্ট ভাবে আত্মপ্রকাশের জন্যই তাহার প্রয়োজন।

ব্রহ্ম যে আপন সত্তাকে রূপায়িত করিয়া জড়ে পরিণত ও তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন তাহার একমাত্র কারণ এই হইতে পারে যে তিনি সবিশেষের মধ্যে রূপের ক্ষেত্রে আত্মবিসৃষ্টি ও প্রকাশের আনন্দ সম্ভোগ করিতে চান। তিনি প্রাণের বিচিত্র লীলায় নিজেকেই ফুটাইয়া তুলিতেছেন। প্রাণ ব্রহ্মের মধ্যে রহিয়াছে তাহার নিজের মধ্যে ব্রহ্মকে আবিষ্কার করিবে বলিয়া। মানুষের একটা বড় বৈশিষ্ট্য এই যে সে তাহার চৈতন্য এমনভাবে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে পারে, যাহাতে তাহা রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া তাহার পরিপূর্ণ আত্মোপলব্ধি সম্ভব করিতে পারে। জীবনে ভগবানকে ফুটাইয়া তোলাই মানুষের খাঁটি মনুষ্যত্ব। পাশবজীবন ও সাধনা লইয়া তাহার যাত্রারম্ভ, কিন্তু দিব্য ভাগবত জীবন লাভই তাহার শেষ গন্তব্য স্থান।

মন ও প্রাণের ক্ষেত্রের বিধান এই যে আমরা ক্রমশঃ আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রসর হইব। ব্রহ্মের মধ্যে একই কালে বহু বিচিত্র চেতনা যুগপৎ বর্ত্তমান আছে বটে কিন্তু প্রকাশের জগতে তিনি তাহা পর পর ফুটাইয়া তোলেন।

তাই প্রাণের কাছে তাহার সত্তার নিত্য নূতন ভাবের প্রকাশ হয়। কিন্তু এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্তির সময় যদি পূর্ব্বেকার অবস্থা ত্যাগ করিয়া চলি যদি মনোময় জীবনে পৌছিয়া যে অন্নময় জীবন আমাদের ভিত্তি তাহাকে প্রত্যাখ্যান বা তাচ্ছিল্য করিয়া বসি অথবা আধ্যাত্মিক জীবনের আকর্ষণে যদি প্রাণময় ও মনোময় জীবনকে বিসর্জ্জন দিয়া ফেলি তবে আমাদের মধ্যে ভগবানকে পূর্ণরূপে ফুটাইয়া তোলা হয় না। এভাবে আমরা পূর্ণতা পাই না, আমাদের অপূর্ণতাকে এক ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে লইয়া চলি মাত্র। আমাদের ভিত্তিভূমিকে ভুলিয়া যত উর্দ্ধে আরোহণই করি না কেন, এমনকি অসৎ বলিয়া পরমসত্তার যে উচ্চতম অবস্থার কথা বলা হইয়াছে সেখানেও যদি পৌছি তাহাতেও আমাদের জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতা হইতে পারে না। নিম্নতর ক্ষেত্রকে ত্যাগ করা নহে পরন্তু যে উচ্চতর ক্ষেত্রে সে পৌছিয়াছে তাহার আলোকে তাহাকে আলোকিত ও রূপান্তরিত করা দিব্য প্রকৃতির স্বধর্ম্ম। পূর্ণ-ব্রহ্ম অখণ্ড, তাহার মধ্যে বহু বিচিত্র চেতনা যুগপৎ বর্ত্তমান আছে এক পরম সমন্বয়ে বিধৃত হইয়া, আমাদের মধ্যে ব্রাহ্মীচেতনা বা তাহার দিব্য প্রকৃতি প্রকট করিতে হইলে আমাদের চেতনাতেও সেইরূপ সর্ব্বক্ষেত্রকে বজায় রাখিয়া এক অখণ্ড চৈতন্যে তাহাদিগকে সুসঙ্গত করিয়া মিলাইতে হইবে।

চেতনার তিনটী রূপ আছে, জীব বা ব্যক্তি চেতনা, বিশ্বচেতনা এবং বিশ্বাতীত চেতনা; প্রাণে এই তিন চেতনা মিলিত হইয়া পরস্পরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া বর্ত্তমান আছে। সাধারণতঃ জীব মনে করে যদিও সে বিশ্বের অন্তর্গত তবুও তাহার নিজ সত্তাতে সে পৃথক, আরও মনে করে যে তাহার নিজসত্তা এবং বিশ্বসত্তা বিশ্বাতীতসত্তার অধীন। এই বিশ্বাতীতসত্তাকে আমরা সাধারণতঃ ঈশ্বর নামে অভিহিত করি। আমরা যতটা ভাবি যে তিনি বিশ্বকে ছাপাইয়া আছেন তাহার চেয়ে বেশী করিয়া মনে করি যে তিনি বিশ্বের সম্পূর্ণ বাহিরে অবস্থিত। এই বোধে আমরা ব্যক্তি ও বিশ্বকে তুচ্ছ এবং নিকৃষ্ট জ্ঞান করি বলিয়া জীব ও বিশ্বের পরম নিবৃত্তি সাধন করিয়া বিশ্বাতীত চেতনাতে পৌছানই যুক্তিযুক্ত চরমসিদ্ধি মনে করি। আমাদের পূর্ণ দৃষ্টিতে এ তিন চেতনাকে এক বলিয়া বুঝিতে পারিলে এরূপ সিদ্ধান্তের প্রয়োজন বা অর্থ থাকে না। যেমন আমাদের মনোময় অথবা আধ্যাত্মিক জীবন ফুটাইয়া তুলিতে গিয়া

আমাদিগকে দৈহিক জীবনকে ছাড়িতে হয় না তদ্রূপ ব্যক্তিগত জীবন ও কর্ম্মধারা বজায় রাখিয়াও আমরা বিশ্বচেতনা অথবা বিশ্বাতীত চেতনার অনুভব করিতে এবং তাহাতে অবস্থিত হইতে পারি। কারণ বিশ্বাতীত সেই চেতনার মধ্যেই বিশ্ব রহিয়াছে, বিশ্বের সহিত সে চৈতন্য একীভূত, বিশ্ব তাহার সত্তার বাহিরের কোন কিছু নয়; তদ্রূপ বিশ্বের মধ্যেই ব্যক্তি রহিয়াছে, বিশ্বের সহিত সে একীভূত সে বিশ্বসত্তার বাহিরের কোন কিছু নয়। জীব সমগ্র বিশ্বচেতনার একটী কেন্দ্র, আর অনির্দ্দেশ্য এবং অরূপ বিশ্বাতীত সত্তারই এক বিশেষ রূপ হইল বিশ্ব।

ইহাই জীব জগৎ ও ব্রহ্মের সত্য সম্বন্ধ। অবিদ্যা এবং ভ্রমজ্ঞানের আবরণে আমরা আবৃত আছি বলিয়া এ সত্যের বোধ আমাদের মধ্যে জাগে নাই। আমরা যখন সত্যচৈতন্যে জাগরিত হই তখনও দেখিতে পাই যে এই নিত্য সম্বন্ধের কোন পরিবর্ত্তন হয় না, কেবল আমাদের ব্যক্তিচেতনার অন্তর ও বাহিরের দৃষ্টিভঙ্গী গভীররূপে রূপান্তর প্রাপ্ত হয় এবং তাহাতে তাহার কর্ম্মের ধারা এবং তাহার পরিণামও এক নূতন আকার ধারণ করে। বিশ্বের মধ্যে বিশ্বাতীত সত্তার কর্ম্মের জন্য ব্যক্তিচেতনার প্রয়োজন আছে, ব্যক্তিচেতনাতে পরম জ্ঞানের আলোক আসিয়া পড়িলেও তাহার কর্ম্মের নিবৃত্তি হওয়া প্রয়োজন হয় না। পক্ষান্তরে ব্যষ্টিচেতনায় বিশ্বাতীত সত্তার সচেতন প্রকাশ হইতে সমষ্টি বা বিশ্বচেতনা আত্মসচেতন হইয়া উঠে; সেই জন্য জগতে প্রবুদ্ধ ও লব্ধ-জ্ঞান ব্যষ্টিচেতনার অবস্থিতি ও কর্ম্মধারা বিশ্বলীলার জন্যই একান্ত প্রয়োজন। তাই পরম জ্ঞান লাভ হইলে জীবের অত্যন্তবিলয়ই যদি বিধান হয় তবে এ বিশ্ব চির অন্ধকার, মরণ ও জ্বালাযন্ত্রনার আবাসভূমিই থাকিয়া যাইবে অনন্তকাল পর্য্যন্ত, ইহাই হয় বিশ্বের নিয়তি। এমন জগৎ হয় জীবের পক্ষে একটা নিষ্ঠুর পরীক্ষার স্থান, না হয় সমস্ত বিশ্ব, সমস্ত প্রকাশ ভ্রম মাত্র।

বৈরাগ্যবাদী জগৎকে ভ্রম বলিয়াই দেখে। কিন্তু জগৎ যদি মিথ্যাই হয় তবে ব্যক্তিগত মুক্তির কোন বাস্তবিক অর্থ থাকে না। অদ্বৈতবাদীর মতে জীব এবং ব্রহ্ম এক। ভেদ জ্ঞান যে আছে তাহা অবিদ্যা জনিত, ভেদ জ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যাওয়া তাহার মুক্তি। এইখানে প্রশ্ন উঠে, এই মুক্তিতে ইষ্টসিদ্ধি হইল কাহার? ব্রহ্মের নয়, কারণ তিনি ত

নিত্য মুক্ত, শান্ত, নিরব ও নির্ব্বিকার এবং তাঁহার এ স্বরূপ হইতে কখনও ত তিনি চ্যুত হন না। জগতেরও নয়, কারণ এই সার্ব্বভৌম মিথ্যা হইতে একজন জীবের মুক্তিতে ত তাহার মুক্তি হয় না, তাহার বন্ধন পূর্ব্বের ন্যায়ই অটুট থাকে। একমাত্র জীবই দুঃখ জ্বালা এবং ভেদ বুদ্ধি হইতে মুক্তি পাইয়া আনন্দ ও শান্তির মধ্যে প্রবেশ করে। তাহা হইলে একথা মানিতে হয় যে, অন্ততঃ জ্ঞানলাভ ও মুক্তির ক্ষেত্রে ব্যষ্টিজীবের একটা বাস্তব সত্তা কিছু আছে। কিন্তু মায়াবাদীর মতে ব্যষ্টিজীবও অসৎ ও মিথ্যা, মায়ার অনির্ব্বচনীয় রহস্যের মধ্যে মিথ্যা জ্ঞানরূপে থাকা ছাড়া তাহার বাস্তব কোন অস্তিত্ব নাই। তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত কথাটা এই দাঁড়ায় যে যাহার অস্তিত্ব নাই এমন এক মিথ্যা জগতের, যাহার অস্তিত্ব নাই এমন এক মিথ্যার বন্ধন হইতে, যাহার অস্তিত্ব নাই এমন এক মিথ্যা জীবের মুক্তিরূপ পরম পুরুষার্থের পথে, যাহার অস্তিত্ব নাই এমন এক মিথ্যা জীব অগ্রসর হইতেছে। কেননা যেখানে সমস্তই অসৎ অথবা একটা মিথ্যা বোধ মাত্র সেখানে "বদ্ধ বা মুক্ত বলিয়া যেমন কেহ নাই, তেমনি মুমুক্ষু বলিয়াও কেহ নাই"—এই হইল জ্ঞানের শেষ কথা। এ জ্ঞানের নাম যদি বিদ্যা হয় তবে ইহা পূর্ব্বে ছিল না পরে আসিয়াছে সুতরাং অবিদ্যার মত এ বিদ্যাও ত কোন নিত্য শাশ্বত পদার্থ নহে। আমাদের এ মুক্তির ক্ষেত্রেও আমরা আবার মায়ার সাক্ষাৎ পাই এবং দেখিতে পাই, যে বিজয়িনী বুদ্ধি তাহার সকল রহস্য সমাধান করিয়াছিল বলিয়া মনে করিতেছিল তাহাকে সে যেন উপহাস করিতেছে।

মায়াবাদীরা বলেন যে এ সমস্ত যুক্তি দিয়া বুঝানো যাইবে না। এ রহস্য অনাদি, ইহার কোন সমাধান নাই। আমাদের জীবনের বাস্তব তথ্য বলিয়া এ সমস্ত মানিতে হইবে। ইহার অর্থ যেন এই দাঁড়ায় যে একটা ধাঁধার মীমাংসার জন্য অন্য ধাঁধা সৃষ্টি করিতে হইবে, অহমিকার একটা চরম ক্রিয়া একটা গুরু অভিঘাত দ্বারা জীবকে তাহার অহংকারের গ্রন্থিচ্ছেদন করিতে হইবে, ব্যষ্টিকে তাহার নিজের মুক্তির দিকে একান্তভাবে অভিনিবিষ্ট হইতে হইবে,—তাহাতে মায়ার মধ্যে তাহার নিজের বিবিক্ত ভেদাত্মক সত্তাকে অতি উগ্র ও চরমভাবে স্থাপন করা হইলেও। এমতে আমাদিগকে এমন স্থানে লইয়া যায় যেখানে অন্য জীবকে যেন আমার মনের কল্পনা মনে হইবে, তাহাদের মুক্তির

প্রশ্ন আমার কাছে নিরর্থক, ইহাতে আমার নিজের আত্মা ও তাহার মুক্তিই আমার কাছে একমাত্র সত্য পদার্থ হইয়া দাঁড়াইবে। আর সব আত্মা আমার আত্ম-স্বরূপ হইলেও তাহাদের বন্ধন মুক্তির দিকে আমার দৃষ্টি থাকিবে না।

ব্রহ্ম অথবা আত্মা এবং জগতের মধ্যে যদি একটা দুরতিক্রমণীয় বিরোধ সৃষ্টি না করি তবেই এসমস্তের সুমীমাংসা পাওয়া যাইবে। আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে সমস্ত প্রকাশই একের আত্মপ্রকাশ, কিন্তু তাহা বহুমুখীভাবে এবং বহুরূপে। সর্ব্বত্রইত এ সত্যের নিদর্শন রহিয়াছে। চৈতন্যময় সৎস্বরূপের অতি স্বাভাবিক এবং সরল রহস্য এই যে তিনি একত্ব বা বহুত্ব কিছু দ্বারাই বদ্ধ নহেন। তিনি এই অর্থে নির্ব্বিশেষ যে অনন্ত ভাবে তাহার আত্মরূপায়ণের সামর্থ্য ও স্বাতন্ত্র্য তাহার মধ্যে আছে। বস্তুতই 'কেহ বদ্ধ কেহ মুক্ত বা কেহ মুমুক্ষু নাই' কারণ সে পরম তত্ত্ব নিত্য মুক্ত। তিনি এত স্বাধীন এত স্বতন্ত্র যে তাহার স্বাধীনতা দ্বারাও তিনি বদ্ধ নহেন। প্রকৃতভাবে বদ্ধ না হইয়াও তিনি বন্ধনলীলার অভিনয় করিতে পারেন। তাহার বন্ধন স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছায় নিজের উপরে আরোপিত সীমা নির্দ্দেশের সম্মতি। অহংএর সীমার মধ্যে যে আপনাকে তিনি বাঁধিয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছে তাহা শুধু একটা সাময়িক কৌশলমাত্র। ইহার উদ্দেশ্য ব্রহ্ম চেতনার এই ব্যষ্টিবিভাবের মধ্যে বিশ্ব এবং বিশ্বাতীত চৈতন্যের পরমৈশ্বর্য্য তিনি ব্যক্ত করিবেন।

বিশ্বাতীত নির্ব্বিশেষ সত্তা তাহার নিজের স্বাতন্ত্র্যে দেশ কালের অতীত। মনের দ্বারা আমরা সান্ত ও অনন্তের যে ভাবনা করি তিনি তাহার অতীত। কিন্তু তাহার আত্মরূপায়নের স্বাধীন শক্তি বা মায়া দ্বারা একত্ব ও তাহার পরিপূরক বহুত্ব এ উভয় ভাবই বিশ্বসৃষ্টিতে অবচেতন, চেতন এবং অতিচেতন এই তিন ক্ষেত্রে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন। কারণ আমরা দেখিতে পাই আমাদের জড়জগতে নানা আকারে আকারিত বহুর মূলে রহিয়াছে একটা অবচেতন একত্ব। বিশ্বের সমস্ত উপাদান এবং শক্তি ও ক্রিয়া সেই একত্ব হইতে আসিলেও বিশ্বের বহুত্বে সে একত্বের বোধ বা সুস্পষ্ট কোন চেতনা জাগে নাই। সচেতন অহংরূপী চৈতন্যের বিন্দুতে এই একত্বের বোধ জাগিতে পারে। কিন্তু অহং তাহার বাহিরের রূপ জগতের উপাদানে ও ক্রিয়াতে তাহার এ বোধ জাগাইতে সক্ষম হইলেও যাহা তাহার অন্তরালে থাকিয়া ক্রিয়া করিতেছে তাহাকে চিনিতে এবং

ধরিতে পারে নাই বলিয়া সে নিজেও অন্য সকলের সহিত এক ইহা অনুভব করিতে পারিতেছে না। বিশ্বগত অহংকে ভেদগত ব্যষ্টি অহংএর চেতনার সীমায় সীমিত করিয়াই আমাদের অপূর্ণ ব্যক্তিচেতনা গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু অহং যখন তাহার ব্যক্তিচেতনা অতিক্রম করিয়া আজ যাহা তাহার কাছে অতিচেতন তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট এবং তাহারই ভাবে অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিবে তখন তাহার বিশ্বাত্ম বোধ জাগিবে এবং যে বিশ্বাতীত আত্মা একেব মধ্যে বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন তাহাতেও সে পৌছিতে পারিবে।

ব্যষ্টি জীবের মুক্তিতেই ভাগবতী ইচ্ছা ও ক্রিয়ার মূল সুরটী বাজিয়া উঠে, দিব্য উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইহাই প্রথম প্রয়োজন। অন্য সমস্ত ইহার উপর নির্ভর করে। ব্যষ্টির মধ্যে তাহার প্রকাশের আলোক হইতেই বহুর মধ্যে যে পূর্ণ প্রকাশ ভগবদভিপ্সিত তাহা সুরু হয়। মুক্ত আত্মা একদিকে যেমন উচ্চে অবস্থিত তত্ত্বের সহিত একাত্মবোধ করেন তদ্রূপ তাহার চারিদিকে অবস্থিত বিশ্বের সহিতও ঐক্যবোধ করেন। কারণ বিশ্বাতীত পরম একের সহিত তাহার একাত্মতা বিশ্বের সহিত একাত্মবোধ না জাগিলে পূর্ণ হয় না। পশু জগতে যেমন এক দেহ হইতে সন্তান সন্ততির মধ্যে বহু দেহ জাত হয় তদ্রূপ দিব্য মুক্ত পুরুষ বহুর মধ্যে বহু মুক্ত পুরুষরূপে জাত হন। তাই জগতের একটী জীবাত্মার মুক্তি ঘটিলে বহুজীবে সঞ্চারিত হয় তাহার শক্তি ও প্রবেগ, ফলে জগতের মানব-জাতির অন্য ব্যষ্টি জীবের মধ্যেও সেই দিব্য চৈতন্য যেন বিস্ফোরণের মতই ফুটিয়া উঠে। হয়ত ইহার শক্তি পার্থিব চৈতন্যকেও অতিক্রম করিয়া যায়। চৈতন্যের এ প্রসারণের কি কোন সীমা নির্দ্দেশ করা যায়? কথিত আছে যে নির্ব্বাণের দ্বারদেশে পৌছিয়া বুদ্ধ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে জগতের একটী মাত্র জীবও যতদিন অহংএর ও দুঃখের জালে আবদ্ধ থাকিবে ততদিন তিনি 'যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে' যেখানে গেলে কেহ ফিরিয়া আসে না সেই পরম ধামে প্রবেশ করিবেন না—ইহা কি একটা কিম্বদন্তি মাত্র?

কিন্তু আমরা বিশ্বব্যাপ্তি হইতে নিজেদিগকে মুছিয়া না ফেলিয়াও সর্ব্বোচ্চ অবস্থা লাভ করিতে পারি। ব্রহ্ম যেমন বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন তেমনি সে প্রকাশ হইতে নির্লিপ্ত ও স্বতন্ত্র আছেন—এ দুই ভাব তাহাতে সদা বর্ত্তমান। আমরাও স্বরূপে ব্রহ্ম বলিয়া যুগপৎ এ দুইভাব লাভ করিতে পারি। বস্তুতঃ যে

জীবন সত্যই ভগবদ্‌জীবন হইতে চায় তাহাকে এই দুই ভাবের সমন্বয় সাধন করিতেই হইবে। যাহার মধ্যে থাকিয়া তাহাকে অতিক্রম করিয়া মুক্তি পাইতে হয়, নিবৃত্তি পথের যাত্রী হইয়া তাহাকে বর্জ্জন করিলে ভগবান যাহাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন তাহাকে ত্যাগ করা হয়। পক্ষান্তরে প্রবৃত্তি এবং কর্ম্মের মধ্যে যদি একান্তভাবে ডুবিয়া যাই তাহা হইলে উচ্চতম ও মহত্তম সত্তাকে অস্বীকার করিয়া এক নিম্নভূমিবাসী হইয়া থাকিতে হয়। কিন্তু ব্রহ্মের মধ্যে যখন এই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সমন্বিত হইয়া রহিয়াছে তখন মানুষ কেন তাহাদিগকে বিযুক্ত করিতে চাহিবে। ব্রহ্ম যেমন পূর্ণ আমাদিগকেও তেমনি পূর্ণ হইতে হইবে, ইহাই পূর্ণ সিদ্ধি।

যেখানে মৃত্যু এবং দুঃখতাপের প্রবল প্রতাপ অহমিকার সেই আত্ম-প্রকাশকে আমাদের পার হইয়া যাইতে হইবে বটে কিন্তু অবিদ্যা বা বহুত্বের মধ্য দিয়াই এ চলার পথ। বিদ্যা এবং অবিদ্যার একত্র মিলনে অর্থাৎ বহুকে একেরই বহুরূপ বলিয়া দেখিতে পারিলে আমরা পূর্ণভাবে অমরত্ব ও অমৃতত্ব লাভ করিতে পারি। সকল সম্ভূতির পর-পারস্থিত অসম্ভূতির জ্ঞান লাভ করিলে আমরা এই নিম্নতর ক্ষেত্রের জন্ম মরণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি। আবার সম্ভূতিকে ব্রহ্মজ্ঞানে পূর্ণরূপে স্বীকার করিলে মৃত্যুকেও অমরত্ব-ও অমৃতত্বে পরিবর্ত্তিত করিয়া মানবপ্রকৃতিকে সচেতন ভাবে তাহার দিব্য জ্যোতির ও চৈতন্যের প্রকাশ ক্ষেত্র করিয়া তুলিতে সমর্থ হইব।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিশ্বে মানব

> নিজ পথের পরিচালক হইতে নিজেকে পৃথক মনে করিয়া পরিব্রাজক মানবাত্মা, যাবতীয় জীবনধারার এবং চেতনার যাবতীয় ভূমির সমষ্টি এই বৃহৎ ব্রহ্মচক্রে পরিভ্রমণ করিতেছে! অবশেষে তিনি যখন তাহাকে গ্রহণ করেন তখন সে অমৃতত্ব লাভ করে।
>
> (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ১,৬)

বহু বিচিত্র এই যে জগৎ আমরা দেখিতে পাইতেছি এবং যে সমস্ত জগৎ আজও আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর হয় নাই ইহাদিগকে উপায় ও উপাদান, নিমিত্ত ও পরিবেশরূপে গ্রহণ করিয়া বিশ্বাতীত এক পরম সত্য বা সত্তা ক্রমশঃ স্পষ্টতররূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন—ইহাই বিশ্বের তাৎপর্য্য মনে হয়। কারণ বিশ্বসৃষ্টির অর্থ ও উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে, ইহা একটা আকস্মিক ঘটনা অথবা লক্ষ্যশূন্য মিথ্যাবোধ মাত্র নহে। যে যুক্তিতে আমরা মনে করি যে জগৎ-সত্তা একটা চতুর মনের প্রবঞ্চনা মাত্র নহে সেই যুক্তিতেই আমাদিগকে স্বীকার করায় যে একটা অজ্ঞান শক্তিদ্বারা পরিচালিত অসংখ্য বিভিন্ন বস্তু বা সত্তা নানারূপ সংঘাত ও বিক্ষোভের মধ্য দিয়া অন্ধ অসহায় ও লক্ষ্যহীন ভাবে চলিতে চলিতে কোনরূপে একত্র হইয়া এই বিশ্বরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে ইহা সত্য নহে। বরং ইহাই সত্য বলিয়া মনে করা যুক্তিযুক্ত—আপনাকে আপনি পূর্ণরূপে জানেন, সুতরাং নিজেই নিজের প্রভু, এমন এক সত্তা জগতের মধ্যে আবিষ্ট ও অন্তর্গূঢ়ভাবে থাকিয়া নিজেকে নানারূপে রূপায়িত করিতেছেন এবং ব্যক্তিরূপে ফুটিয়া উঠিতেছেন।

জ্যোতির্ম্ময় এই প্রকাশের সূচনাকে আমাদের আর্য্য পিতৃপুরুষেরা উষারূপে পূজা করিয়াছেন। ইহার পূর্ণতাকে তাঁহারা সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুর পরমপদরূপে তাঁহাদের মানসস্বর্গের বিশুদ্ধ আকাশে বিস্তৃত প্রজ্ঞাচক্ষুরূপে দেখিয়াছিলেন। (তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমংপদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্)। নিত্য বর্ত্তমান ইনি বিশ্বের সকল বোধ, সকল চেতনাকে ফুটাইয়া তুলিতেছেন, সকল বস্তুকে পরিচালিত করিতেছেন, সাক্ষীরূপে থাকিয়া মানুষকে প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করিতেছেন, তাইত মানুষ প্রকৃতির সাধারণ প্রগতির স্রোতে প্রথমে না জানিয়াও তাঁহার দিকে অগ্রসর হয় এবং ক্রমবর্দ্ধমান আত্মজ্ঞান ও আত্ম-প্রসারতা লাভ করিতে থাকে—অবশেষে সজ্ঞানে সেই পরমপদ লাভের জন্য ছুটিয়া চলে। দিব্য জীবনের দিকে তাহার উর্দ্ধগতিই মানুষের বিজয় যাত্রা, তাহার পরম ব্রত, তাহার ভগবদ্‌বাঞ্ছিত যজ্ঞ। এই জগতে ইহাই তাহার প্রকৃত কার্য্য, ইহার জন্যই তাহার জীবন ধারণ, ইহা না হইলে মানুষ ত বিশাল বিশ্বের মধ্যে একটুখানি কর্দ্দম ও জলের রেখামাত্র, অতি ক্ষণস্থায়ী যে সমস্ত কীট ইহার বক্ষে বিচরণ করে মানুষও তাহারই একজন।

ব্যবহারিক জগতের সকল দ্বন্দ্ব ও বিরোধের মধ্য দিয়া সকল পদার্থের সত্যস্বরূপ যিনি ফুটিয়া উঠিবেন বলা হইয়াছে, তিনি সর্ব্বত্র সকল পদার্থে সকল কালে ও কালাতীতে ভাবে এক অখণ্ড পরমানন্দময় চিন্ময় সত্তা; বিশ্বের অন্তরালে তিনি চির জাগ্রত রহিয়াছেন। বিশ্বের প্রবলতম স্পন্দ বা বিপুলতম ক্রিয়ার মধ্যেও তাহার পরিপূর্ণ প্রকাশ হইতে পারে না অথবা সে সমস্ত দ্বারা কোনরূপে সীমিত হন না। কারণ তিনি স্বয়ম্ভু, কোন প্রকাশের উপর তাঁহাকে নির্ভর করিতে হয় না। বিশ্বের সমস্ত তাঁহারই প্রতিরূপ বা প্রতীক হইলেও ইহারা তাঁহাকে নিঃশেষে প্রকাশ করিতে পারে না। বিশ্বের সমস্তই তাঁহাকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিতে পারে কিন্তু তাঁহাকে প্রকট করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। রূপের মধ্যে থাকিয়া তিনি নিজেই নিজের কাছে প্রকট হন। রূপের মাঝে সংবৃত বা গুপ্ত যে চিৎসত্তা রহিয়াছেন তিনি ক্রমপরিণতির পর্ব্বে পর্ব্বে বোধি দ্বারা আত্মদর্শন ও আত্মানুভব করিতে থাকেন। তাঁহার আত্মজ্ঞান হইতেই তিনি জগতে সম্ভূত হন এবং সম্ভূতি দ্বারা তাঁহার আত্মোপলব্ধি ঘটে। এইভাবে ভিতরে

আত্মজ্ঞানে পরিপূর্ণ থাকিয়া তিনি তাঁহার নানারূপ ও ভাবের মধ্যে সচ্চিদানন্দের চিদানন্দধারা ঢালিয়া দেন। দেহ-মন-ও-প্রাণের অতীত ক্ষেত্রে সচ্চিদানন্দ নিত্য শাশ্বতরূপে বর্ত্তমান আছেন, দেহ মন ও প্রাণের মধ্যে এই আনন্দ এই সত্তা, এই জ্ঞানকে মূর্ত্ত করিয়া তোলার উদ্দেশ্যে জীবজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, ইহাই তাহার উপযোগিতা।

যিনি অজ্ঞেয় তিনি নিজেকে সচ্চিদানন্দরূপে জানিতেছেন ইহাই বেদান্তের চরম সিদ্ধান্ত। অন্য সকল ইহারই অন্তর্গত বা ইহাকেই আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান আছে। ইহা নয় তাহা নয় বলিয়া আমরা যখন সমস্ত আকার ও আবরণকে নিরাকৃত করি, অথবা তিনি ইহা এবং তিনি তাহা এই বলিয়া সমস্ত নাম ও রূপের অন্তরে অধিষ্ঠিত নিত্য সত্যে যখন আমরা পৌঁছি তখন আমাদের চরম অনুভবে জাগিয়া থাকে ঐ একটীমাত্র সত্যদর্শন ও অভিজ্ঞতা। জীবনকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলি বা তাহাকে অতিক্রম করিয়া যাই, আত্মার শুদ্ধ নির্ব্বিচল স্বাতন্ত্র্য অথবা শক্তি আনন্দ বা পূর্ণতা যাহাই আমাদের পুরুষার্থ হউক না কেন অবিজ্ঞেয় সর্ব্বগত সচ্চিদানন্দই সেই পরম রহস্য। জ্ঞানে অথবা ভাবে, ইন্দ্রিয় সংবেদনে অথবা কর্ম্মে তাঁহারই মহা আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া মানবচৈতন্য যুগ যুগান্ত ধরিয়া তাঁহাকেই খুঁজিয়া ফিরিতেছে।

ব্যক্তি এবং বিশ্বের আকারে যে অবিজ্ঞেয় তত্ত্ব নামিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে পৌঁছিতে হইলে এই দুইএর ভিতর দিয়াই যাইতে হইবে। পরম সত্যের এই অবতরণের প্রকৃতি আত্মগোপন; তিনি ধাপে ধাপে নামিয়া আসিয়াছেন আবরণের পর আবরণ দিয়া নিজেকে গোপন করিয়া। তাই উন্নয়নের পথে মানুষকে ধাপে ধাপে অগ্রসর হইতে হইবে—অবতরণের প্রত্যেক ধাপ উত্তরায়ণের পথের একটী ক্ষেত্র বা ভূমি হইবে। ভগবদন্বেষী প্রেমিক সাধকের কাছে যে আবরণে তিনি নিজেকে আবৃত করিতেছেন সেই আবরণই আবার হইবে আবরণ মোচনের উপায়। ছন্দোময়ী জড়-প্রকৃতি যেন নিদ্রিতা, তাহার আত্মজ্ঞান নাই। যে ভাবের প্রভাবে তাহার বোধহীন এই জড় সমাধির মধ্যেও তাহার অব্যাহত ক্রিয়ার ছন্দ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে তাহাকে সে চিনেনা। কিন্তু সেই নিদ্রার মধ্য দিয়াই গতিশীল চঞ্চল নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাণ প্রবল প্রচেষ্টায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং

আত্ম-সংবিতের (self-consciousness) প্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছে তাহার রূপায়ণের পরিণতি। প্রাণ হইতে মন তাহার তপস্যার বলে জাগিয়া উঠিয়া নিজের এবং জগতের সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে, আর এই জাগরণে বিশ্ব তাহার পরম উদ্দেশ্য সাধনের উপায় লাভ করিয়াছে, সে আত্মসংবিৎসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব লাভ করিয়াছে। মন এ প্রবাহকে আরও অগ্রসর করিয়া দিবে কিন্তু তাহাকে পূর্ণতা দিবার শক্তি তাহার নাই। মনের তীক্ষ্ণ কিন্তু সীমাবদ্ধ ধীশক্তি আছে, সে দিনমজুরের কাজ করে, প্রাণ যে সমস্ত এলোমেলো উপকরণ আনিয়া উপস্থিত করে, মন নিজ শক্তি অনুসারে তাহাদের উন্নতি বিধান করিয়া, সাজাইয়া গুছাইয়া, আমাদের দিব্য মানব জীবন যিনি গড়িয়া তুলিতেছেন সেই পরম শিল্পীর হস্তে সমর্পণ করে। অতিমানসে বাস করেন সে শিল্পী—এই অতিমানসের অবতরণেই মানুষ হইবে অতিমানব (Superman)। সুতরাং জগৎকে মনের ভূমি পার হইয়া আরও উপরে উঠিয়া এমন এক উচ্চতর মহত্তর শক্তিশালী তত্ত্বে পৌঁছিতে হইবে, যেখানে গেলে জীব ও জগৎ বুঝিতে পারিবে তাহাদের উভয়ের স্বরূপ এবং এক দিব্য অনুভূতিতে পরস্পরের আত্মপরিচয় লাভ করিয়া পরম সমন্বয়ের মধ্যে মিলিত হইয়া একত্ব লাভ করিবে।

জড় প্রকৃতির ছন্দ অপেক্ষা একটী পূর্ণতর ছন্দের গোপন রহস্য আবিষ্কার করিতে পারিলে মন ও প্রাণের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলা ও বেসুরা আছে তাহা দূর করা যাইতে পারে। মন ও প্রাণের নিম্নতর ভূমিতে জড়ের ক্ষেত্রে তাহার অপ্রমেয় শক্তির ক্রিয়া এবং স্থির প্রশান্তির মধ্যে একটা সমতা আছে কিন্তু সেখানে চৈতন্য অবরুদ্ধ ও নিদ্রাচ্ছন্ন, যে নিজশক্তি দ্বারা সে পরিচালিত হয় সেই শক্তির বোধ পর্য্যন্ত যেখানে জাগে নাই সেই জড়, এই যে সমস্ত সমতা এবং সমন্বয় রহিয়াছে তাহা সচেতন ভাবে অনুভব করিবার আনন্দ হইতে বঞ্চিত।

জড় প্রকৃতির যে বোধ ছিল না সেই বোধ মন ও প্রাণের মধ্যে জাগিয়াছে—ভ্রান্তজ্ঞান বিজড়িত অভাবের তাড়না এবং বিক্ষোভিত ও অকৃতার্থ বাসনারূপে। আত্মজ্ঞান লাভের বা নিজের পূর্ণতা প্রাপ্তির পথে এ সমস্ত তাহার প্রথম পদক্ষেপ। কিন্তু এ পূর্ণতা পাইতে হইবে মন ও প্রাণের নিজেদিগকে অতিক্রম করিয়া এক উপরের ক্ষেত্রে পৌঁছিয়া। মন ও প্রাণের পরপারে গিয়া আমরা আবার সেই দিব্য সত্যের সন্ধান পাই যাহার আভাস মাত্র

জড়ের অন্ধ সমন্বয়ে ফুটিয়াছে। কিন্তু এবার যে দিব্য প্রশান্তির দেখা পাই তাহা জড়ত্ব বা মূর্চ্ছিত চেতনার অসাড়তা নহে। এখানে পূর্ণ শক্তি ও আত্মজ্ঞান ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে—অমেয় ক্রিয়াশক্তির মধ্যে রহিয়াছে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের বিপুল ছন্দ, কারণ এখানে প্রত্যেক ক্রিয়া পরম শান্তি ও স্বাধীনতা হইতে জাত, অভাব বা অজ্ঞান হইতে নহে। এখানে আসিলে অবিদ্যা সেই আলোকের পরিচয় লাভ করে যাহার অপূর্ণ প্রতিবিম্ব হইতে সে জন্মিয়াছে; অপ্রবুদ্ধ জড়ের মধ্যেও আমাদের বাসনাসমূহ অজ্ঞানে ও অস্পষ্টভাবে যাহাকে খুঁজিতেছিল সেই সুবিশাল পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া তাহারা সানন্দে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

উত্তরণের পথে ব্যষ্টি ও বিশ্ব উভয়কে উভয়ের প্রয়োজন, বস্তুতঃ তাহারা একে অপরকে সাহায্য করে এবং একের অন্যকে না হইলে চলে না। বিশ্ব সর্ব্বস্বরূপ ঈশ্বরেরই আত্মপ্রসারণ বা আত্মবিকীরণ, অনন্ত দেশ ও কালে। ব্যষ্টি জীব তাহারই কেন্দ্রীভূত বা ঘনীভূত প্রকাশ ক্ষেত্র—দেশ ও কালের সীমার মধ্যে। বিশ্ব দিব্য পূর্ণতাকে চায় অনন্ত প্রসারণের মধ্যে, কিন্তু সে উপলব্ধি পূর্ণভাবে সে লাভ করিতে পারে না, কারণ সম্প্রসারণে সত্তার গতি হয় বহুত্ব প্রকাশের দিকে, সে বহুকে যোগ করিয়াও আদি বা চরম একত্ব লাভ হয় না, পৌনঃপুনিক দশমিকের মত সে বহুত্বের আদি ও অন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাই বিশ্ব স্বীয় অভীপ্সার প্রকাশ ক্ষেত্র রূপে নিজের মধ্যে সেই সর্ব্বস্বরূপের একটী কেন্দ্রীভূত ঘনবিন্দুরূপে আত্মসচেতন ব্যষ্টিকে গড়িয়া তোলে; এই আত্ম-সচেতন জীবের মধ্য দিয়া প্রকৃতি পুরুষকে অনুভব করিবার জন্য ফিরিয়া দাঁড়ায়, জগৎ খোঁজে আত্মাকে। পুরুষ পূর্ণরূপে প্রকৃতিতে পরিণত হন, পরে প্রকৃতি আবার ক্রমশঃ পুরুষে পরিবর্ত্তিত হইতে চান ইহাই জীবসৃষ্টির তাৎপর্য্য।

পক্ষান্তরে বিশ্বকে ধরিয়াই ব্যষ্টি জীব তাহার আত্মোপলব্ধির পথে চলিতে পারে। বিশ্ব যে কেবল তাহার দিব্য কর্ম্মের ভিত্তি, ক্ষেত্র, উপায় ও উপাদান তাহা নহে; কিন্তু যেহেতু বিশ্বপ্রাণ সীমার মধ্যে কেন্দ্রীভূত বা ঘনীভূত হইয়া ব্যষ্টি জীবনে পরিণত হইয়াছে, সর্ব্বপ্রকার বন্ধন ও সকল বিশেষণের কল্পনামুক্ত ব্রহ্মের গভীর একত্ব ব্যক্তিতে নাই, সেই জন্য দিব্য পুরুষের বিশ্বভাব তাহার আত্মস্বরূপ হইলেও তাহার প্রকাশক্ষেত্র হইবার জন্য তাহাকেও বিশ্বভূত ও

নৈর্ব্যক্তিক হইতে হইবে ; তথাপি বিশ্বচেতনায় অসীম ব্যাপ্তির মধ্যে মূর্ত্ত প্রসারিত করিয়া দিয়াও তাহার ব্যক্তিত্ব যে পরম রহস্যপূর্ণ বিশ্বাতীত একটা ভাব বা বৈশিষ্ট্যকে অজ্ঞান এবং অহংবোধের আশ্রয়েই রূপ দিতে চায় তাহা রক্ষা করিতে হইবে। তাহা না হইলে সে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইবে, যে সমস্যা তাহাকে সমাধান করিতে দেওয়া হইয়াছিল তাহা অমীমাংসিত থাকিয়া যাইবে, যে উদ্দেশ্যে সে জীবজন্ম স্বীকার করিয়াছিল সেই দিব্য কর্ম্ম করা হইবে না।

বিশ্ব ব্যষ্টির কাছে আসিয়াছে গতি ও শক্তিময় প্রাণরূপে। এই প্রাণশক্তির অন্তরালে নিহিত রহস্য মাধুর্যকে আয়ত্ত করিতে হইবে। তাহাতে বহুমুখী পরিণামের যে বিপুল সংঘর্ষ, প্রচ্ছন্ন শক্তির যে দারুণ ঘূর্ণাবর্ত্ত রহিয়াছে তাহার মধ্য হইতে তাহাকে পরম শৃঙ্খলার একটা ছন্দ, অনাগত সমন্বয়ের একটা সুর আবিষ্কার করিতে হইবে। ইহাই মানুষের প্রগতির খাঁটি তাৎপর্য্য। জড়-প্রকৃতি যাহা লাভ করিয়াছে, এ জিনিষ একটু ভিন্ন ভাষায় তাহারই পুনরাবৃত্তি নয়। অথবা মননের উচ্চ পর্দ্দায় পশুবৃত্তিরই সুরসাধা মানব জীবনের আদর্শ হইতে পারে না। যদি তাহা হইত তবে জীবনে মোটামুটি ভাবে কতকটা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, কতকটা মানসিক তৃপ্তির উপাদান পাইলে মানুষের অগ্রগতি বন্ধ হইয়া যাইত। আংশিক ভাবে প্রয়োজন মিটিলে পশু তৃপ্ত হয়, অতুল ঐশ্বর্য্য দেবতাদের তৃপ্তি দেয়। কিন্তু পরম শিবকে লাভ করিতে না পারিলে মানুষ কখনও স্থায়ীভাবে বিশ্রাম নিতে পারে না। সমস্ত জীবের মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ, কেননা সেই সবার চেয়ে বেশী অতৃপ্ত, সীমার মধ্যে থাকিবার পীড়া সর্ব্বাপেক্ষা তাহার বেশী। দূরস্থিত অনাগত আদর্শের দিব্যোন্মাদ একমাত্র তাহাকেই স্পর্শ করিতে পারে।

চিন্ময় প্রাণের দিব্য সম্ভাবনাসমূহ মানুষের মধ্যেই বিশেষভাবে নিহিত রহিয়াছে। একমাত্র মানুষের সেই পরম সামর্থ্য আছে যদ্দারা ভগবানকে সে তাহার মধ্যে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে পারে। প্রাচীন ঋষিরা মানুষকে 'মনু' (মনন যাহার স্বভাব) মনোময় পুরুষ, মনোময় ব্যক্তি বা আত্মা প্রভৃতি আখ্যা দিয়াছেন। প্রাণীতত্ত্ববিদেরা যাহাদিগকে স্তন্যপায়ী জন্তু বলেন মানুষ তাহাদের উন্নত সংস্করণ মাত্র নয়—পরন্তু সে পশুদেহকে আশ্রয় করিয়া মনন ধর্ম্মী আত্মা। রূপকে, দেহকে সে স্বীকার করিয়াছে তাহার বাহনরূপে, তাহার সাহায্যে সে প্রাকৃত উপকরণের যথাযথ ব্যবহার করিতে পারিবে বলিয়া। জড়প্রকৃতি হইতে

বিকশিত যে পাশব প্রাণ তাহার মধ্যে জাগিয়াছে তাহা মানুষের সত্তার নিম্নতর ভাগ মাত্র। ভাবনা, সংবেদন, সঙ্কল্প ও সচেতন কর্ম্ম প্রবৃত্তির মধ্য দিয়া তাহার যে জীবন প্রকাশিত হইতেছে যাহার সবটাকে আমরা মন বলি, যাহা জড় ও প্রাণকে পরিচালিত করিয়া তাহাদিগকে তাহার নিজের ভাবে রূপান্তরিত করিতে চাহিতেছে, তাহাই তাহার সত্তার মধ্যভাগ। এখানেই তাহার বর্ত্তমান কার্য্যক্ষেত্র। কিন্তু ঠিক তেমনই তাহার সত্তার একটা চরম অবস্থা আছে, যাহা আজিও তাহার অধিগত হয় নাই কিন্তু তাহা তাহার দিব্য জীবনের ভিত্তি—তাহাকেই সে প্রতিনিয়ত খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, তাহার শক্তি সে তাহার দেহ মন ও প্রাণের মধ্যে সঞ্চারিত করিবে বলিয়া, তাহার বর্ত্তমান জীবন অপেক্ষা মূলতঃ উচ্চতর এইরূপ কিছুকে কার্য্যতঃ স্বীকার করাই তাহার মানবীয় সত্তায় দিব্য জীবন স্থাপনের ভিত্তি।

আত্মস্বরূপের সম্বন্ধে মানুষের মনের প্রাথমিক যে সংস্কার আছে তদপেক্ষা গভীরতর ভাবে অনুভব করার শক্তি যখন মানুষের মধ্যে জাগে তখন যাহা তাহার অভীপ্সার বস্তু তাহাতে পৌঁছিবার কোন একটা সূত্র, তাহার কোন রূপের স্পষ্ট অনুভব সে চায়। তখন তাহার সাধারণ অবস্থার সীমা ছাড়াইয়া সে এক আত্মসচেতন অনন্ত সত্তার অনুভব বা স্পর্শ লাভ করে। সেই স্পর্শ সেই অভিজ্ঞতাকে সে তাহার মনের অনুকূল ভাবে অনুবাদ করিয়া তাহাকে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, অমৃতস্বরূপ, স্বাধীনতা, প্রেম ও সৌন্দর্য্যের আধার ভগবান বলিয়া মনে করে। কিন্তু দুইদিকে দুই অন্ধকার রাত্রির মধ্যেই যেন তাহার দৃষ্টির এ দীপ্তি প্রকাশ পায়। এক অন্ধকার নীচের দিকে এবং আর এক গাঢ়তর অন্ধকার তাহার অনুভবের পরপারে। কারণ, যখন মানুষ ইহাকে পূর্ণভাবে জানিবার অভীপ্সায় আকুল হয় তখন সে দেখিতে পায়, অনুভবের যে সমস্ত সংজ্ঞা বা উপায় আছে তাহার কোনটীর মধ্যে এমন কি সমস্ত সংজ্ঞার একত্র সমাহারেও তাহাকে ধরা যায় না। তখন অবশেষে তাহার মন নিজ ধারণা লব্ধ ঈশ্বরকেও প্রত্যাখ্যান বা অতিক্রম করিয়া এক মহাশূন্যে নিজেকে মিলাইতে চায়। আবার জগতের দিকে, নিজের ভিতরে ও বাহিরের দিকে তাকাইয়া সে দেখিতে পায় তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত সব চেতনায় প্রকাশ পাইতেছে। মৃত্যু এখানে তাহার চিরসাথী, তাহার সত্তা ও তাহার অনুভূতি সঙ্কোচ ও

সীমার মধ্যে যেন আড়ষ্ট। ভ্রান্তি, নিশ্চেতনতা, দুর্ব্বলতা, জড়ত্ব, দুঃখ, শোক প্রভৃতি সর্ব্বদা তাহার চেষ্টা ও সাধনার প্রবল অন্তরায়; এখানেও অবশেষে সে ভগবানকে অস্বীকার করিয়া বসে। এই তাহার নীচের দিকের রাত্রি। কিন্তু এই অস্বীকৃতি দূরস্থিত অপর নাস্তিবাদের মত স্বভাবতঃ অনির্ব্বচনীয় রহস্যপূর্ণ এবং বুদ্ধির অগোচর নয়, মনে হয় যেন ইহা তাহার জ্ঞানগম্য অথবা জ্ঞাত এবং সুস্পষ্ট, অথচ গভীরভাবে বুঝিতে গেলে দেখা যায় যে ইহাও রহস্যপূর্ণ। ইহারা কি, কেন আছে, কোথা হইতে আসিল তাহা সে জানে না। যে ভাবে এ সমস্ত তাহার বোধে ভাসে তাহা দেখিতে পাইলেও তাহাদের মূলস্বরূপ তাহার বুদ্ধির অগোচর।

হয়ত ইহাদিগকে বুঝা যায় না, মূলতঃ ইহারা অজ্ঞেয়। অথবা তত্ত্বতঃ কোন সত্ত্বা তাহাদের নাই, ইহারা শুধু ভ্রান্তি, শুধু অসৎ। উচ্চতর নাস্তিবাদ আমাদের নিকট যেমন মূলতঃ অসৎ বা শূন্য মনে হইতে পারে, এই নিম্নতর নাস্তিবাদ মূলতঃ তেমনি শূন্য মনে হইতে পারে। উচ্চতর নাস্তিবাদ সমস্যার মীমাংসা না করিয়া পাশ কাটাইয়া যে চলিয়া যাইতে চাহিয়াছে আমরা যেমন তাহাতে সম্মত হই নাই সেইরূপ এই নিম্নতর নাস্তিবাদের সিদ্ধান্তও আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নই। জাগতিক সত্যকে পূর্ণরূপে অস্বীকার করিলে অথবা কেবলমাত্র শূন্য বলিয়া ইহাকে পরিহার করিয়া চলিলে আমাদিগকে সমস্যার সম্মুখীন না হওয়া বা জীবনের কর্ম্মকে পরিত্যাগ করা মাত্রই হইবে। এই যে সমস্ত পদার্থ যেন ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতেছে বা সচ্চিদানন্দের বিরোধী বা বিপরীত কিছু বোধ হইতেছে, ক্ষণস্থায়ী হইলেও জীবনের পক্ষে যে তাহারা সত্য ইহা ত অস্বীকার করা যায় না। ইহা এবং ইহার বিপরীত যে সমস্ত বিষয় শ্রেয়, জ্ঞান, আনন্দ, সুখ, শক্তি, ঋদ্ধি প্রভৃতিকে উপাদান রূপে গ্রহণ করিয়াই ত প্রাণের লীলা ও খেলা চলিতেছে।

হয়ত এ সমস্ত বিরোধী প্রত্যয় একান্ত মিথ্যা বা মায়ার ফল বা সহচর না হইয়া বরং একটা ভ্রান্ত সম্বন্ধ-বোধ হইতে আসিয়াছে। ভ্রান্ত বলিতেছি এই জন্য যে বিশ্বের মধ্যে জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে ভুল ধারণা আমাদের রহিয়াছে এবং সেই ভ্রান্তি ঈশ্বর এবং প্রকৃতির প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীকেও বিকৃত করিয়াছে। যে জগতে মানুষ বাস করে, মানুষকে যাহা হইয়া উঠিতে হইবে তাহাদের স্বরূপের

সহিত সে এখন যাহা হইয়াছে তাহার সামঞ্জস্য নাই, তাই বিশ্বের গোপন মূল সত্যের বিরোধী এই সমস্ত ভাবের সে অধীন হইয়া পড়িয়াছে। তাহা হইলে এ সমস্ত তাহার পতনের জন্য দণ্ড নয় কিন্তু উন্নতি পথের বিধান ও উপায়। এই সমস্ত উপাদান লইয়াই সাধনা আরম্ভ করিয়া তাহাকে পূর্ণতার পথে অগ্রসর হইতে হইবে। যে রাজমুকুট লাভ করিবার সে আশা করে এই সাধনাই তাহার মূল্য। এই সাধনার সঙ্কীর্ণ রন্ধ্রপথে চলিয়া প্রকৃতি জড় হইতে মুক্তি পাইবে, চৈতন্যে গিয়া পৌঁছিবে। এ সমস্ত একাধারে তাহার মূলধন এবং মুক্তি-পণ।

কারণ এই সমস্ত ভ্রান্ত এবং বিকৃত সম্বন্ধের মধ্য হইতে ইহাদের সাহায্যেই সত্যে পৌঁছিতে হইবে। অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে হইবে— 'অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্ত্বা'। বেদ তাই নিগূঢ় ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায় এই সমস্ত শক্তিকে তুলনা করিয়াছে দুষ্টা নারীর সঙ্গে যাহারা দুষ্প্রবৃত্তির বশে বিপথে চলে, আপন পতির অহিত সাধন করে, কিন্তু তবুও নিজেরা অসত্য এবং অসুখী হইয়াও শেষ পর্য্যন্ত 'আনন্দ যাহার স্বরূপ সেই বৃহৎ সত্যকে গড়িয়া তোলে'। তাই প্রকৃতির এই কলুষতাসমূহকে নৈতিক অস্ত্রোপচার দ্বারা ছাঁটিয়া ফেলিলে অথবা ঘৃণাভরে জীবনকে উপেক্ষা করিয়া দূরে সরিয়া গেলে চলিবে না পরন্তু মৃত্যুকে পূর্ণ জীবনে, মানুষের মধ্যে যে সঙ্কীর্ণতা ও তুচ্ছতা আছে তাহাদিগকে দিব্য ভূমার বৈভবে, দুঃখ যন্ত্রনাকে পরমানন্দে, সমস্ত কলুষতাকে শিবস্বরূপের সার্থকতায়, সমস্ত ভ্রান্তি এবং মিথ্যাকে তাহাদের অন্তরস্থিত গোপন সত্যে রূপান্তর সাধন করিতে পারিলে মানুষের যজ্ঞ ও তপস্যা পূর্ণ হইবে এবং এই ভাবে যখন পরম পুরুষের দিব্য আনন্দে স্বর্গ ও মর্ত্ত্য একাকার হইয়া যাইবে, তখন তাহার যাত্রা শেষ হইবে।

তথাপি দুরূহ প্রশ্ন থাকিয়া যায়। এই দারুণ বিরোধী ভাব কিরূপে পরস্পরের সঙ্গে মিশিবে? মরতার এই লৌহ কোন্ দিব্য সত্তার স্পর্শমণিযোগে সোনা হইবে? এ সমস্যা মিটিতে পারে, যদি ইহাদের দুইই একই সত্যের প্রকাশ বলিয়া জানা বা বুঝা যায়—যদি মূলতঃ ইহারা একই তত্ত্ব হয় তবে এ দিব্য রূপান্তর সাধন সম্ভব।

পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে বিশ্বের সর্ব্বভাবের অতীত ব্রহ্মের যে অবস্থা, যাহাকে অসৎ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহা আমাদের ধারণার অতীত এক

অস্তিত্ব, আমরা যাহাকে বাক্য ও মন দ্বারা ধরিতে ও প্রকাশ করিতে পারি না এমন এক আনন্দ। অন্ততঃপক্ষে আধ্যাত্মিক জীবনের ইতিহাসে যে সমস্ত সাধনা সত্যের আলোকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উদ্ভাসিত তাহাদের অন্যতম বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অসৎ, শূন্যবাদ ও নির্ব্বাণের কথাতেও বলা হইয়াছে যে মানুষ যখন মুক্ত হয়, তখন যে অবস্থায় পৌঁছে তাহাতে তাহার অনুভবে এক অনির্ব্বচনীয় শান্তি, এক পরম আনন্দ ফুটিয়া উঠে। এ অবস্থায় অহমিকা বা তজ্জাত সমস্ত ধারণা ও বোধ লুপ্ত হইয়া যাওয়ার সঙ্গে সমস্ত দুঃখের ঐকান্তিক এবং আত্যন্তিক প্রলয় ঘটে। সে অবস্থা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, তবু ইহা এক অনির্ব্বচনীয় পরম আনন্দের অবস্থা যাহার মধ্যে আত্মসত্তার সমস্ত অনুভব ডুবিয়া ও বিলুপ্ত হইয়া যায়—ইহা বলিলে সে অবস্থার সর্ব্বাপেক্ষা নিকটের বর্ণনা, তটস্থরূপ দিতে পারি। ইহাও সচ্চিদানন্দ বটে কিন্তু সৎ, চিৎ ও আনন্দের আমরা যে সর্ব্বোচ্চ ধারণা করিতে পারি সে ধারণাও তাহাতে আরোপ করিতে আমরা সাহস করি না। কারণ মানুষের সকল ধারণার, সকল জ্ঞানবৃত্তির অতীত সে অবস্থা।

পক্ষান্তরে যে হেতু "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম,"—"এ সমস্তই ব্রহ্ম" সুতরাং নিম্নতর ক্ষেত্রের এই নেতি, যাহা সচ্চিদানন্দের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছে না বা যাহা তাহার বিরোধী বোধ হইতেছে তাহাও সচ্চিদানন্দ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। আমাদের বুদ্ধি, অধ্যাত্ম-দর্শন, এমন কি ইন্দ্রিয় সংবেদনও ইহাকে সচ্চিদানন্দ রূপে অনুভব করিতে সমর্থ এবং ইহাদের সেই অনুভূতিই সর্ব্বদা হইত যদি অজ্ঞান, মায়া অথবা অবিদ্যা দ্বারা ইহারা অভিভূত বা ভ্রান্ত না হইয়া থাকিত। এই ভাবে দেখিলে বিশ্ব সমস্যার একটা সমাধান হয়ত পাওয়া যাইবে যদিও দার্শনিকের তর্কবুদ্ধি হয়ত সে সমাধানে তৃপ্ত হইবে না। কারণ, আমরা অবিজ্ঞেয় রহস্যের প্রান্তভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি এবং তথা হইতে বিশ্বাতীত তত্ত্বের দিকে আকুল দৃষ্টিপাত করিতেছি। কিন্তু ইহাতে দিব্য জীবন সাধনার একটা উপযুক্ত ভিত্তিভূমির অনুভব লাভ করিব।

এই সাধনার জন্য আমাদের মন যেরূপ সকল পদার্থের উপরকার সুস্পষ্ট স্তরে আবদ্ধ থাকিতে অভ্যস্ত তাহাতে চলিবে না, তাহাকে চৈতন্যের পরম গভীরে ডুবিতে ও তথায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, আজ যাহা তাহার কাছে অস্পষ্ট

রহিয়াছে সেই ভূমার সঙ্গে পরিচিত হইতে হইবে এবং সেখানে আপাততঃ যাহা তাহার আপন নয়, সত্তার সেই সমস্ত অবস্থার সহিত একত্ব স্থাপন করিতে হইবে। মানুষের ভাষা এই পরম অনুসন্ধানের পথে বিশেষ সাহায্য করিতে পারে না। তবুও আমরা ইহার ভিতর হয়ত সেই অজ্ঞেয় তত্ত্বের দু' একটী প্রতীক, দু' একটী রূপরেখা, দু' একটী ইঙ্গিতের সাক্ষাৎ পাইব যাহা আত্মার আলোক ফুটাইয়া তুলিতে সাহায্য করিবে এবং মনের উপর অনির্ব্বচনীয় পরিকল্পনার কিছু আভাস জাগাইবে।

সপ্তম অধ্যায়

অহং এবং দ্বন্দ্ববোধ

একই প্রকৃতি-বৃক্ষে আসীন পুরুষ প্রভু নয় বলিয়া শোকে ডুবিয়া মুহ্যমান হইয়া আছে কিন্তু যিনি প্রভু তাঁহার সেই অন্য মহিমাময় আত্মাকে যখন দেখিতে পায় এবং তাহার সহিত যুক্ত হয় তখন সে বীতশোক হয়।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৪।৭

স্বরূপতঃ সমস্তই যখন সচ্চিদানন্দ, তখন যে চৈতন্য তাহা পূর্ণ ও একত্ব বিধায়ক পরমজ্ঞান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ভেদ এবং আংশিক অনুভবের ভ্রান্তিরূপে বিকৃত হইয়াছে, তাহা হইতেই মৃত্যু, দুঃখ, পাপ (evil) এবং সীমার বোধ সৃষ্ট হইয়াছে; ব্যবহারিক জীবনে ইহারা সত্য বলিয়া অনুভূত হইলেও মূলতঃ ইহারা সত্য নহে। নিজেকে এবং ঈশ্বরকে আরও ভাল ভাবে বলিতে গেলে নিজের মধ্যে ঈশ্বরকে পূর্ণ এবং অবিমিশ্রভাবে অনুভব ও গ্রহণ করিবার অসামর্থ্যের জন্য সেই উর্দ্ধস্থিতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া খণ্ডিত সত্তার ভেদদর্শী বিকৃতকারক চৈতন্যের মধ্যদিয়া দেখার ফলে, জীবন এবং মৃত্যু, সু এবং কু, সুখ এবং দুঃখ, পূর্ণতা এবং অভাব প্রভৃতি দ্বন্দ্ববোধ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে—এই কথাই ইহুদী শাস্ত্রে কবিত্বের ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে—প্রকৃতিপ্রলুব্ধ হইয়া পুরুষ জ্ঞান বৃক্ষের ফল ভক্ষণ এবং সেই জন্য নন্দন কানন (ইডেন) হইতে প্রকৃতি পুরুষরূপী আদম এবং ইভের পতন হয়। ব্যক্তি-চৈতন্যের মধ্যে বিশ্বাত্মবোধ জাগিলে, জড় স্থূল-চেতনায় আধ্যাত্মিকতা ফুটিলে শাপমুক্তি ঘটিবে। কেবল তখনই প্রকৃতি-গত পুরুষ জীবন বৃক্ষের ফল ভোজনের অধিকার লাভ করিবে এবং ভগবানের স্বাধর্ম্য লাভ করিয়া অমর হইবে। কেবল তখনই তাহার জড়-চৈতন্যে নামিয়া

আসার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে—যখন মানবাত্মা এমন এক উর্দ্ধতর জ্ঞান অধিকার করিবে যাহার সহায়ে সু এবং কু, সুখ এবং দুঃখ, জীবন এবং মৃত্যুরও সম্যক্ জ্ঞান তাহার লাভ হইবে এবং সকল দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্য সেই সার্ব্বভৌম প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে দেখিতে পারিবে যেখানে তাহাদের ভেদ দিব্য একত্বের মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হইবে।

সচ্চিদানন্দ নিখিল জগতের সর্ব্বপদার্থে সমভাবে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। তাঁহার কাছে মৃত্যু, দুঃখ, পাপ, সীমা প্রভৃতি ইহাদের দিব্য জ্যোতির্ম্ময় বিপরীত ভাবের পৃষ্ঠ বা ছায়া মাত্র। আমরা এ সমস্তর মধ্যে একটা বেসুর অনুভব করি। যেখানে একত্ব থাকিবার কথা সেখানে তাহারা ভেদবোধ জাগায়, যেখানে বুদ্ধির স্বচ্ছতা থাকিবার কথা সেখানে বিকৃত জ্ঞান ও প্রমাদের সৃষ্টি করে, যেখানে সমগ্রের বৃহৎ সুরসঙ্গতির সহিত নিজের সুর মিলাইবার কথা সেখানে প্রত্যেকে আপন আপন ভেদভাবাপন্ন সুরগ্রাম স্থাপনের চেষ্টা করে। সর্ব্বপ্রকার সমগ্রতা তা বিশ্ব স্পন্দনের কোন এক বিশিষ্ট ধারার অথবা এমন কি শুধু স্থূল-চৈতন্যের সমগ্রতাই হউক—সেখানে পশ্চাতে বা ঊর্দ্ধে যাহা কিছু সক্রিয় সে সব তাহার অধিকারবহির্ভূত থাকিলেও সর্ব্বত্রই পরস্পর-বিরোধী-তত্ত্বের সৌষম্য ও সমন্বয় সাধনের ন্যূনাধিক চেষ্টা আছে। পক্ষান্তরে বিশ্বাতীত সচ্চিদানন্দে এ দ্বন্দ্ব আরোপিত হইতে পারে না। বিশ্বাতীত অবস্থা দ্বন্দ্বের সমন্বয় সাধন করে না কিন্তু এরূপ রূপান্তর ঘটায়, যে বিরোধ অতিক্রম করিয়া সমস্ত অপরূপ অলৌকিক কিছুতে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

প্রথমে আমাদিগকে ব্যক্তিজীবনের সুর সমগ্র বিশ্বসুরের সঙ্গে মিলাইয়া বাঁধিতে চেষ্টা করিতে হইবে। একটা কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে—যাহা না হইলে আমরা সমস্যা পার হইয়া যাইতে পারিব না। সে কথাটী এই যে বিশ্বের তত্ত্বসমূহকে আমাদের বর্ত্তমান চৈতন্য যে ভাষায়, যে অর্থে প্রকাশ করিতেছে, ব্যবহারিক জগতের কার্য্যক্ষেত্রে মানুষের অভিজ্ঞতা এবং উন্নতিপথে তাহার সমর্থন থাকিলেও তাহাই একমাত্র ভাষা বা একমাত্র অর্থ নহে, তাহাতে মূল তত্ত্বগুলির পূর্ণ, পর্য্যাপ্ত বা চরম পরিচয় পাওয়া যায় নাই। যেমন যে ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়সামর্থ্য দিয়া আমরা বর্ত্তমানে জড় জগৎ

দেখিতেছি তদপেক্ষা পূর্ণতর ও অধিকতর শক্তিশালী ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়সামর্থ্য থাকিতে পারে, যাহা দ্বারা জড় জগৎকে ভিন্নরূপে এবং পূর্ণতর রূপে দেখা সম্ভব, তেমনি আমাদের বর্ত্তমান প্রাকৃত দৃষ্টি বহুগুণে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে মনের এবং অতিমানসের সেরূপ দৃষ্টিশক্তিও আছে, যাহা সাধারণ মানুষের মধ্যে আজিও প্রকাশ হয় নাই। চৈতন্যের এমন ভূমিও আছে যেখানে পৌঁছিলে মৃত্যু অমৃতজীবনে উত্তরণ, সকল যন্ত্রণা বিশ্বানন্দের বিপরীত প্রবাহ, সীমা অসীমের নিজের মাঝেই কুণ্ডলীরচনা, অমঙ্গল বা অশিব শিবস্বরূপের পূর্ণতার চারিপাশে চক্রাবর্ত্তন বলিয়া মনে হইবে। কেবল মনের সাধারণ ধারণা বা কল্পনায় নহে কিন্তু অপরোক্ষদৃষ্টি ও নিত্যনিবিড় ভাবের অভিজ্ঞতা ও বোধে ইহা প্রমাণিত করিবে। ব্যক্তি জীবনের পূর্ণতালাভের পথে চৈতন্যের এইরূপ ভূমিতে উত্তীর্ণ হওয়া একটা মুখ্য ও অপরিহার্য্য সোপান।

আমাদের ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়নিষ্ঠ ভেদ-দর্শী মন যে সত্য প্রকাশ করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে তাহাকে বিসর্জ্জন না দিয়া ইহাদিগকেই উচ্চতর ভূমিতে বৃহত্তর সমন্বয়ের মধ্যে উন্নীত করিয়া রূপান্তরিত করিতে হইবে; যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইহা সম্ভব না হইতেছে ততক্ষণ অবশ্য দ্বৈতভাবাপন্ন থাকিয়া সাধারণ ব্যবহারিক জীবনে ইহাদের যে মূল্য নিরূপিত হইয়াছে তাহা নিশ্চয়ই মানিয়া চলিতে হইবে। কিন্তু ইন্দ্রিয়শক্তির উৎকর্ষই যদি শুধু ঘটে, অথচ তাহার সঙ্গে যাহা নূতন আলোকের ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত থাকিয়া পুরাতন ইন্দ্রিয় জ্ঞানের খাঁটি অর্থ বুঝাইয়া দিতে পারে এমন জ্ঞান যদি না পাই, তবে আমরা গুরুতর বিশৃঙ্খলা ও বিপর্য্যয়ের মধ্যে পড়িতে পারি; ফলে তাহা আমাদিগকে ব্যবহারিক জীবনে অনুপযুক্ত ও অশক্ত করিয়া তুলিতে এবং আমাদের বুদ্ধির সংযত প্রবৃত্তিকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া দিতে পারে। ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের মানসিক চৈতন্য সম্প্রসারিত করিয়া, ক্ষুদ্র অহং পরিচালিত দ্বৈতবুদ্ধির অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা পার হইয়া যদি কোন প্রকার সমগ্র চৈতন্যের একত্বে অনিয়ন্ত্রিত ভাবে প্রবেশ করিতে যাই, তবে তাহাতেও সহজে আমাদের মধ্যে একটা বিপর্য্যয়, ব্যবহারিক জগতের স্বাভাবিক ও সুপ্রতিষ্ঠিত গতি ভঙ্গ করিয়া আমাদের স্বাভাবিক কর্ম্ম প্রবৃত্তিতে একটা কুণ্ঠা, একটা শক্তিহীনতা আসিয়া পড়িতে পারে। এই জন্য গীতার উপদেশ জ্ঞানীব্যক্তি অজ্ঞানীর জীবন ও চিন্তার ভিত্তিতে বিপ্লব

আনিবেন না—'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গীনাম্'। কারণ জ্ঞানীর কর্ম্মের রহস্য না বুঝিয়া অজ্ঞানী যদি তাহার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করে তবে সে স্বধর্মচ্যুত হইবে অথচ জ্ঞানীর উচ্চতর ক্ষেত্রেও পৌছিতে পারিবে না।

সাময়িক সাধনা হিসাবে অথবা ব্যাপকতর চৈতন্যের প্রবেশের মূল্য রূপে অনেক মহাপুরুষ কখনও কখনও এরূপ বিপর্য্যয় ও শক্তি-হীনতা স্বীকার করিয়া নেন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে যাহাই হউক না কেন মানব জাতির প্রগতির পথে এরূপ বিশৃঙ্খলা আনিলে চলিবে না। তাহার পক্ষে উচ্চতর চৈতন্যের প্রকাশে এমন এক নূতন ভাবের সত্যের মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠা চাই, যাহাতে পার্থিব জীবনের সমস্ত উপাদান সমন্বিত হইবে, তাহাদের অর্থ, উদ্দেশ্য ও সার্থকতা নূতন ভাবে বুঝা যাইবে, তাহারা আরও শক্তিশালী হইয়া খাঁটি ভাবে কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে। সাধারণ ইন্দ্রিয়-বোধে মনে হয় সূর্য্য পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে, এই ধারণাকে কেন্দ্র করিয়া মানুষ তাহার জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করে কিন্তু এ ধারণা ভুল—সত্য ইহার বিপরীত, সূর্য্য ঘোরে না, পৃথিবীই সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু এই সত্যকে কেন্দ্র করিয়া যুক্তি যদি একটা বিজ্ঞান গড়িয়া তুলিতে না পারিত এবং তাহার মধ্যে ইন্দ্রিয়-বোধের যথাযথ মূল্য না দিত, তবে এ আবিষ্কার মানুষের বিশেষ কাজে আসিত না। তেমনি ভাবে মানসচৈতন্য মনে করে যে ঈশ্বর আমাদের ব্যক্তিগত অহংকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছেন, তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম ও বিধান সে বিচার করে অহংগত ধারণা, ভাবনা এবং অনুভব দিয়া। ইহাতে প্রকৃত পক্ষে সত্য বিকৃত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু তথাপি মানব জীবনের একটা অবস্থায় এ ভুল ধারণাও মানুষের ব্যবহারিক জীবনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত এবং তাহাকে প্রগতির পথে ইহা কিছু দূর অগ্রসর করিয়াই দেয়। কিন্তু মানুষের উচ্চতম অবস্থায় ও জ্ঞানে এ ধারণা টিকে না। 'সত্যই প্রকৃত পথ, অসত্য নয়'। প্রকৃত সত্য এই যে ঈশ্বরই বিশ্বের কেন্দ্র, আমাদের ক্ষুদ্র দ্বন্দ্ব-বোধ-পীড়িত অহংকে দিয়া তাহার কর্ম্ম ও বিধানের বিচার করা চলে না। আমাদের ব্যক্তিগত অনুভবের স্বরূপও তখনই আমরা জানিতে পারিব যখন বিশ্বের মধ্যে এবং বিশ্বাতীত ভাবে যিনি রহিয়াছেন তাঁহারই মধ্যে ইহাকে দেখিতে পাইব। তবু যথাযথ ভাবে জ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন না করিয়া অহংকেন্দ্রিকতার

স্থানে যদি সত্যের এই ধারণাকে বসাইতে চাই তাহাতে পুরাতনের স্থানে এক নূতনকে বসান হইতে পারে কিন্তু মিথ্যা থাকিয়া যাইতে পারে এবং সত্যের একটা বিষম বিপর্য্যয় দেখা দিতে পারে। এমন বিপর্য্যয় হয়ত অনেক সময় নূতন ধর্ম্ম ও নূতন দর্শনের সূচনা আনিয়া দেয় এবং সমাজজীবনে সার্থক বিপ্লব ঘটায়। কিন্তু প্রকৃত লক্ষ্যে পৌছিতে হইলে মূল সত্য ও ধারণার চারিদিকে এমন যুক্তিযুক্ত এবং সার্থক জ্ঞানের সমাবেশ করিতে হইবে যাহাতে ব্যক্তিগত জীবনের সকল সম্পদ পুনরাবিষ্কৃত হইবে, তাহাদের সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর হইবে এবং সে-সমস্তই দিব্য ভাবে রূপান্তর লাভ করিবে। তখন আমরা সত্যের এমন এক নূতন ধারায় পৌছিব যাহাতে এখন যে ভাবে আমরা জীবন যাপন করিতেছি তাহার স্থানে এক দিব্যতর জীবনের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিব এবং জগতে পার্থিব জীবনের বৃত্তি ও উপাদান সমূহকে দিব্যতর ভাবে অধিকতর শক্তির সহিত ব্যবহার করিতে শিখিব।

এই নূতন জীবন এবং শক্তি লাভ করিতে হইলে যে সমস্ত মহাসত্য আমাদের বোধ ও ধারণার মধ্যে পরমপুরুষের প্রকৃতি ফুটাইয়া তুলিবে তাহাদিগকে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা চাই। এ জন্য আমাদের অহং এবং ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করিতে হইবে, যে সমস্ত মিথ্যাকে সে স্থির সত্য বলিয়া বোধ করিতেছে তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে। যে সমগ্রতার সে অংশ এবং যে বিশ্বাতীত সত্য হইতে সে অবতীর্ণ, তাহাদের সহিত সমন্বয় সাধন করিতে হইবে, তাহাদের সহিত যে সত্য সম্বন্ধ আছে তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে। যে সত্যের মধ্যে তাহার নিজের পূর্ণতা এবং যে বিধানে মুক্তি, তাহার দিকে নিজেকে অসঙ্কোচে মেলিয়া ধরিতে হইবে। এ সাধনার উদ্দেশ্য হইবে অহংএর দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে যে সমস্ত ভ্রান্ত সংস্কার তাহার মধ্যে আসিয়াছে তাহার উচ্ছেদ। দুঃখ অমঙ্গল, সীমা, অজ্ঞান, মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া তাহাকে পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে হইবে।

আমাদের জীবনের এই সমস্ত বিষয় যদি আমাদের অহংগত বর্ত্তমান ধারণার সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত ও বদ্ধ থাকে তবে এখানে এই পৃথিবীতে আমাদের মানব জীবনের পক্ষে এই ভাবে ইহাদিগকে অতিক্রম বা উচ্ছেদ করা অসম্ভব। জীবন যদি কেবল ব্যক্তি চেতনার ঘটনা মাত্র হয়, যদি

তাহার মূলে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত এক সত্তার অধিষ্ঠান না থাকে, যদি বিশ্বাত্মার মহাপ্রাণ দ্বারা তাহা সঞ্জীবিত না হয়, বিষয় সংস্পর্শে ব্যক্তিচেতনার প্রতিক্রিয়ায় যে দ্বন্দ্ববোধ জাগে তাহা শুধু প্রতিক্রিয়া না হইয়া যদি সমস্ত প্রাণনের মর্ম্মসত্য হয়, দেহ মন প্রাণ যে সমস্ত উপাদানে গঠিত হইয়াছে, সীমা এবং সঙ্কোচই যদি তাহাদের অবিচ্ছেদ্য প্রকৃতি হয়, মৃত্যুই যদি জীবনের একমাত্র পরিণাম হয়, যদি জীবনের আদি ও অন্তে মৃত্যু ভিন্ন অন্য কিছু না থাকে, সমস্ত সংবেদনের মূলে যদি সুখ ও দুঃখের দ্বন্দ্ব অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত থাকে, আনন্দ এবং যন্ত্রণা যদি সকল আবেগের মধ্যে আলোছায়া রূপে বর্ত্তমান থাকে, সত্য ও মিথ্যা এই দুই প্রান্তের মধ্যে চির আবর্ত্তিত হওয়া ছাড়া জ্ঞানের যদি গতি না থাকে—এই সমস্ত যদি আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস হয় তবে মুক্তি পাইতে গেলে হয় আমাদিগকে সমস্ত জীবন, সমস্ত বিশ্ব যেখানে লয় পাইবে তেমন এক নির্ব্বাণের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে হয় অথবা এ জড় জগৎ হইতে ভিন্নভাবে গঠিত কোন লোকোত্তর ধামে বা জগতে চলিয়া যাইতে হয়—এ জগতে দিব্য জীবন প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

মানুষের জীবনে যাহা বর্ত্তমানে অবশ্যম্ভাবী ঘটনা বা নিশ্চিত অবস্থা রূপে রহিয়াছে তাহা আমূল পরিবর্ত্তিত হইবে এই মর্ত্ত্য জীবনেই, এ কথা অতীত ও বর্ত্তমানের সংস্কারবদ্ধ প্রাকৃত মন সহজে কল্পনা করিতে পারে না। ডারউইনের অভিব্যক্তি বাদে (theory of evolution), বানরই রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া মানুষে পরিণত হইয়াছে, এ কথা বলা হইয়াছে। মানুষ যখন সৃষ্ট হয় নাই সেই আদিম কালে অরণ্যের শাখাবিহারী বানরের পক্ষে ইহা ধারণা করা অসম্ভব ছিল যে ভবিষ্যতে এক দিন এক জাতির প্রাণী এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবে যে তাহার অন্তর ও বহিঃপ্রকৃতির উপর বুদ্ধি ও বিচারশক্তি নামক এক অদ্ভুত নূতন শক্তি প্রয়োগ করিবে, তাহার জীবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সে ঘটাবে পরিবর্ত্তন, তাহার চিরাভ্যস্ত জীবনের সমস্ত সংস্কারের মধ্যে আনিবে একটা রূপান্তর, একটা বিপ্লব, পাথর দিয়া প্রস্তুত করিবে তাহার বাসগৃহ, প্রকৃতির শক্তিকে করিবে নিয়ন্ত্রিত, সমুদ্রের উপর করিবে অবাধে বিচরণ, গগনে করিবে স্বচ্ছন্দে বিহার, নৈতিক ও ধর্ম্মবিধানে করিবে সমাজের নিয়ন্ত্রণ, তাহার মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আবিষ্কার করিবে সাধনার

সহস্র পন্থা। বানরের চিত্তে এরূপ ধারণা জাগা যদি বা কোনক্রমে সম্ভব হইত তবু প্রকৃতির কোন ক্রমপরিণতির ফলে অথবা সংকল্পের কোন সুদীর্ঘ সাধনা দ্বারা সে নিজেই ঐ জীবে কোন দিন পরিণত হইবে ইহা সে কিছুতেই মনে করিতে পারিত না। কিন্তু মানুষের মধ্যে বুদ্ধির জাগরণ হইয়াছে বিশেষতঃ কল্পনা করিবার শক্তির সঙ্গে তাহার মধ্যে বোধির উন্মেষ ঘটিয়াছে, তাই তাহার বর্ত্তমান জীবনের চেয়ে উন্নততর জীবনের কল্পনা করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে, এমন কি তাহার বর্ত্তমান অবস্থা অতিক্রম করিয়া সেই উচ্চতর জীবনে সে নিজে একদিন পৌছিতে পারিবে ইহাও সে মনে করিতে পারে। তাহার ধারণা ও সহজাত অভীপ্সার যাহা চরম কাম্য তাহা দিয়া সে একটা পরম অবস্থার কল্পনা করিয়াছে—সেখানে জ্ঞান, আনন্দ ও শক্তি আছে অথচ তাহাদের বিরোধী ভ্রম, দুঃখ বা অসামর্থ্যের লেশ মাত্র নাই, সেখানে স্বচ্ছতা এবং ঐশ্বর্য্য আছে কিন্তু তদ্‌বিরোধী দোষ ত্রুটী বা সীমার দৈন্য নাই। এই ভাবে সে দেবতার পরিকল্পনা করে, স্বর্গের ছবি আঁকে। বস্তুতঃ ঈশ্বর ও স্বর্গের সম্বন্ধে তাহার যে স্বপ্ন তাহা নিজের পূর্ণতারই স্বপ্ন। কিন্তু এখানে এই মর্ত্ত্যজীবন বাস্তব ক্ষেত্রে এ স্বপ্ন যে সফল হইবে বা সফল করিয়া তোলাই যে তাহার জীবনের উদ্দেশ্য এ কথা মনে করিতে, তাহার পূর্ব্বপুরুষ বানর নিজে অনাগত ভবিষ্যত মানুষে পরিণত হইবে ইহা ভাবিতে যেরূপ ভীত ও কুণ্ঠিত হইত সেইরূপ ভীত ও কুণ্ঠিত হয়। তাহার কল্পনা ও আধ্যাত্মিক অভীপ্সা এই উদ্দেশ্য জাগাইতে পারে কিন্তু বুদ্ধি যখন আপন আত্মপ্রতিষ্ঠা করে তখন ইহাকে জড় জগতের কঠোর সত্যের বিরোধী উজ্জ্বল কুসংস্কার মাত্র মনে করে। সে ভাবে সীমিত ক্ষুদ্র জ্ঞান, সুখ, শক্তি ও মঙ্গলই মানুষ পাইতে পারে, ওরূপ অতিপ্রাকৃত কোন অবস্থা লাভ করা তাহার পক্ষে উদ্দীপনাময় স্বপ্নছবি মাত্র।

তথাপি বুদ্ধির মধ্যেই তাহাকে অতিক্রম করিয়া যাওয়ার প্রবৃত্তি দেখা যায়। কারণ বুদ্ধির স্বরূপ ও লক্ষ্য জ্ঞানের অন্বেষণ অর্থাৎ ভ্রম-প্রমাদ-শূন্য সত্যকে লাভ করা। বৃহত্তর ভ্রম হইতে ক্ষুদ্রতর ভ্রমে পৌছা তাহার উদ্দেশ্য নয়, সে বিশ্বাস করে একটা শুদ্ধ নিত্য সত্য পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান আছে, আমরা জ্ঞান এবং ভ্রম-জ্ঞানের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ অধিকতর ভাবে সে সত্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারি। মানুষের অন্যান্য অভীপ্সার

সম্বন্ধে বুদ্ধির যে ঠিক তদ্রূপ সহজাত নিশ্চয়তা নাই তাহার কারণ তাহাদের সম্বন্ধে স্বরূপবোধ তাহার বর্ত্তমান ক্রিয়ারই মধ্যে এখনও সে লাভ করে নাই। চূড়ান্ত সুখের একটা কল্পনা আমরা করিতে পারি কারণ সুখলাভেচ্ছা হৃদয়ের সহজ ধর্ম্ম বলিয়া তাহা যে লাভ করা যায় সে সম্বন্ধে হৃদয়ের একটা বিশ্বাস ও একরূপ নিশ্চয় বোধ আছে। আমাদের দুঃখের আপাতপ্রতীয়মান কারণ বাসনার যে অতৃপ্তি তাহার উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিলে দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তি যে হইতে পারে আমাদের মনও তাহা স্বীকার করে। কিন্তু স্নায়বিক বোধ হইতে বেদনার বিলোপ সাধন অথবা দৈহিক জীবন হইতে মরণ সম্ভাবনার অপসারণ আমরা কিরূপে কল্পনা করিব? অথচ ইন্দ্রিয় বোধের সহজ ধর্ম্মই এই যে সে চায় বেদনার উচ্ছেদ, প্রাণ-চেতনার মূলে মরণকে অস্বীকার করিবার একটা প্রচণ্ড দাবি রহিয়াছে ইহা ত দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু বুদ্ধি এ সমস্তকে সহজাত অভীপ্সা বলিয়া দেখিলেও এ অভীপ্সার চরিতার্থতা অসম্ভবই মনে করে।

তবু একই নিয়ম সর্ব্বত্র খাটিবে ইহাই ত সঙ্গত। ব্যবহারিক বুদ্ধির ভ্রম এইখানে যে আপাতপ্রতীয়মান বিষয়েরই সে অত্যন্ত অধীন, যে সমস্ত গভীরতর বিষয় এখনও তাহার কাছে সম্ভাবনারূপে রহিয়াছে তাহাদিগকে যুক্তিসঙ্গত ভাবে তাহাদের পরিণামের দিকে লইয়া যাইবার উপযুক্ত সাহস তাহার নাই। অতীতে যাহা সম্ভাবনারূপে ছিল তাহারই পরিণামে বর্ত্তমান দেখা দিয়াছে, বর্ত্তমানে যাহা সম্ভাবনা রূপে রহিয়াছে ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহার ইঙ্গিত তাহাতে ব্যক্ত হইতেছে। কেন এবং কি ভাবে কোন বিষয় ঘটে তাহা জানিতে পারিলে সে বিষয়ের উপর প্রভুত্ব করা যায়, আমরা যদি ভ্রম, দুঃখ, যন্ত্রণা এবং মৃত্যুর কারণ জানিতে পারি তবে সে সমস্ত দূর করিবার আশাও করিতে পারি। কারণ জ্ঞানই শক্তি, জ্ঞানের ফলেই প্রভুত্ব লাভ হয়।

বস্তুতঃ এই সমস্ত প্রতিকূল ও অবাঞ্ছিত ব্যাপারকে আমাদের সাধ্যানুসারে উন্মূলিত করিবার আদর্শই আমরা অনুসরণ করিতেছি। ভ্রান্তি দুঃখ শোকের কারণকে খর্ব্ব করিবার চেষ্টা সর্ব্বদাই করিতেছি। জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান স্বপ্ন দেখিতেছে যে সে জন্মকে নিয়ন্ত্রিত করিবে এবং মৃত্যুকে একেবারে জয় করিতে না পারিলেও জীবনকে অতি দীর্ঘ করিয়া তুলিবে। কিন্তু আমরা

বাহ্য এবং গৌণ কারণ মাত্র দেখিতে পাইয়াছি, মূল কারণ খুঁজিয়া পাই নাই; কেবল প্রকৃতির কর্ম্ম পদ্ধতির (process) অর্থাৎ কি ভাবে ঘটনা ঘটে তাহার কিছু জ্ঞানলাভ করিয়াছি, সেই জন্য আমরা ইহাদিগকে দূরে সরাইয়া দিবার কথা মাত্র ভাবিতে পারিতেছি কিন্তু একেবারে উচ্ছেদ করিবার শক্তি লাভ করি নাই। সেই জ্ঞান লাভ হইলে আমাদের প্রকৃতির মধ্যে ইহাদিগকে পূর্ণরূপে দূরীভূত করিবার যে বিপুল সহজাত প্রবৃত্তি আছে তাহা সমর্থিত হইবে। এমন কি সমস্ত অকল্যাণের একান্ত বিলয় সাধন করিয়া আমাদের আন্তরপ্রকৃতি যাহা মানুষের চরম ও পরম সার্থকতা বলিয়া জানে সেই পূর্ণজ্ঞান ও আনন্দ, শিবত্ব ও অমরত্ব লাভ করিবে।

যিনি সমগ্র বিশ্বের একমাত্র মূল সত্য এবং সৎ-চিৎ-আনন্দ যাহার স্বরূপ ও প্রকৃতি, সেই ব্রহ্মের ধারণা ও অনুভূতি হইলে এ সমস্ত সমস্যার সমাধান হইবে, প্রাচীন বেদান্ত ইহাই শিক্ষা দিয়াছে। এই মতে এক বিশ্বব্যাপ্ত অমৃতময় সত্তার গতি ও স্পন্দন সমস্ত জীবনের, সর্ব্বগত স্বয়ম্ভু এক আনন্দ স্বরূপের খেলা সমস্ত ইন্দ্রিয়-বোধ ও আবেগের, বিশ্বময় এক সত্যের বিকীরণ সমস্ত ভাবনা ও বোধের, এক বিশ্বব্যাপী স্বতঃপরিণামী শিবশক্তির প্রবাহ সমস্ত কর্ম্মের—মূল সত্য। কিন্তু এই যে গতি ধারা, এই যে লীলা, তাহা রূপের বাহুল্য, প্রবৃত্তির বহুমুখী বৈচিত্র্য, বহু শক্তির পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইতেছে। বহুত্বই এই খেলাকে সাময়িকভাবে এক বিশেষ রূপে লাঞ্ছিত করিতে বা তাহার মধ্যে বিকৃতি আনিতে সক্ষম হইয়াছে, এমন কি ব্যক্তিগত অহং এর উৎপত্তি সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। অহং এর প্রকৃতিই এই যে এক বিশেষ রূপের, প্রবৃত্তির এক বিশেষ ধারার, শক্তির এক বিশেষ ক্ষেত্রের মধ্যে ডুবিয়া বা অভিনিবিষ্ট হইয়া অন্যান্য বিভাবের সম্বন্ধে স্বেচ্ছায় অজ্ঞ থাকিতে পারে এরূপ এক চৈতন্যের মধ্যে নিজকে সীমাবদ্ধ করা। জাগতিক শক্তি ও গতির প্রতিক্রিয়ায় অহংই ভ্রম, দুঃখ, শোক, অমঙ্গল ও মৃত্যুর বোধ জাগাইয়া তোলে বা এই ভাবে তাহাদের মূল্য নিরূপণ করে, নইলে এই গতি এক পরম সত্তার সহিত প্রকৃত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া আনন্দ, সত্য ও শিবস্বরূপের প্রকাশ করিত। ঋতের ছন্দ বা সত্য সম্বন্ধ আবার লাভ করিতে পারিলে অহং এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এ সমস্ত বোধ দূর হইয়া চেতনার কাছে ইহাদের সত্য রূপ উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে। এ অবস্থা লাভের উপায় বিশ্বচৈতন্যের এবং

বিশ্বচৈতন্য যাহার প্রকাশ ক্ষেত্র সেই বিশ্বাতীত চৈতন্যের সঙ্গে ব্যক্তিগত চৈতন্যের প্রকৃত মিলন ও সুর-সমন্বয় সাধন করা।

শেষের দিকে বেদান্তের মধ্যেও এই ধারণা ক্রমশঃ প্রবেশ করিয়াছে যে সীমিত অহং শুধু দ্বন্দ্বের কারণ মাত্র নহে, বিশ্বসত্তাও তাহার উপর নির্ভর করে। অহং এর অজ্ঞানতা দূর করিতে পারিলে দ্বন্দ্ব দূর হইবে বটে কিন্তু সেই সঙ্গে বিশ্ব-ক্রিয়া হইতে আমাদিগের অস্তিত্বও লোপ হইবে। এই মত অনুসারে মানুষের অস্তিত্বের প্রকৃতি হেয়, অসার ও অলীক বলিয়া স্বীকার করিতে হয় এবং এ জগতে থাকিয়া পূর্ণতালাভের প্রয়াস মোহের ছলনা মাত্র হইয়া দাঁড়ায়। এখানে যাহা ভাল বা সু তাহার সহিত তাহার বিপরীত কু কিছু মিশ্রিত থাকিবেই। কিন্তু যদি আমরা এই বৃহত্তর, গভীরতর ধারণা পোষণ করিতে পারি যে অহং তাহার অতীত কিছুর প্রকাশের পথে তাহারই একটা গৌণ ও সাময়িক ব্যাপার মাত্র তাহা হইলে এ বিলুপ্তি আমাদের স্বীকার করিতে হয় না, এবং বেদান্তকে জীবন হইতে পলায়নের সাহায্যে ব্যবহার না করিয়া জীবনের উন্নতি ও অভ্যুদয়ের সাধনায় প্রয়োগ করিতে পারি। জগতের যিনি প্রভু সেই ঈশ্বর বা পুরুষই জগতের কারণ এবং অধিষ্ঠান, তিনিই বিশ্ব এবং ব্যক্তির মধ্যে অনুস্যূত থাকিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। চৈতন্যের এক প্রকার বিশিষ্ট ধারার ক্রম বিকাশে, সীমিত অহং-এর প্রকাশ একটা মধ্যবর্ত্তী ঘটনা মাত্র। এই ধারা অনুসরণ করিয়া ব্যক্তি যাহার প্রতিভূ স্বরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল, নিজেকে অতিক্রম করিয়া সেই স্বোত্তর ভূমিতে সে পৌছিতে পারে এবং তাহার এই প্রতিভূ স্বরূপ ক্ষুন্ন না করিয়া, অজ্ঞানাচ্ছন্ন সীমিত অহংভাবে প্রকাশিত না হইয়া সেই পরম পুরুষের প্রকাশ-কেন্দ্র রূপে বর্ত্তমান থাকিতে পারে। ব্যক্তি চৈতন্য তখন বিশ্ব চৈতন্যের সহিত মিলিত হয় এবং সমস্ত ব্যক্তি চৈতন্য ভগবানেরই প্রকাশক্ষেত্র জানিয়া তাহাদের সহিত পরম সমন্বয়ে সমন্বিত হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে নিখিল জড় প্রকৃতিতে চিন্ময় দিব্যপুরুষের প্রকাশ জগতে মানব জীবনের ভিত্তি। এই চিন্ময় পুরুষ জড়ে সংবৃত ছিলেন এবং প্রাণ মন অতিমানসকে ফুটাইয়া তোলা তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, তিনি আছেন বলিয়া আমাদের সকল ক্রিয়া সকল গতি সম্ভব হইয়াছে। পরিণতির এই ধারাই জড়ের মধ্যে মানুষকে আনিয়াছে এবং ইহাই একদিন এই স্থূলদেহেই শ্রীভগবানকে

ফুটাইয়া তুলিবে, তাহার বিশ্বজনীন অবতরণকে সম্ভব করিবে। ঋগ্বেদে যাহাকে 'হৃত্ত সমুদ্র' বলা হইয়াছে, নিরূপ গহন সেই অবচেতনা হইতে পরম-এক এই মধ্যবর্ত্তী খণ্ড অহং এর ধারা ধরিয়া সচেতন বহুরূপে প্রথমে প্রকাশ পাইয়াছেন। অহং-চেতনার এই প্রাথমিক প্রকাশে জীবন ও মৃত্যু, সুখ ও দুঃখ, সত্য ও মিথ্যা, সু ও কু এইরূপ দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে। কারণ অখণ্ড সত্য, কল্যাণ, আনন্দ ও প্রাণের লীলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভেদ দৃষ্টি দ্বারা একটা কৃত্রিম পরিবেশের মধ্যে একত্ব খুঁজিলে তাহার স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য্য পরিণামে এই দ্বন্দ্ববোধ আসিয়া উপস্থিত হইবে। পশু-জীবনের মধ্যে যেমন মানবজীবনের পূর্ব্বাভাস রহিয়াছে—তেমনি মানব জীবন যে পরিপূর্ণ পরম জীবনের পূর্ব্বাভাস, তাহাতে পৌছিবার উপায় স্বরূপে মানুষ যখন নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে বিশ্ব এবং বিশ্বেশ্বরের দিকে পূর্ণরূপে খুলিয়া ধরে তখন তাহার এ খণ্ড অহং জ্ঞান খসিয়া পড়ে! এই সিদ্ধিতে পৌছিলে সীমিত অহং দিব্য অদ্বয় জ্ঞান ও স্বাধীনতার সচেতন প্রকাশকেন্দ্রভাবে রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, ফলে ব্যক্তির মধ্যে সমষ্টির অনুভব জাগিয়া উঠে। তখন জগতে বহুর উপর অনন্ত, অপ্রমেয় সৎস্বরূপের সত্য, কল্যাণ ও আনন্দের ধারা প্রবাহিত হয়; এবং ক্রম পরিণতি যে দিব্য উদ্দেশ্য সাধনের পথে অগ্রসর হইতেছে তাহা সিদ্ধ হয়। ভবিষ্যতে যে পরম আবির্ভাব আসিবে তাহার ভ্রূণকে জগজ্জননী প্রকৃতি আপনার গর্ভে আজও ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন এবং যাহাতে এই দিব্য জন্ম হয় তাহার সাধনা ও আয়োজন করিতেছেন।

অষ্টম অধ্যায়

বৈদান্তিক জ্ঞানের ধারা

সর্ব্বভূতে গূঢ়ভাবে অবস্থিত এই আত্মা (সাধারণের নিকট) প্রকাশ পান না। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শীরা সূক্ষ্মা অগ্র্যাবুদ্ধি দ্বারা তাহাকে দেখিতে পান। কঠোপনিষদ (৩।১২)

সচ্চিদানন্দের লীলা জগতে কিভাবে প্রকাশিত হয়? যে অহং তাহারই প্রথম জাত এক রূপ, তাহার সঙ্গে যোগ সাধন হয় কোন্ ধারার মধ্য দিয়া এবং পরে সে যোগের চরম পরিণতি হয়ই বা কোন্ পন্থায়? ভগবানের সহিত জীবের এই সম্বন্ধ এবং সংযোগের ধারার উপরই দিব্য জীবনের দর্শন ও সাধনা নির্ভর করিতেছে।

ইন্দ্রিয়ের প্রমাণকে অতিক্রম করিয়া জড় মনের আবরণ ভেদ করিয়া আমাদিগকে দিব্য সত্তার ধারণা ও জ্ঞানলাভ করিতে হয়। যতক্ষণ আমরা ইন্দ্রিয়বোধ ও বাহ্য চেতনার মধ্যে থাকিব—ততক্ষণ আমরা জড় জগৎ এবং সেখানকার বাহ্য ঘটনা ও ক্রিয়া ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাইব না। কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন কতকগুলি বৃত্তি আছে যাহাদের সাহায্যে দৃশ্য জগতের স্থূল তথ্য হইতে যুক্তি বিচার অথবা কল্পনার যোজনার দ্বারা এ সম্বন্ধে একটা মানসিক ধারণায় পৌছিতে পারা যায় যদিও কেবলমাত্র জাগতিক ঘটনা অথবা অনুভবের দ্বারা এ ধারণাকে স্থাপিত বা প্রমাণিত করা যায় না। এই সমস্ত বৃত্তির প্রথমটী শুদ্ধ বুদ্ধি।

মনুষ্য বুদ্ধির দুই প্রকারের ক্রিয়া আছে, একটী মিশ্র বা পরতন্ত্র, অপরটী শুদ্ধ বা স্বতন্ত্র। যখন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ানুভবের গণ্ডির মধ্যে থাকে, তাহার বিধানকেই চরম সত্য বলিয়া স্বীকার করে, যখন জাগতিক ঘটনা বা প্রতিভাস লইয়াই তাহার কারবার অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুনিচয়ের পরস্পর সম্বন্ধ, প্রকাশের ধারা এবং

প্রয়োজনের বাহিরে তাহার দৃষ্টি যখন চলে না, তখন মিশ্র বুদ্ধির ক্রিয়া চলিতেছে ইহা বুঝিতে হইবে। মিশ্র বুদ্ধি বস্তুর স্বরূপ সত্য কি তাহা জানিতে পারে না; বস্তু আমাদের নিকটে যেরূপ প্রতিভাত হয়, যাহাকে তাহার প্রাতিভাসিক সত্য বলা হয়, ইহা কেবল তাহাই জানিতে পারে। পক্ষান্তরে যখন 'ইন্দ্রিয়ানুভূতি হইতে যাত্রারম্ভ করিলেও সে অনুভবের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে অস্বীকৃত হইয়া তাহার উপরে উঠিয়া মন নিজের স্বাতন্ত্র্যের সাহায্যে সার্ব্বজনীন ধ্রুব সত্য যাহা প্রতিভাসের পশ্চাতে লুক্কায়িত আছে তাহাকে বাহির করিবার চেষ্টা করে তখন শুদ্ধ বুদ্ধির ক্রিয়া আরম্ভ হয়। এইভাবে যে সত্য সে সাক্ষাৎভাবে লাভ করে, ইন্দ্রিয়ানুভূতি হইতে যাত্রারম্ভ করাতে ইন্দ্রিয়বোধেরই পরিণাম এবং তাহার উপর নির্ভরশীল বোধ হইলেও বস্তুতঃ তাহা বুদ্ধির স্বতঃস্ফূর্ত্ত অনুভব। কিন্তু শুদ্ধ বুদ্ধির বিশিষ্ট ধর্ম্মের প্রকাশ তখনই পায়, যখন সে ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে ওজর, অজুহাত বা অছিলামাত্র রূপে গ্রহণ করিয়া তাহাকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া স্বকীয় অনুভবে বা ধারণায় পৌছে। তখন ইন্দ্রিয়ানুভব আমাদিগকে যাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করাইতে চায় তাহার একান্ত বিপরীত কিছুও সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে। শুদ্ধ বুদ্ধির এই গতি স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য্য, কারণ আমাদের সাধারণ অনুভব বিশ্ব ব্যাপ্পারের অতি সামান্য অংশেই সীমাবদ্ধ; সেই সীমাব মধ্যেও ইন্দ্রিয়াদি যে সমস্ত যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাহার ত্রুটি ও অপূর্ণতার জন্য এ অনুভব অপূর্ণাঙ্গ। তাই পূর্ণতর রূপে সত্যের ধারণা করিবার জন্য এ অনুভবকে অতিক্রম করিয়া যাইতে, দূরে সরাইয়া রাখিতে অথবা এ অনুভব যাহা সত্য বলিয়া আমাদিগের নিকট উপস্থিত করে অনেক সময় তাহাকে অস্বীকার করিতে হয়। মানুষ বুদ্ধির দ্বারা ইন্দ্রিয়বোধের ভ্রান্তিকে শোধন করিতে পারে এই যে অতি মূল্যবান শক্তি সে অর্জ্জন করিয়াছে তাহাই জাগতিক জীবের মধ্যে তাহার প্রাধান্যের প্রধান কারণ।

শুদ্ধ বুদ্ধির পূর্ণ বিকাশ হইলে আমরা জড়-গত জ্ঞানের জগৎ হইতে দর্শন বা তত্ত্ববিদ্যার জগতে পৌছিতে পারি। কিন্তু এইভাবে তত্ত্ববিদ্যার যে সমস্ত ধারণা আমরা লাভ করি, নিজ সত্তারই উপাদান বলিয়া শুদ্ধ বুদ্ধি তাহাতে তৃপ্ত হইলেও আমাদের সমগ্র সত্তার দাবি তাহা মিটাইতে পারে না। কারণ আমাদের প্রকৃতি সর্ব্বদাই দুই চক্ষুতে সব কিছু দেখিতে চায়—এক চক্ষুতে ভাবরূপে অন্ত

চক্ষুতে বস্তুরূপে। কাজেই শুদ্ধ বুদ্ধিদত্ত ধারণা আমাদের নিকট অপূর্ণ এবং যতক্ষণ আমাদের অভিজ্ঞতায় তাহা বাস্তব হইয়া না উঠে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের প্রকৃতির এক অংশের কাছে প্রায় অলীক। কিন্তু যে সমস্ত সত্যের কথা আমরা এখন আলোচনা করিতেছি তাহা এমন জাতীয় যে আমাদের সাধারণ অনুভূতির অনুগত তাহারা নয়। তবুও স্বভাবতঃ অতীন্দ্রিয় হইলেও বুদ্ধি তাহাদের সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারে ; সুতরাং আমাদের প্রকৃতির দাবি পূর্ণরূপে মিটাইতে গেলে এ সমস্ত অনুভব করিতে পারি এমন কোন বৃত্তি আমাদের মধ্যে প্রস্ফুটিত হওয়া চাই, এবং ইহারা জড়াতীত বলিয়া, সেজন্য প্রয়োজন আমাদের মনোময় অনুভবের সম্প্রসারণ।

এক হিসাবে আমাদের সকল অনুভবই মনোময়, কারণ ইন্দ্রিয়ের নিকট হইতে আমরা যাহা পাই তাহা মনের ভাষায় অনুবাদ করিয়া যতক্ষণ নিতে না পারি, ততক্ষণ তাহার অর্থ বা মূল্য আমাদের কাছে কিছু থাকে না। এজন্য ভারতীয় দর্শনে মনকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলা হইয়াছে। এমন কি আমরা বলিতে পারি যে মনই একমাত্র ইন্দ্রিয় ; রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ যাহারা গ্রহণ করে আমাদের সেই পঞ্চেন্দ্রিয় মনোরূপী ইন্দ্রিয়েরই বিশেষ ভাবের প্রকাশ ক্ষেত্র মাত্র। সাধারণতঃ এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিলেও মন ইহাদিগকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছে। ইহার প্রকৃতিসিদ্ধ শক্তিবলে ইন্দ্রিয়ের সাহায্য না লইয়াও মন সাক্ষাৎভাবে বিষয়ের অনুভূতি লাভ করিতে পারে। তাই বুদ্ধি বা বিচার শক্তির মত মনোময় অনুভবেরও মিশ্র বা পরতন্ত্র এবং শুদ্ধ বা স্বতন্ত্র এই দুই ভাবের ক্রিয়া আছে। সাধারণতঃ যখন মন বহির্জগৎ বা বিষয়কে জানিতে চায় তখন মিশ্র ক্রিয়া এবং যখন নিজেকে বা বিষয়ীকে অনুভব করে তখন শুদ্ধ ক্রিয়া হয়। প্রথম ক্রিয়াতে মন ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে এবং তাহাদের সাক্ষ্য অনুসারে তাহার প্রত্যয় বা ধারণা গড়িয়া তোলে ; দ্বিতীয় ভাবে মন নিজের উপর নিজে ক্রিয়া করে এবং সাক্ষাৎভাবে এক প্রকার একত্ব বোধ দিয়া তাহার বিষয়ানুভব হয় ; এইভাবে আমরা আমাদের নিজ হৃদয়ের ভাব বা আবেগ সমূহ অনুভব করি ; যেমন একটা খাঁটি কথা আছে যে আমরা ক্রোধস্বরূপ হইয়া যাই বলিয়াই ক্রোধকে অনুভব করি। আমি যে আছি এ অনুভবও আমরা করি ঠিক এই ভাবে, এ ক্ষেত্রে একত্ব বোধ হইতেই যে আমাদের জ্ঞান আসে তাহা

অবশ্য খুব স্পষ্ট। বস্তুতঃ সকল অনুভবের গোপনস্বরূপ এই একত্ব বোধ হইলেও আমরা জগতের অন্য সকল হইতে নিজেকে পৃথক করিয়া নিয়াছি বলিয়া এ অনুভবের খাঁটি প্রকৃতি আমাদের কাছে গুপ্ত থাকিয়া যায়। আমরা নিজেকে বিষয়ী বা জ্ঞাতা এবং অন্য সকলকে বিষয় বা জ্ঞেয় মনে করি। তাই ভেদ বুদ্ধি দ্বারা যে সমস্তকে আপনা হইতে পৃথক করিয়া দিয়াছি তাহাদের সহিত যোগ স্থাপন দ্বারা তাহাদের মর্ম্ম সত্য পুনর্ব্বার জানিবার জন্য আমাদিগকে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়-বোধের ধারা গড়িয়া লইতে হইয়াছে। তাই একত্ব বোধ দ্বারা সাক্ষাৎ জ্ঞানের স্থানে বাহ্যস্পর্শ এবং মনের সহবেদন দ্বারা পরোক্ষভাবে জ্ঞান লাভ করিতেছি। এই সীমার বন্ধন বস্তুত: অহং এর সৃষ্টি এবং অহং বরাবর যে ভাবে চলিয়া আসিয়াছে তাহার একটা দৃষ্টান্ত। গোড়ায় এক মিথ্যা হইতে যাত্রারম্ভ করাতে সত্যের স্বরূপকে পরেও আনুসঙ্গিক মিথ্যার দ্বারা আবৃত করিতে হইয়াছে। তাহাই আমাদের সকল সম্বন্ধের ব্যবহারিক সত্য হইয়া পড়িয়াছে।

ইহা হইতে এ অনুমান করা কঠিন নহে যে আমাদের মানসজ্ঞান ও ইন্দ্রিয়বোধ বর্ত্তমানে যে সীমার মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে সে সীমা অপরিহার্য্য নয়। ক্রমপরিণতির একটা অবস্থায় জড় জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য মন_শরীরের কতকগুলি বৃত্তি বা অঙ্গ ও তাহাদের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। তাই যখন আমরা বাহ্য জগতের সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাই তখন ইন্দ্রিয় এবং তাহাদের অনুভবের দ্বারাই মানুষ ও পদার্থের সম্বন্ধে যতটা জ্ঞান তাহারা দিতে পারে তাহা সংগ্রহ করা আমাদের সাধারণ নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; তথাপি এ বিধান দুরতি-ক্রম্য অভ্যাসের ফল মাত্র। এই সংস্কার ও অধীনতা হইতে মনকে মুক্ত করিতে পারিলে, ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত বর্ত্তমানে যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় তাহার সাক্ষাৎ অনুভব মনের পক্ষে শুধু সম্ভব হয় তাহা নহে, তাহাই তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া বোঝা যায়। সম্মোহন ও তজ্জাতীয় মানসিক ব্যাপারে ইন্দ্রিয় নিরপেক্ষ হইয়া বিষয়ানুভবের এই শক্তি যে মনের আছে তাহা দেখা যায়। প্রাণক্রিয়ার ফলে পরিণতি ধারায় জড় ও মনের মধ্যে যেটুকু সমতা ও সামঞ্জস্য স্থাপিত হইয়াছে, আমাদের জাগ্রত চেতনা তাহা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত হয় বলিয়া এরূপ সাক্ষাৎ অনুভূতি

সাধারণতঃ অসম্ভব। তাই সম্মোহনাদি ব্যাপারে জাগ্রত মনকে ঘুমাইয়া রাখিয়া অধিচেতনের ভূমিস্থিত প্রকৃত মনকে কার্য্যকর করা হয়। মন তখন তাহার খাঁটি প্রকৃতি অনুসারে কাজ করিতে পারে এবং ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ হইয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ানুভবে সক্ষম হয় এবং তখন বাহিরের এ সমস্ত বিষয়েও তাহার মিশ্র বা পরতন্ত্র ক্রিয়ার স্থানে শুদ্ধ বা স্বতন্ত্র ক্রিয়ার প্রকাশ হয়। জাগ্রত চেতনাতেও মনের এ শক্তি ফুটাইয়া তোলা দুঃসাধ্য হইলেও অসম্ভব নহে, মনঃসমীক্ষণের বিশেষ ধারা ধরিয়া যাহারা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন তাহারা ইহা জ্ঞাত আছেন।

আমরা সাধারণতঃ যে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়কে জানিতে অভ্যস্ত, আমাদের ইন্দ্রিয়গত মানসের অবাধ শক্তিসাধনার দ্বারা তদতিরিক্ত অন্য ইন্দ্রিয় বা বোধশক্তি ফুটাইয়া তোলাও সম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে কোন পদার্থ হাতে করিয়া বাহিরের যন্ত্রাদির সাহায্য ছাড়া তাহার ভারের নিখুঁত পরিমাণ বলিয়া দেওয়ার শক্তি মানুষ লাভ করিতে পারে। বস্তুতঃ শুদ্ধ মন ইন্দ্রিয়ানুভূতি হইতে যেরূপ যাত্রারম্ভ করে তদ্রূপ এক্ষেত্রে মন কোন জিনিসের সহিত ইন্দ্রিয়ের স্পর্শ শুধু তাহার সহিত যোগস্থাপনের উপায় মাত্র রূপে গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রিয়ের সাহায্যের উপর নির্ভর না করিয়া নিজের স্বতন্ত্র অনুভবশক্তির দ্বারা এ জ্ঞান লাভ করে, স্পর্শবোধের দ্বারা নহে। শুদ্ধ বুদ্ধির মত ইন্দ্রিয়গত মানসও ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে কেবল আশ্রয় রূপে গ্রহণ করিয়া এমন জ্ঞানে পৌঁছিতে পারে যাহার সহিত ইন্দ্রিয়ের কোন সম্বন্ধ নাই, এমন কি অনেক সময় এমন জ্ঞানের উদয় হইবে যাহা ইন্দ্রিয় বোধের বিরোধী বা বিপরীত কিছু। মানস জ্ঞানের এ সম্প্রসারণ শক্তি যে কেবল বাহিরের বিষয়েই আবদ্ধ তাহা নহে। একবার যে কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন বিষয়ের সহিত যুক্ত হইলে মনকে এমন ভাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে যাহাতে কোন পদার্থের অন্তর্নিহিত বিষয়ও জানা সম্ভব হয়। যেমন এই ভাবে কোন ব্যক্তির কথাবার্ত্তা আকার ঈঙ্গিত বা চাল চলনের সাহায্য না লইয়া (এমন কি ইহারা বাহ্যতঃ যে সাক্ষ্য দেয় তাহার বিপরীত হইলেও) যে অনুভব ও চিন্তাধারা তাহার মধ্যে রহিয়াছে তাহা জানা যায়। আরও কথা এই যে আমাদের সমগ্র ইন্দ্রিয় শক্তির একাংশ মাত্র জীবনের প্রয়োজনে

স্থূল ইন্দ্রিয় রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের অন্তর ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়শক্তি স্বরূপতঃ যাহা, তাহাকে সূক্ষ্মভাবে ও শুদ্ধ মনোময় রূপে ব্যবহার করিয়া এই বাহ্য জগতের পরিবেশের বাহিরে যে সমস্ত অনুভূতির বস্তু বা রূপায়ন আছে তাহাদের সন্ধান পাওয়াও মানুষের পক্ষে সম্ভব। আমাদের স্থূলমন আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তির এই সম্প্রসারণ দ্বিধা ও সন্দেহের চক্ষুতে দেখে, কারণ এ সমস্ত আমাদের অভ্যস্ত সাধারণ জীবন ও অভিজ্ঞতার কাছে অস্বাভাবিক। তাহা ছাড়া ইহাদিগকে কার্য্যকর করা কঠিন, আরও কঠিন ইহাদিগকে সুশৃঙ্খল রূপে নিয়ন্ত্রিত করিয়া জ্ঞানলাভের উপযুক্ত যন্ত্ররূপে ব্যবহার করা। তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে অনিয়ন্ত্রিত ভাবেই হউক অথবা জানিয়া বুঝিয়া সুনিয়ন্ত্রিত ভাবেই হউক মানুষ যখন তাহার বাহ্য চেতনার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করিতে সাধনা করে তখন এ শক্তি অনিবার্য্যরূপে তাহার নিকট প্রকাশ হয়।

আমাদের উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয়দ্বারা যাহাকে ধরা যায় না তাহাকে মনোময় ভূমিতে রহিয়া শুদ্ধ বুদ্ধিদ্বারা অনুভব করা যাহার কথা গীতার ভাষায় বলা হইয়াছে 'বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম'। কিন্তু সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়বৃত্তিদ্বারাও তাহা সম্ভব নয়। ইহারা আমাদিগকে বৃহত্তর জগতের খবর দেয় অথবা আমাদের পর্য্যবেক্ষণ করিবার শক্তি বাড়াইয়া তোলে কিন্তু বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান স্থূল বা সূক্ষ্ম কোন ইন্দ্রিয় কখনই দিতে পারে না। তথাপি বুদ্ধিগ্রাহ্য সত্য যদি কিছু থাকে তবে বুদ্ধির মধ্যেই সে সত্যে পৌছিবার অথবা অভিজ্ঞতার দ্বারা তাহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিবার কোন উপায় থাকিবে, ইহা বিশ্বসত্তার একটা মর্ম্মগত বিধান। একত্বজ্ঞানের যে ধারা আমাদিগের নিজের নিকট নিজের অস্তিত্বের প্রত্যয় জাগায় সেই ধারার সম্প্রসারণ ছাড়া এ জ্ঞানে পৌছিবার অন্য উপায় নাই। বস্তুতঃ আমাদের নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে অল্প বিস্তর সচেতন হইয়াই আমাদিগের মধ্যে কি আছে তাহা জানিতে পারি। সূত্রাকারে বলিতে গেলে এ জ্ঞানকে বলা যায় যে 'আধারের জ্ঞানে আধেয়ের জ্ঞান'। আমাদের স্বানুভবের মনোময়ী বৃত্তিকে সম্প্রসারিত করিয়া উপনিষদোক্ত ব্রহ্ম বা আত্মাতে যদি পৌছিতে পারি তাহা হইলে সেই বিশ্বাত্মার মধ্যে অবস্থিত সমস্ত তত্ত্ব বা সত্যের অপরোক্ষানুভূতি আমাদের লাভ হইবে। এই সম্ভাবনার উপরই ভারতীয় বেদান্ত তাহার ভিত্তি স্থাপন

করিয়াছে। তাই বেদান্ত আত্মার জ্ঞান দ্বারা জগতের জ্ঞান লাভের চেষ্টা করিয়াছে।

মনের সহিত বিষয়ের একত্ববোধ হইতে জাত হইলেও মনের অনুভব অথবা বুদ্ধির ধারণা, তাহাদের উচ্চতম অবস্থায়ও, শাশ্বত চরম একত্বে পৌছে না। আমাদিগকে মন এবং বুদ্ধিকে পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। পরিণতির ধারায় যে সর্ব্বময় অবচেতন হইতে আমরা আসিয়াছি এবং সর্ব্বময় যে অতিচেতনের দিকে আমরা চালিত হইতেছি আমাদের জাগ্রত চৈতন্যের ক্রিয়াশীলা বুদ্ধি সেই দুই এর মধ্যবর্ত্তী তত্ত্ব। অবচেতন এবং অতিচেতন এ দুইই আবার অখণ্ড এক সর্ব্বময় সত্তার দুই রূপ। অবচেতনের প্রধান কথা যেমন প্রাণ, তেমনি অতিচেতনের প্রধান কথা জ্যোতি বা আলোক। অবচেতনে জ্ঞান বা চৈতন্য প্রাণের মূলস্বরূপ ক্রিয়াশক্তির মধ্যে সংবৃতভাবে অবস্থিত, অতিচেতনে ক্রিয়াশক্তি আলোকের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় তখন তাহার মধ্যে জ্ঞান আর সংবৃত থাকে না বরং নিজেই তখন পরাসংবিতের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। বোধিপ্রত্যয় এ উভয় অবস্থার মধ্যে সাধারণ, জ্ঞানের মধ্যে যেখানে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় সচেতন এবং সক্রিয় ভাবে এক হইয়া যায় সেখানেই বোধিপ্রত্যয়ের ভিত্তিভূমি। কিন্তু অবচেতনায় বোধির প্রকাশ ক্রিয়া এবং পরিণতির প্রবেগের অন্তরালে সমগ্র ভাবে বা অল্পবিস্তর রূপে ঢাকা পড়িয়া থাকে। পক্ষান্তরে জ্যোতি বা আলোকই অতিচেতনের বিধান বা তত্ত্ব বলিয়া সেখানে বোধি তাহার স্বকীয় স্বরূপগত একত্বের জ্ঞানরূপে প্রকাশ পায় এবং ক্রিয়া তাহার আনুষঙ্গিক অংশ বা অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে দেখা দেয়, প্রধান স্থান অধিকার করিতে পারে না। এই দুই অবস্থার মধ্যে মন ও বুদ্ধি মধ্যস্থের কাজ করে এবং ক্রিয়াশক্তির মধ্যে অবরুদ্ধ জ্ঞানকে মুক্ত করিয়া তাহার স্বভাবগত নিজস্ব প্রাধান্য পুনরধিকার করিবার জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলে। মনের অনুভূতিবৃত্তি যখন আধার ও আধেয়কে, নিজের আত্মা এবং অপরের আত্মাকে এক স্বয়ংপ্রকাশ একত্বের জ্যোতির্ম্ময় মহিমায় উদ্ভাসিত করিয়া দেখে তখন সে নিজেও বোধিপ্রত্যয়ে রূপান্তরিত হইয়া যায়। ইহাই আমাদের জ্ঞানের চরমভূমি যেখানে প্রাকৃতমন অতিমানসের মধ্যে নিজের পূর্ণতা খুঁজিয়া পাইয়া তাহার সহিত এক হইয়া যায়।

মানবচিত্তের এইরূপ পরিকল্পনার উপরই প্রাচীনতম বেদান্তের সিদ্ধান্ত সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই ভিত্তিকে অবলম্বন করিয়া প্রাচীন ঋষিরা যে সব তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহার বিস্তার করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। দিব্যজীবনের সমস্যা সমূহের আলোচনাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই জন্য ঋষিদের কতগুলি প্রধান প্রধান সিদ্ধান্ত বিচার করা প্রয়োজন। কারণ আমরা যে জিনিষ পুনর্গঠন করিতে চাই তাহার সর্ব্বোত্তম প্রাচীন ভিত্তি রহিয়াছে ঐ সমস্ত ভাবে ও ধারণায়—যদিও একার্য্য করিতে গিয়া প্রাচীন বাক্যভঙ্গীকে কতকটা আধুনিক কালের উপযোগী আকার দিতে বা প্রাচীন উষার আলোক নূতন উষার আলোকে মিশাইতে হইবে। তথাপি আমাদের সেই প্রাচীন সম্পদ অথবা তাহার যতটা পুনরুদ্ধার করিতে পারি তাহা মূলধন রূপে লইয়াই নিত্যস্থির অথচ চিরচঞ্চল অনন্তের সহিত আদানপ্রদানে আমাদিগকে প্রবৃত্ত হইতে হইবে—এবং তাহাতেই আমরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভবান হইতে পারিব।

বেদান্ত বিশ্বকে বিশ্লেষণ করিয়া নির্ব্বিশেষ অনন্ত শুদ্ধ সৎ স্বরূপ এক চরম সত্য বা ব্রহ্মে পৌছিয়াছে; দৃশ্য জগতের সকল ক্রিয়া, সকল আকারের পিছনে এই ব্রহ্ম মূল বস্তু রূপে রহিয়াছে ইহাই বৈদান্তিক অনুভূতিজাত আবিষ্কার। বলা বাহুল্য এই অনুভব যখন আমরা লাভ করি তখন আমাদিগকে প্রাকৃত চেতনা এবং ব্যবহারিক জগতের অন্য সকল অনুভূতিকে পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। শুদ্ধ নির্ব্বিশেষ এই সতের কোন খবরই ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়গত মানস (sense mind) দিতে পারে না। রূপ জগতের অথবা তাহার ক্রিয়ার কথাই ইন্দ্রিয়ানুভব বলিতে পারে। রূপ আছে বটে কিন্তু তাহার শুদ্ধ অস্তিত্ব নাই তাহা মিশ্র, অপরের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত বা সমাহৃত হইয়াই সর্ব্বদা তাহার প্রকাশ। যখন আমরা আমাদের অন্তরে প্রবেশ করি তখন দেখিতে পাই সেখানে নির্দ্দিষ্ট রূপ না থাকিলেও গতি বা পরিবর্ত্তন আছে। কালে পরিবর্ত্তনের এবং দেশে জড়ের গতি ও ক্রিয়া আমাদের অস্তিত্বের সহিত যেন অবিচ্ছেদ্য ভাবে সংশ্লিষ্ট। ইচ্ছা হইলে আমরা একথা বলিতে পারি যে ইহাই আমাদের সত্তার শেষ পরিচয়, যেখানে সত্তা নিজের মধ্যেই নিজে পূর্ণ এমন কোন অবস্থার বা সত্যের আবিষ্কার কখন সম্ভব হইবে না। কিন্তু আমাদের স্বানুভূতির মধ্যে বা

পশ্চাতে কদাচিৎ আমরা নিস্পন্দ এবং সকল পরিবর্ত্তন শূন্য একটা কিছুর ক্ষণিক আভাস পাই, অতি অস্পষ্টভাবে এমন একটা ধারণা বা কল্পনা আমাদের মধ্যে জাগে যখন মনে হয় যে স্বরূপতঃ আমরা জীবন, মৃত্যু, গতি, রূপ বা পরিবর্ত্তনের অতীত একটা কিছু। আমাদের মধ্যে এই একটা দরজা আছে যাহা ক্ষণকালের জন্য খুলিয়া যায় এবং তাহা বন্ধ হইবার পূর্ব্বে জ্যোতির্ম্ময় মহাসত্যের একটি রশ্মি আমাদিগকে স্পর্শ করিয়া যাইতে পারে। সেই স্পর্শ আমাদিগকে জানাইয়া যায় যে যদি আমাদের শক্তি ও দৃঢ়তা থাকে যদি আমরা বিশ্বাস ও নিষ্ঠাকে ধরিয়া থাকিতে পারি তবে এই অবস্থা হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া ইন্দ্রিয়-মানসের সীমা অতিক্রম করিয়া বোধির রাজ্যে পৌছিয়া চৈতন্যের আর এক খেলা খেলিতে পারি।

যদি আমরা বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা করি তবে দেখিব বোধিই আমাদের প্রথম শিক্ষক, আমাদের মনের সকল ব্যাপারের অন্তরালে প্রচ্ছন্নভাবে বোধি রহিয়াছে। অজানার জ্যোতির্ম্ময় বাণীবাহকরূপে বোধিই মানুষের নিকট সেই সমস্ত বার্ত্তা পৌছাইয়া দেয় যাহা হইতে উচ্চতর জ্ঞান ও বোধের সূচনা হয়। তারপর বুদ্ধির কাজ সেই জ্যোতিরুজ্জ্বল ফসল হইতে যতটুকু আমরা লাভবান হইতে পারি তাহা বিচার করিয়া দেখা। আমরা যাহা জানি অথবা আমরা নিজেদিগকে যাহা মনে করি সে সমস্ত অতিক্রম করিয়া যাহা আছে এমন কিছুর বোধ বোধিই আমাদের মধ্যে জাগায়, যদিও সে বোধ আমাদের নিম্নতর বুদ্ধি ও স্বাভাবিক প্রাকৃত অনুভবের বিপরীত। এই বোধিই তাহাদের অরূপ বোধকে রূপ দিতে মনকে বাধ্য করে বলিয়া মানুষের মধ্যে ঈশ্বর, অমরত্ব, স্বর্গরাজ্য প্রভৃতির ধারণা জাগিয়া উঠে। প্রকৃতির মর্ম্ম হইতে উৎসারিত এই বোধি প্রকৃতির মতই শক্তিশালী, সেইজন্য যে বোধ সে জাগায় তাহা সাধারণ বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতার বিরোধী হইলেও ইহাকে তাহা গ্রাহ্য করে না। যাহা সত্য তাহাই তাহার স্বরূপ, এবং সত্য হইতেই তাহা আসিয়াছে, এই জন্য যাহা কেবলমাত্র ব্যবহারসম্ভূত এবং যাহা কেবল প্রতিভাস মাত্র তাহার শাসন মানিয়া সে চলিতে পারে না। বোধি সৎ বা থাকার (existence) চেয়ে সৎ বা যে আছে তাহারই (existent) খবর বেশী দেয়। আমাদের মধ্যে জ্যোতির্ব্বিন্দুরূপে যিনি অবস্থিত, আমাদের আত্মানুভের মধ্যে যাহার প্রকাশের দুয়ার কখনও খুলিয়া যায় তাহার নিকট হইতে

আসে বলিয়া বোধির সত্য জ্ঞান লাভের এ সুবিধা ও সুযোগ। প্রাচীন বেদান্ত বোধির এই বাণীকে লাভ করিয়াছিলেন এবং তাহাই উপনিষদে তিনটী মহাবাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন 'অহং ব্রহ্মাস্মি' আমি ব্রহ্ম, "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" হে শ্বেত-কেতু তুমি তাহাই, "সর্ব্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম, অয়মাত্মা ব্রহ্ম" যাহা কিছু আছে সে সব ব্রহ্ম এই আত্মা ব্রহ্ম।

সাধারণতঃ বোধিচৈতন্যকে মানুষের মধ্যে পরদার আড়ালে থাকিয়া প্রধানতঃ তাহার যে অংশ অনেকটা অপ্রবুদ্ধ রহিয়াছে, যাহার প্রকাশ এখনও স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই সেখানে কার্য্য করিতে হয়; তাহার জাগ্রত চৈতন্যে যবনিকার সম্মুখভাগে যে সমস্ত বৃত্তি তাহার জ্ঞানের বাহক ও করণ সে সকলের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে বোধির বাণী পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতে পারে না। তাই আমাদের প্রকৃতি যেরূপ সুসমঞ্জস এবং স্পষ্টভাবে সত্যকে চায় তেমনভাবে বোধির সত্য আসিয়া পৌছিতে পারে না। বোধি যখন আমাদের বাহ্য চেতনায় স্থান লাভ করিয়া সেখানে নিজের নেতৃত্ব স্থাপন করিতে পারিবে তখন সে পূর্ণভাবে সাক্ষাৎ জ্ঞান দিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু আমাদের বহিশ্চেতনায় বোধি নয় বুদ্ধিই নেতা, সেই আমাদের ধারণা, ভাবনা এবং কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করে। তাই প্রাচীন ঔপনিষদিক্ বোধির যুগের পরে দেখা দিল বুদ্ধির যুগ; অনুপ্রেরণালব্ধ শ্রুতির স্থান অধিকার করিল দার্শনিক বিচার; অবশেষে তাহাকেও স্থান ছাড়িয়া দিতে হইল পরীক্ষামূলক বহির্ব্বিজ্ঞানের কাছে। বোধি অতিচৈতন্যের বার্ত্তাবহ, তাই সে আমাদের জ্ঞানের উচ্চতম বৃত্তি। তাহার স্থানে যে শুদ্ধ বুদ্ধি আসিল তাহা বোধির প্রতিনিধিমাত্র, সে আমাদের সত্তার মধ্যস্তরে অবস্থিত তাহার উচ্চতাও মধ্য পর্ব্বের। শুদ্ধ বুদ্ধির পর যে মিশ্র বুদ্ধি আসিয়াছে সে আমাদের সাধারণ স্তরের অধিবাসী, শুদ্ধ বুদ্ধির মত উচ্চগ্রামে সে পৌছিতে পারে না, আমাদের জড় মন ও ইন্দ্রিয় শক্তি অথবা তাহাদের উদ্ভাবিত যন্ত্র সাহায্যে অভিজ্ঞতার দিকচক্রবাল যতটা প্রকাশ হইতে পারে, মিশ্র বুদ্ধির দৃষ্টি তাহা অতিক্রম করিতে পারে না। ইহাতে মনে হয় বটে যে ইহাতে আমরা অবনতির দিকেই চলিয়াছি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উন্নতিরই পথে ইহা একটা চক্রাবর্ত্তন; কারণ প্রতিক্ষেত্রে উচ্চতর বৃত্তি যাহা আনে তাহার যতটা পারে নিম্নতর বৃত্তি গ্রহণ এবং পরিপাক করিতে বাধ্য হয় এবং তাহার নিজের বিশিষ্ট ধারার মধ্য

দিয়া উচ্চতরকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করে। সেই চেষ্টার ফলে নিম্নতর বৃত্তি প্রসারতা লাভ করে এবং অবশেষে অধিকতর সুষ্ঠুরূপে উচ্চতর বৃত্তির সহিত নিজেকে খাপ্ খাওয়াইয়া লইতে পারে। এইভাবে একটার পর আর একটার প্রাধান্যলাভ এবং পৃথকভাবে অপরগুলি আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা না থাকিলে আমরা আমাদের প্রকৃতির এক অংশ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিচালিত হইতাম, বাকী অংশগুলি হয় অবনত থাকিয়া যাইত অথবা আমাদের প্রকৃতির সেই অংশের একান্ত অধীন হইয়া পড়িত অথবা তাহাদের কার্য্যক্ষেত্র পৃথক থাকিত, ফলে সে অংশগুলি সম্যক্‌রূপে পুষ্ট ও পরিণত হইতে পারিত না। তাই এরূপ হওয়াতে একটা সমতা রক্ষা করা সহজ হইয়াছে এবং আমাদের জ্ঞানবৃত্তির বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটা পূর্ণতর সামঞ্জস্য আনিবার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে।

ঔপনিষদ এবং তাহার পরবর্ত্তী যুগে ভারতীয় দর্শনের মধ্যেও আমরা এই ক্রম দেখিতে পাই। বেদ ও বেদান্তের ঋষিরা বোধি এবং আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার উপরই পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেন। পণ্ডিতেরা যখন বলেন যে উপনিষদের মধ্যে কোথাও কোথাও বিচার ও বিতর্কের কথা আছে তখন তাহারা সেখানে ভুল বুঝিয়াছেন ইহাই বলিতে হইবে। উপনিষদের মধ্যে যেখানে বাদানুবাদের প্রসঙ্গ আছে মনে হয়, সেখানেও যুক্তি তর্ক নাই, সেখানেও আছে বোধি ও অনুভবজাত জ্ঞানের তুলনা করিয়া সংকীর্ণ দোষযুক্ত বা গৌণপ্রত্যয়ের স্থানে উদারতর পূর্ণতর মুখ্য প্রত্যয়ে পৌছিবার চেষ্টা; সেখানে একজন অপরকে 'তুমি কি চিন্তা করিয়াছ' বা "কোন চিন্তাধারা অবলম্বনে তুমি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছ" এ প্রশ্ন করেন নাই, "তুমি কি জান বা অনুভব করিয়াছ" ইহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। উপনিষদে বৈদান্তিক সত্যকে স্থাপনা করিবার জন্য কোথাও যুক্তির আশ্রয় নেওয়ার চিহ্ন মাত্র নাই। ঋষিদের যেন ইহাই বিশ্বাস ছিল যে বোধিজাত জ্ঞানের ন্যূনতাকে পূর্ণ করিতে বিচারশক্তি সক্ষম নহে, বোধিরই পূর্ণতর উৎকর্ষ সাধন ও প্রকাশ দ্বারাই কেবল তাহা সম্ভব।

তথাপি মানুষের বুদ্ধি নিজের বিচারধারা দ্বারা না বুঝিলে তৃপ্ত হয় না। তাই যখন বুদ্ধির যুগ আসিল তখন ভারতীয় দার্শনিকেরা অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করিয়া একটী দ্বৈত ধারায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রুতি বা বোধি-লব্ধ পূর্ব্বতন প্রত্যয় সমূহকে তাহারা আগম বা আপ্ত বাক্য নামে অভিহিত

করিলেন এবং প্রামাণ্য হিসাবে তাহাদের স্থান বিচারেরও উপর নির্দ্দেশ করিলেন। তত্ত্ব বিদ্যার বিচারে অনেক সময় একটা গুরুতর গলদ আসিয়া পড়ে; শব্দ ভাবের প্রতীক, ব্যবহার কালে শব্দের অর্থ-ব্যঞ্জনার দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হয় কিন্তু তাহা ভুলিয়া শব্দকেই সার সত্য মনে করিয়া অনেক সময় শব্দ লইয়া বাদ বিতণ্ডা চলিতে থাকে, ইহা যেন বাতাসের সঙ্গে লড়াই হইয়া উঠে। কিন্তু শ্রুতির প্রামাণ্যকে প্রধান স্থান দিয়া বিচার করিলে এ দোষ অনেকটা নিরাকৃত হয়। গোড়ায় উচ্চতম ও গভীরতম অনুভব সমূহকেই কেন্দ্র করিয়া এ সমস্ত দার্শনিক বিচার চলিত তাহাতে বুদ্ধি ও বোধি উভয়ে মিলিত হইয়া সত্য নির্ণয়ের পথে অগ্রসর হইত। কিন্তু অবশেষে নিজের প্রাধান্য স্থাপনের দিকে বুদ্ধির যে একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে তাহাই কার্য্যতঃ জয়লাভ করিল—মুখে বা মতে বোধির প্রাধান্য স্বীকার করিয়াও। এইভাবে শ্রুতিকে মানিয়াও দার্শনিকগণের মধ্যে নানা সম্প্রদায় দেখা দিল, তাহারা শ্রুতিকেই অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া পরস্পরের মত খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইল। বোধিজাত উচ্চতম জ্ঞান জিনিসকে সমগ্রভাবে দেখে বলিয়া তাহার ক্ষুদ্র অংশসমূহের সামঞ্জস্য সে হারায় না, পক্ষান্তরে বুদ্ধি প্রথমে বিশ্লেষণ ও বিভাগ করিয়া পৃথক্‌রূপে বস্তুবিচার করে, পরে সেই খণ্ডগুলিকে একত্র করিয়া সমগ্র বস্তুকে গড়িতে চায়, একত্র করিবার সময় বিভিন্ন খণ্ডের মধ্যে নানা বিরোধ ও বৈষম্য দেখিতে পায়। পরস্পর-বিরোধী যুক্তি আসিয়া দেখা দেয়; এ সময় বুদ্ধির স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আসে যে তাহার সিদ্ধান্তের অনুকূল বিষয়গুলিকে রক্ষা এবং প্রতিকূল বিষয় সমূহ খণ্ডন করিয়া একটা নিখুঁত যুক্তিসঙ্গত মতকে স্থাপিত করিবে। এইরূপে বোধি হইতে যে অখণ্ড একত্ববোধ আসিয়াছিল তাহা ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া পড়িল; তখন দার্শনিকের কূট প্রতিভা শ্রুতির নানা প্রকার ব্যাখ্যা আবিষ্কার করিয়া এবং তদ্দ্বারা নিজ মতের বিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্যকে কার্য্যতঃ উড়াইয়া দিয়া নানা মতবাদের সৃষ্টি করিল এবং এইভাবে বুদ্ধি ও বিচারের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিল।

তথাপি প্রাচীন বেদান্তের প্রধান প্রধান ভাবগুলি বিভিন্ন দর্শনের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে রহিয়া গিয়াছে এবং প্রাচীন উদার বোধিজ্ঞানের অখণ্ড একত্বে তাহাদিগকে সমন্বিত করিবার চেষ্টাও মধ্যে মধ্যে দেখা দিয়াছে। তাই নানারূপে প্রকাশ হইলেও এ সমস্ত দর্শনের মধ্যে পুরুষ, আত্মা বা সদ্‌ব্রহ্ম, উপনিষদোক্ত শুদ্ধ

সত্তার মূল ধারণা আজিও বাঁচিয়া আছে। অনেক সময় বুদ্ধি এ সমস্ত ধারণাকে চিত্তভূমিতে বিচারের ক্ষেত্রে আনিয়া ফেলিতে চাহিয়াছে বটে কিন্তু তথাপি তাহাদের অনির্ব্বচনীয় সত্যের ভাব ও আভাস হারাইয়া যায় নাই। সম্ভূতির যে গতিশীলতাকে আমরা জগৎ নামে অভিহিত করি তাহার সহিত চরম ও পরম একের সম্বন্ধ কি, অহং জগতের ক্রিয়াশীলতার ফল বা কারণ যাহাই হউক না কেন, সে কি ভাবে তাহার আত্মা, ভগবান বা সত্যস্বরূপে ফিরিয়া যাইবে এই সমস্ত প্রশ্নই ভারতীয় চিন্তা ও সাধনার ধারা সর্ব্বদা আলোচনা করিয়াছে।

নবম অধ্যায়

শুদ্ধ সত্তা

সৎ স্বরূপ—এক অদ্বিতীয়।

ছান্দোগ্য উপনিষদ (৬।২।১)

সাধারণতঃ যে সমস্ত সঙ্কীর্ণ ও চঞ্চল অহংসর্বস্ব ভাবনার জালে আমরা বিজড়িত, তাহা হইতে মুক্ত হইয়া সত্যসন্ধানীর জিজ্ঞাসু এবং অবিক্ষুব্ধ দৃষ্টি লইয়া যদি আমরা বিশ্বের দিকে তাকাই, তাহা হইলে অসীম দেশ এবং শাশ্বত কালের বিশাল পটভূমিকায় এক অনন্ত সত্তার অমেয় এবং অনন্ত গতি ও ক্রিয়া প্রথমেই আমাদের চোখে পড়ে; যে সত্তা আমাদের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল অহংব্যষ্টি অথবা যে কোন অহংসমষ্টিকে অনন্তগুণে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছে, যাহার কাছে সংখ্যার অগণ্য অঙ্কপাত নগণ্য, যাহার মানদণ্ডে কোটি কোটি যুগব্যাপী সৃষ্টির বিপুল ঐশ্বর্য্য ক্ষণিক ধূলামুষ্টিমাত্র! আমরা সহজাত সংস্কারবশে এরূপভাবে কাজ বা বোধ করি অথবা জীবনের চিন্তাজাল বয়ন করি যাহাতে মনে হয় যেন জগতের এই অতি বিপুল ক্রিয়া ও গতি আমাদিগকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের জন্য আমাদের শত্রু অথবা মিত্ররূপে আবর্ত্তিত হইতেছে অথবা মনে করি যে আমাদের ব্যক্তিগত আকাঙ্খা, উচ্ছ্বাস, ভাবনা অথবা কল্পনা যেমন আমাদের প্রধান প্রয়োজন তেমনি সেই সমস্ত চরিতার্থ ও সমর্থন করা এ বিপুল বিশ্বশক্তিরও উপযুক্ত কর্ম্ম। কিন্তু যখন সত্য দৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করি তখন বুঝি যে আমাদের জন্য নহে, বিশ্ব রহিয়াছে নিজের জন্যই, দেখি ইহার লক্ষ্য বিপুল, ধারণা ও ভাবনা অসীম, বিচিত্র ও জটিল, ইহার অপরিমিত বাসনা ও আনন্দ আছে যাহার পরিপূরণ সে চায়, ইহার অমেয় বিপুল মানদণ্ডের মধ্য দিয়া যেন আমাদের ক্ষুদ্রতার দিকে স্নেহভরে স্নিগ্ধ কৌতুক হাস্যের দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে! কিন্তু তাই বলিয়া আবার অন্য প্রান্তে গিয়া আমাদের অকিঞ্চিৎকরতাকেই একান্ত বড় করিয়া যেন না দেখি,

সেরূপভাবে দেখাও অবিদ্যার দেখা হইবে, তাহাতেও বিশ্বব্যাপারের সত্য পরিচয় পাইব না।

কারণ ক্রিয়াশীলা এই অসীমশক্তি আমাদিগকে তুচ্ছ মনে করে না। এ শক্তি তাহার মহৎ কর্ম্মের মত ক্ষুদ্র কর্ম্মের মধ্যেও কিরূপ সূক্ষ্মভাবে কিরূপ নিপুণতার সহিত, কিরূপ গভীর অভিনিবেশসহকারে ক্রিয়া করে তাহা বিজ্ঞান আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছে। এ দিব্য মাতৃশক্তি পক্ষপাতশূন্য, সকলের প্রতি তাহার দৃষ্টি সমান, 'সমং ব্রহ্ম' এই মহাবাক্যে গীতা ইহার কথা বলিয়াছে। একটা সৌর জগৎ সৃষ্টি ও ধারণা করিতে এ শক্তির সংবেগ যতটা একটা পিপীলিকার ঢিপির জীবন নিয়ন্ত্রণেও ঠিক ততটা। আমরা যে একটা বড় অন্যটা ছোট মনে করি তাহা আয়তন বা পরিমাণের একটা ছলনা মাত্র। পক্ষান্তরে যদি পরিমাণের দিকে দৃষ্টি না করিয়া গুণের দিকে তাকাই তবে দেখিব যে সমস্ত সৌর জগতের চেয়ে তাহার অধিবাসী একটা পিপীলিকা বড় এবং একজন মানুষ সমস্ত জড় প্রকৃতির যোগফল হইতে বৃহত্তর কিন্তু ইহা আবার গুণের ছলনা-জাত বিভ্রান্তি। যদি আমরা গভীরতর ভাবে দেখি তবে দেখিব যে গুণ ও পরিণাম যাহার বিভূতিমাত্র সেই এক ব্রহ্ম সকলের মূলে সমভাবে অবস্থিত। সকল সত্তার মধ্যে তাহার স্থান সমানভাবে আছে বলিয়া আমরা বলিতে প্রলুব্ধ হই যে তাহার শক্তি সর্ব্বত্র সমানভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া আছে। কিন্তু তাহা বলিলে আবার আমরা পরিমাণের ছলনায় পড়িব। বস্তুতঃ ব্রহ্ম অবিভক্ত হইয়াই সকলের মধ্যে বাস করিতেছেন তথাপি যেন বিভক্ত হইয়া পৃথক হইয়া আছেন এরূপ বোধ হইতেছে! যদি আমরা আমাদের মানসিক ধারণা দ্বারা পরিচালিত না হইয়া যে বোধি চরমে আমাদিগকে একত্ববোধে লইয়া যায় সেই বোধির নিকট জ্ঞান পাইয়া দর্শনমূলক অনুভূতি দ্বারা দেখি তবে দেখিব যে এই অনন্ত শক্তির চেতনা আমাদের মনোময়ী চেতনা হইতে স্বতন্ত্র, সে চেতনা অবিভাজ্য এবং তাহা একই সময় সৌরজগৎ এবং পিপীলিকার ঢিপিকে নিজের সমান অংশ দেয় না পরন্তু প্রত্যেককে সমগ্র সত্তা দ্বারা আবিষ্ট করে। ব্রহ্মের কাছে সমগ্র ও অংশের ভেদ নাই, প্রত্যেক বস্তুই সর্ব্বরূপী ব্রহ্মময় এবং অখণ্ড ব্রহ্ম দ্বারা অনুপ্রাণিত। পরিমাণ ও গুণে ভেদ আছে কিন্তু আত্মা এক। আকার, প্রক্রিয়া ও পরিণামে অন্তহীন বৈচিত্র্য আছে কিন্তু তাহার মধ্য দিয়া একই শাশ্বত

অনাদি অনন্ত শক্তি প্রকাশ হইতেছে। সবলের মধ্যে যে শক্তি বলরূপে ফুটিয়াছে সেই পূর্ণশক্তিই দুর্ব্বলের মধ্যে দুর্ব্বলতা রূপে দেখা দিয়াছে। প্রকাশে এবং নিরোধে, ইতিতে এবং নেতিতে, নৈঃশব্দ্যে এবং শব্দে একই শক্তি ক্রিয়াশীলা।

সুতরাং জগৎ ও জীবরূপে সত্তার অনন্ত ক্রিয়াশীলা যে শক্তি রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে তাহার সহিত হিসাব নিকাশ আমাদের প্রথম প্রয়োজন; বর্ত্তমানে আমাদের নিকট যে হিসাব আছে তাহা ভুল। এ হিসাবে সর্ব্বস্বরূপের কাছে আমাদের মূল্য খুব বেশী কিন্তু আমাদের কাছে সর্ব্বের মূল্য অতি তুচ্ছ—নিজের মূল্যই আমাদের কাছে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। মূল যে অবিদ্যা হইতে আমাদের অহংকার জন্মিয়াছে, ইহা তাহারই চিহ্ন। ইহারই প্রভাবে আমাদের ক্ষুদ্র অহংকে আমরা কেন্দ্ররূপে দেখি, মনে করি এই অংহই যেন সব, আর যাহা সে নয় তাহার যে টুকুতে আমাদের মনের সার আছে অথবা বিবেকের ধাক্কায় যাহাকে না মানিয়া পারি না তাহারই হিসাব শুধু রাখি। এমন কি এই অহং যখন দর্শনালোচনা করে তখন এতদূর পর্য্যন্ত বলিয়া বসে যে সমস্ত জগৎ ইহা দ্বারা সৃষ্ট হইয়া ইহারই চৈতন্যে অবস্থিত আছে। ইহার নিজের চৈতন্য অথবা মনের মাপকাঠি দিয়াই সকল সত্যকে সে মাপিতে চায়। ইহার দৃষ্টি বা পরিবেশের বাহিরে যাহা অবস্থিত তাহা যেন ইহার কাছে মিথ্যা বা অলীক হইয়া যায়। ব্যষ্টি অহংকে এইরূপে বড় করিয়া দেখার ফলে হিসাবে ভুল হইয়া যায় এবং জীবন সম্পদের খাঁটি ও পূর্ণ মূল্যলাভ আমাদের ভাগ্যে ঘটে না। মানুষের অহং এবং মনের এই দাবির মূলে একটা সত্য আছে কিন্তু সে সত্য প্রকাশ হইবে তখনই, যখন মন আপনার অবিদ্যাকে চিনিতে পারিবে, অহং যখন সর্ব্বময়ের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া তাহার ভেদজ্ঞানে আত্ম-প্রতিষ্ঠার দাবি ভুলিয়া যাইবে। যখন আমরা জানিব যে যে রূপ বা প্রকাশকে আমরা অহং বলিয়া অভিহিত করি তাহা অনন্তভাবে ক্রিয়াশীলা এক শক্তির একটা আংশিক ক্রিয়া মাত্র এবং যখন বুঝিব যে এই অনন্তকে আমাদের জানিতে হইবে বা ইহার সহিত সজ্ঞানে একীভূত হইয়া গিয়া নিজেকে পূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে, তখনই আমাদের সত্যজীবন আরম্ভ হইবে। আমরা আমাদের আত্ম-স্বরূপে কাহারও অধীন বা গৌণপ্রকাশ নই পরন্তু এই পূর্ণশক্তির সহিত এক, এই জ্ঞান আমাদের হিসাবের অন্য দিক। আমাদের সত্তায় ও চিন্তায়, আবেগে

ও কার্য্যে এই শক্তি ফুটাইয়া তোলাই আমাদের প্রকৃত বা দিব্য জীবনলাভের অপরিহার্য্য সাধনা।

সর্ব্বময়ী অনন্ত এই সর্ব্বশক্তিস্বরূপাকে না জানিলে আমরা হিসাব মিলাইতে পারিব না। কিন্তু এইখানে আবার এক নূতন গোলযোগ উপস্থিত হয়। শুদ্ধ-বুদ্ধি বলে এবং মনে হয় যেন বেদান্তেরও তাহাতে সমর্থন আছে যে যেমন আমরা এই শক্তির একটা পরতন্ত্র রূপণ তেমনি এই শক্তিও আবার আপনা হইতে অন্যতর, দেশকালাতীত অক্ষয় অব্যয় এক মহৎ স্থাণুস্বরূপের অধীনস্থ রূপণ, তাহা শক্তি নয়, শুদ্ধ সৎ স্বরূপ, নিষ্ক্রিয়, কিন্তু তাহার মধ্যেই সমস্ত ক্রিয়া রহিয়াছে। যাহারা বিশ্বশক্তির লীলাই শুধু দেখে তাহারা বলিতে পারে পরিবর্ত্তন-শূন্য শাশ্বত শুদ্ধ সৎ বলিয়া কিছু নাই, নিশ্চলতার ধারণা হইতে জাত ইহা একটা ভ্রান্ত মানসিক বোধ মাত্র, কারণ নিশ্চল বা স্থাণু কিছুই নাই, সকলই গতিশীল, গতিকে বুঝিবার জন্য স্থাণুত্বের একটা কল্পনা মন করিয়া লইয়াছে, যাহাকে আমরা নিশ্চল বা স্থির বলিয়া মনে করি তাহাতেও গতি রহিয়াছে। শক্তির ক্রিয়া এই ভাবে রূপায়িত হয় যে আমাদের চৈতন্যে একটা স্থাণুত্বের বিভ্রম সৃষ্টি হয়, যেমন পৃথিবী গতিশীলা হইয়াও আমাদের নিকট নিশ্চলা মনে হয় অথবা যেমন চলন্ত ট্রেনে বসিয়া আমরা যেন দেখি ট্রেনটা নিশ্চল রহিয়াছে, চারিপাশের দৃশ্য পদার্থগুলি ছুটিয়া চলিয়াছে। কিন্তু এই ক্রিয়া এই গতিকে ধারণ করিয়া আছে এরূপ নিশ্চল পরিবর্ত্তনশূন্য কিছু নাই, ইহা কি সত্য? শুধু কি শক্তির ক্রিয়াই সত্তারূপে প্রতিভাত হয়? বরং ইহাই কি সত্য নয় যে শক্তি সত্তারই বহির্বিকাশ?

এরূপ সত্তা যদি কিছু থাকে তবে তাহা শক্তিরই মত অনন্ত ইহা সহজেই বুঝা যায়। যুক্তি, অনুভব, বোধি অথবা কল্পনা ইহাদের কেহই একটা সব শেষ বা ইতি আছে সে সম্ভাবনা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেয় না। যখন আমরা আদি বা অন্তের কল্পনা করিতে যাই তখনই আমাদিগকে ধরিয়া লইতে হয় যে এ আদির পূর্ব্বে কিছু ছিল এবং অন্তেরও পরে কিছু থাকিবে। একটা চরম আদি বা চরম অন্ত শুধু যুক্তি বিরুদ্ধ নয় বস্তুর মূল স্বভাবের বিরুদ্ধে একটা মিথ্যা কল্পনা মাত্র। যাহাকে কোন ক্রমেই মুছিয়া ফেলা যায় না এমন এক অনন্ত, আত্মসত্তার দ্বারা সান্তের প্রতিভাসের উপর চাপিয়া বসিয়া আছে।

কিন্তু দেশ ও কালকে লইয়া এ অনন্তত্বের প্রকাশ সীমাহীন পরিব্যাপ্তিতে অথবা কালের শাশ্বত প্রবহমানতায়। কিন্তু শুদ্ধবুদ্ধি আরও অগ্রসর হইয়া নিজের বর্ণহীন প্রখর জ্যোতি দেশ ও কালের উপর ফেলিয়া দেখাইয়া দেয় যে এ দুইটী চৈতন্যের দুইটী মুখ মাত্র; আমাদের জাগতিক ঘটনার অনুভব এই দুই তত্ত্বের দ্বারা আমরা শৃঙ্খলিত করি। যখন আমরা সত্তের স্বরূপ সত্যের দিকে তাকাই তখন দেশ ও কাল অন্তর্হিত হইয়া যায়। তখন ব্যাপ্তি যদি কিছু থাকে তবে তাহা দেশের ব্যাপ্তি নয় তাহার স্থান মনে, তেমনি প্রবহমানতা যদি কিছু থাকে তবে তাহাও কালের নয় মনের। তখন ইহা বুঝা সহজ হয় যে ব্যাপ্তি ও কালপ্রবাহবোধ মনের কাছে এমন একটা কিছুর প্রতীক যাহাকে বুদ্ধির ভাষায় অনুবাদ করা যায় না। সেই শাশ্বত এমন একটা কিছু যাহা সকল কালকে নিজের মধ্যে রাখিয়াও এক ক্ষণ রূপে অথবা সেই অনন্ত এমন কিছু যাহা সর্ব্বাধার ও সর্ব্বতোব্যাপ্ত হইয়াও পরিমাণশূন্য বিন্দু রূপে আমাদের কাছে প্রতীত হয়। এইরূপ উৎকট এবং পরস্পর বিরোধী শব্দ ও ভাষা দিয়াই এই যে কিছু আমরা অনুভব করি তাহা কতকটা খাঁটি ভাবে প্রকাশ করা যায়। তখন বুঝা যায় মন ও ভাষা তাহাদের স্বাভাবিক সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়া এমন এক সত্যকে প্রকাশ করিতে চাহিতেছে যেখানে একটা অনির্ব্বচনীয় একাত্মবোধে তাহারা তাহাদের প্রচলিত সংস্কার এবং পরস্পরবিরোধী প্রত্যয় সমূহ বিসর্জ্জন দিয়া মিলিয়া গিয়াছে।

কিন্তু এখানে প্রশ্ন হইতে পারে এ বিবরণ কি সত্য? যে শুদ্ধ সত্তের কথা বলা হইতেছে তাহা কি বুদ্ধির একটা মিথ্যা কল্পনা হইতে পারে না? আমরা কি একটা অদ্ভুত শূন্যতাকে ভাষার চাতুরী দ্বারা সত্য বলিয়া উপস্থিত করিবার চেষ্টা করিতেছি না? এ প্রশ্নের উত্তরে সেই স্বরূপ সত্তার দিকে তাকাইয়া আবার বলি এ সংশয় অমূলক। প্রাতিভাসের বা প্রতিভাত বাহ্য জগতের পশ্চাতে এমন একটা কিছু আছে যাহা শুধু অনন্ত নয় অনির্দ্দেশ্যও বটে। ব্যষ্টি অথবা সমষ্টিগত কোন প্রতিভাস স্বতন্ত্র বা অন্য-নিরপেক্ষ হইয়া বর্ত্তমান আছে ইহা আমরা বলিতে পারি না। যদি সমস্ত প্রতিভাসকে শক্তি বা গতির একটা মৌলিক প্রতিভাসে পর্য্যবসিত করি

তথাপি তাহা একটী অনির্দ্দেশ্য প্রতিভাসই থাকিয়া যাইবে। গতির ধারণার মধ্যে অবিচ্ছেদ্য ভাবে স্থিতির সম্ভাবনা বর্ত্তমান আছে এবং আমরা গতিকে এক সত্তার ক্রিয়া না ভাবিয়া পারি না। শক্তির ক্রিয়াশীলতার ধারণার মধ্যেই শক্তির একটা নিশ্চল অবস্থার ধারণা অনুস্যূত হইয়া আছে। শক্তির ক্রিয়ার চরম বিরামের অবস্থাই নির্ব্বিশেষ সত্তার সহজ ও শুদ্ধাবস্থা। এখানে আমাদিগকে দুই পক্ষের একতরকে গ্রহণ করিতেই হইবে, হয় অনির্দ্দেশ্য শুদ্ধ সৎকে স্বীকার করিতে হইবে অথবা বলিতে হইবে ক্রিয়াশীলা অনির্দ্দেশ্য এক শক্তি আছে যাহার কোন স্থাণুরূপী আধার বা কারণ নাই। যদি শুধু শক্তিই সত্য হয় অথচ তাহার আধাররূপে কোন সত্তা যদি না থাকে তবে শক্তি গতি ও ক্রিয়ার পরিণতি ছাড়া অন্য কিছু নয় ইহাই বলা হয়। এই মতই বৌদ্ধগণের শূন্যবাদ, যেখানে ক্রিয়া কর্ম্ম বা গতি মাত্র শাশ্বত প্রতিভাস রূপে দেখা হয় সত্তার জ্ঞান তজ্জাত একটা গুণ বা বোধ মাত্র, স্বরূপে সত্য নয়। কিন্তু শুদ্ধবুদ্ধি বলে এরূপ মতবাদে আমার ধারণা বা বোধ অতৃপ্ত থাকিয়া যায়, ইহা আমার মৌলিক দৃষ্টির বা অনুভবের বিরোধী, সুতরাং ইহা সত্য হইতে পারে না। কারণ যে সিঁড়ি দিয়া ধাপে ধাপে উপরে উঠিতেছিলাম, এ বোধ সত্য হইলে তাহার ধাপ যেন হঠাৎ শেষ হইয়া যায় এবং সমস্ত সিঁড়িটাই আশ্রয় বা অবলম্বনশূন্য হইয়া মহাশূন্যে ঝুলিতে থাকে।

দেশ ও কালের অতীত অনন্ত অনির্দ্দেশ্য শুদ্ধ সৎ বলিয়া যদি কিছু থাকে তাহা স্বরূপতঃ নির্ব্বিশেষ হইবে। কোন পরিমাণ বা গুণ বা তাহাদের কোন সমষ্টি দিয়া তাহাকে গড়িয়া তোলা যাইবে না। তাহাকে বহুরূপের সমাহার অথবা রূপের আধারভূত মৌলিক উপাদানও বলা যায় না। যদি বিশ্বের যাবতীয় রূপ গুণ বা পরিমাণ বিলুপ্ত হইয়া যায় তথাপি ইহা বর্ত্তমান থাকিবে। পরিমাণ গুণ বা রূপ শূন্য সতের ধারণা করা যে শুধু সম্ভব তাহা নহে—সমস্ত প্রকাশের বা প্রতিভাসের অন্তরালে এইরূপ কিছু আছে একমাত্র এই ধারণাই আমরা করিতে পারি। কাজেই যখন আমরা বলি যে ইহা পরিমাণ রূপ বা গুণশূন্য তখন আমরা ইহাই বুঝি যে সে সত্তা এ সমস্তকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, ইহা এমন একটা কিছু যাহাতে

এসমস্ত এরূপভাবে মিলাইয়া যাইতে পারে যে তাহাদের বিশিষ্ট প্রকাশ (অর্থাৎ রূপ গুণ বা পরিমাণ) আর থাকে না, আবার তাহা হইতেই গতি বা প্রকাশের মাঝে তাহারা রূপ গুণ বা পরিমাণ রূপেই প্রকাশ হয়। এ সমস্ত যে এক আকারে এক গুণে এক পরিমাণে মিলাইয়া যায় তাহা নহে কারণ সেরূপ কিছু বস্তুতঃ নাই। সমস্ত প্রকাশ বা প্রতিভাস তাহা হইতে আসিয়াছে এবং যখন আবার তাহাতে মিলাইয়া যায় তখন যে ভাবে তাহাতে তাহারা থাকে সে ভাবের সঙ্গে, প্রকাশ কালে যে সমস্ত সংজ্ঞাদ্বারা তাহারা পরিচিত হইত তাহাদের কোনটাই আর খাটেনা। এইজন্য আমরা বলি সেই শুদ্ধ সৎ স্বরূপতঃ নির্ব্বিশেষ অচিন্ত্য ও অজ্ঞেয়; তথাপি আমাদের জ্ঞানের সকল সংজ্ঞা ও ভাষাকে অতিক্রম করিয়া গেলেও এক পরম একাত্ম-বোধের দ্বারা আমরা তাহাতে পৌছিতে পারি। পক্ষান্তরে গতি ও প্রাতিভাসিক জগৎ সবিশেষের প্রকাশ ক্ষেত্র, তথাপি প্রকাশ বলিলেই বুঝিতে হইবে যে তাহার মধ্যে নির্ব্বিশেষ সত্তা রহিয়াছে আবার সমস্ত প্রকাশের আধেয় রূপে সেই সত্তা বর্ত্তমান আছে অথবা প্রতি প্রকাশই স্বরূপতঃ সেই নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব। সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষের মধ্যে এই ভেদাভেদ সম্পর্কের দৃষ্টান্ত স্বরূপ বেদান্ত সর্ব্বপদার্থের মূল আকাশকে গ্রহণ করিয়াছে; আকাশ হইতে সর্ব্ব-পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে, আকাশই তাহাদের উপাদান ও আশ্রয় স্থান তথাপি সৃষ্ট অন্য পদার্থ হইতে আকাশ এমনই স্বতন্ত্র পদার্থ যে তাহাতে মিলিয়া গেলে এসমস্ত পদার্থ বর্ত্তমানে যাহা তাহার কিছুই যেন আর থাকে না।

পদার্থ সকল যাহা হইতে আসিয়াছে তাহাতে লয় হইবার কথা যখন আমরা বলিতেছি তখন বাধ্য হইয়া আমাদিগকে কালাবচ্ছিন্ন চেতনার ভাষা ব্যবহার করিতে হইতেছে। সুতরাং তাহাতে যে ভুল হইতে পারে সে সম্বন্ধেও আমাদের সতর্ক থাকা প্রয়োজন। অপরিবর্ত্তনীয় নির্ব্বিকার সৎস্বরূপ হইতে গতির প্রতিভাসের উন্মেষ বা প্রকাশ একটী শাশ্বত ঘটনা। আমরা কালাতীত শাশ্বতের আদ্যন্তশূন্য নিত্যনব ক্ষণের ধারণা করিতে পারি না বলিয়া প্রবাহ রূপে কালের মধ্যস্থিত চিরন্তন রূপে আমরা এসমস্তকে আদি অন্ত এবং মধ্য যুক্ত করিয়া দেখি, এবং তাহাদের পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন দেখিতে পাই।

কিন্তু তবু একথা বলা যাইতে পারে যে যদি শুদ্ধ বুদ্ধির ধারণাকে স্বীকার করি এবং তাহাকে মানিয়া চলি তবে এ সব উক্তি সত্য হইতে পারে। কিন্তু বুদ্ধির ধারণাকে যে মানিতেই হইবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। যাহা আছে বলিয়া আমরা দেখিতে পাই তাহা দিয়া সত্তার পরিচয় পাইতে হইবে, যাহা মনে কল্পনা করি তাহা দিয়া নয়। আমাদের গভীরতম ও শুদ্ধতম অন্তর্দৃষ্টি দিয়াও আমরা গতি ও ক্রিয়া ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাইনা। দেখিতে পাই কেবল দুইটী পদার্থ আছে, দেশের মধ্যে গতি যাহা বস্তুগত এবং কালের মধ্যে গতি যাহা মনগত ; ব্যাপ্তি এবং প্রবাহ, দেশ এবং কাল সত্য। আমরা হয়ত ব্যাপ্তিকে অতিক্রম করিয়া গিয়া দেশকে একটা মনের বোধ মাত্র ভাবিতে পারি, মনে করিতে পারি সত্তাকে ধরিবার বা বুঝিবার চেষ্টা করিতে গিয়া অবিভাজ্য সমগ্রতাকে এক কল্পিত দেশের মধ্যে বিস্তীর্ণ করিয়া দেখা হইয়াছে। কিন্তু কালের প্রবাহ ও পরিবর্ত্তনকে আমরা ছাড়াইয়া যাইতে পারি না। ইহা আমাদের চেতনার উপাদান। জীব ও জগৎ একটা গতির প্রবাহ। অতীতের প্রবাহ পরম্পরা দ্বারা ক্রমশঃ উপচিত হইয়া উহা আমাদের বর্ত্তমানে পরিণত হইয়াছে এবং বর্ত্তমানকে আদি করিয়া আবার ভবিষ্য পরম্পরার সৃষ্টি করিবে। অথচ এই বর্ত্তমান একটা ক্ষণমাত্র, যাহাকে ধরিতে গেলে সে আমাদের এড়াইয়া যায়, যেন সে জন্মিবার আগেই মরিয়া যায়। অতএব যাহা আছে তাহা এই শাশ্বত অখণ্ড কালের একটা পরম্পরা এবং তাহার প্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছে এমন এক নিত্য উপচিত অখণ্ড চেতনার গতি।* অনন্ত কালপ্রবাহই একমাত্র শেষ তত্ত্ব। সম্ভূতিই একমাত্র সত্তা।

বস্তুতঃ খাঁটি অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে শুদ্ধ বুদ্ধির কল্পনার যে বিরোধের কথা এখানে বলা হইয়াছে তাহার মধ্যে ভ্রম আছে। সত্য সত্যই বোধিজ্ঞানের দ্বারা

*সমগ্রভাবে প্রবাহ বা গতি অখণ্ড বা অবিভাজ্য। কাল অথবা চেতনার একটা ক্ষণ তাহার পূর্ব্বতন অথবা পরবর্ত্তী ক্ষণ হইতে পৃথক করিয়া দেখাও যায়। শক্তির ক্রিয়া পরম্পরার প্রত্যেকটীকে একটা নূতন ঝলক বা নূতন সৃষ্টি বলাও চলে কিন্তু তাহাতে প্রবাহের অবিচ্ছিন্নতা বিলোপ হয় না কেননা অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ না থাকিলে কালের ব্যাপ্তি অথবা চেতনার পূর্ব্বাপর সঙ্গতি থাকে না। একটা মানুষ যখন হাঁটিয়া দৌড়াইয়া বা লাফাইয়া চলে তখন তাহার প্রতিপদক্ষেপ পৃথক বটে কিন্তু এমন একটা কিছু নিশ্চয়ই সেখানে আছে যে পদক্ষেপ করিতেছে এবং গতির প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন রাখিয়াছে।

যদি শুদ্ধবুদ্ধি বাধিত হয় তবে সে মূল অন্তর্দৃষ্টির বিরুদ্ধে বুদ্ধির ধারণা সমর্থন করা উচিৎ নয়। কিন্তু এখানে যে বোধির অভিজ্ঞতার দোহাই দেওয়া হইয়াছে তাহা অপূর্ণ। বোধি এ ক্ষেত্রে যতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে ততদূরের মধ্যে বোধি যাহা বলিয়াছে তাহা সত্য কিন্তু এখানে পূর্ণ বা সমগ্র অনুভূতিতে পৌছিতে পারে নাই বলিয়া এ ভ্রম হইয়াছে। বোধি যতক্ষণ আমাদের সম্ভূতি বা আমরা যাহা হইয়া উঠিতেছি তাহাতেই নিজেকে নিবদ্ধ করে ততক্ষণ পর্য্যন্ত শাশ্বত কালের পরম্পরার মধ্যে আমাদের চৈতন্য নিয়ত গতি ও পরিবর্ত্তনশীল ইহাই দেখিব। এই সত্যই বৌদ্ধগণের ভাষায় "আমরা নদীর প্রবাহ বা দীপের শিখা" এই ভাবের দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান হইয়াছে। কিন্তু এই অনুভবের উপরে আছে পরম সম্বোধির এক চরম অনুভব যাহাতে আমরা আমাদের বহিশ্চেতনাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারি, তখন দেখিতে পাই যে এই সম্ভূতি এই পরিবর্ত্তন এবং প্রবাহ আমাদের সত্তার একটা রূপণ মাত্র এবং আমাদের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাহা সম্ভূতিতে কখনও লিপ্ত হয় নাই। আমাদের ভিতরে অচল ও সনাতন এই যে কিছু তাহার সম্বন্ধে কেবল যে বোধিপ্রত্যয় জাগিতে পারে তাহা নহে, কেবল যে নিয়ত প্রবহমান আমাদের সম্ভূতির আবরণের পশ্চাতে অবস্থিত সে কিছুর আভাসমাত্র যে আমরা পাইতে পারি তাহাও নহে। পরন্তু আমরা তাহাতে সমাহিত হইয়া যাইতে পারি। তাহাতেই পূর্ণরূপে বাস করিতে পারি। ফলে আমাদের বাহ্য জীবন, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী, জাগতিক গতির মধ্যে আমাদের ক্রিয়ার ধারা, এ সমস্তই আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে পারে। এই যে এক স্থাণুত্বের মধ্যে আমরা বাস করিতে পারি ইহারই কথা শুদ্ধ বুদ্ধি আমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিল, যদিও বুদ্ধির কোন সাহায্য না লইয়াও, এ অবস্থা কি পূর্ব্বে তাহা না জানিয়াও, ইহাতে পৌছিতে পারা যায়। তখন অনুভব করা যায় যে ইহা শুদ্ধ সৎ, শাশ্বত, অনন্ত, অনির্দ্দেশ্য, কালের প্রবাহ বা দেশের ব্যাপ্তিদ্বারা অস্পৃষ্ট; ইহা রূপ, গুণ বা পরিমাণের অতীত কেবল নির্ব্বিশেষ আত্মস্বরূপ।

অতএব শুদ্ধ সৎ একটা বাস্তব তত্ত্ব শুধু মনের কল্পনা নহে। ইহাই মূলগত সত্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও যেন না ভুলি যে গতি-শক্তি-সম্ভূতি ও সত্য এবং বাস্তব তত্ত্ব। সম্বোধির চরম অনুভব ইহাকে খাঁটিভাবে দেখিতে শিখাইতে

পারে ইহাকে ছাড়াইয়া যাইতে এমন কি ইহাকে স্তব্ধ রাখিতে পারে কিন্তু ইহার বিনাশ সাধন করে না। সুতরাং আমরা দুইটি মূল তত্ত্ব পাইলাম। একটি শুদ্ধ-সত্তা বা অস্তি অপরটী জগদ্রূপে সম্ভূতি। এ দুইটীর একটিকে উড়াইয়া দেওয়া হয়ত সহজ কিন্তু এ উভয়কে চৈতন্যের মধ্যে দেখিতে পাওয়া এবং ইহাদের সম্বন্ধ নির্ণয় করা সত্য এবং সার্থক জ্ঞানের পরিচয়।

আমরা যেন মনে রাখি যে গতি ও গতিশূন্যতা এ উভয়রূপেই এক চরমতত্ত্ব আমাদের চৈতন্যের নিকট আত্মপ্রকাশ করে যেমন একত্ব এবং বহুত্ব এ উভয়ের মধ্য দিয়া তাহারই প্রকাশ হয়। বস্তুতঃ সে চরমতত্ত্ব অচলতা এবং সচলতা, এক এবং বহু, এ উভয়ের অতীত। গতিশূন্য একত্বে তাহার শাশ্বত প্রতিষ্ঠা এবং এই স্থিতিকে কেন্দ্রে রাখিয়া ইহার চতুর্দ্দিকে বহুরূপে অনন্ত গতিধারার অনির্ব্বচনীয়ভাবে নিত্য আবর্ত্তিত হইবার এক পরমলীলার খেলা চলিতেছে। জগদ্‌রূপ যেন নটরাজ শিবের আনন্দ তাণ্ডব নৃত্য, যাহার ফলে তাহার অনন্ত প্রতিমূর্ত্তি চতুর্দ্দিকে দেখা দিতেছে, কিন্তু তাহার শুভ্রসত্তা যেখানে যে ভাবে ছিল তাহাই আছে এবং থাকিবে। এই তাণ্ডবের উল্লাসই তাহার বিশ্বলীলার একমাত্র উদ্দেশ্য।

কিন্তু স্বরূপতঃ এই চরমতত্ত্বকে আমরা চিন্তা বা বর্ণনা করিতে পারি না, তাহার প্রয়োজনও কিছু নাই। ইহা গতিশীলতা এবং গতিশূন্যতা, এক এবং বহু, এ সমস্ত অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান। তাহার এই ভাবদ্বৈতকে, শিব এবং কালী এ উভয়কে আমরা স্বীকার করিয়া জানিতে চাহিব, যাহাকে মেয় এবং অপ্রমেয় কিছু বলা চলে না, দেশ ও কালাতীত এক স্বাম্ভু সেই শুদ্ধসত্তের সহিত দেশ ও কালের মধ্যে যে অসীম ও অপ্রমেয় গতির প্রকাশ হইতেছে তাহার সম্বন্ধ কি। শুদ্ধসত্তের সম্বন্ধে শুদ্ধবুদ্ধি, বোধি ও অভিজ্ঞতা কি বলে তাহা আমরা দেখিয়াছি। গতি এবং শক্তি সম্বন্ধে তাহারা কি বলে তাহা এবার আমাদের দেখিতে হইবে।

প্রথমেই আমাদিগকে মীমাংসা করিতে হইবে এই শক্তি কি শুধু মাত্র শক্তি, কেবল কি ইহাতে নিশ্চেতন গতির প্রকাশ? অথবা যে জগতে আমরা বাস করি সেখানে ইহা হইতে যে চৈতন্য ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে সে চৈতন্য এই নিশ্চেতন শক্তির একটা প্রাতিভাসিক

প্রকাশ নয় পরন্তু এই চৈতন্যই শক্তির খাঁটি ও গূঢ় প্রকৃতি—ইহাই কি সত্য নয়? এ প্রশ্নকে বেদান্তের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, শক্তি কি শুধু প্রকৃতি, ক্রিয়া এবং ক্রিয়াধারার একটা গতি একটা স্পন্দমাত্র অথবা প্রকৃতি স্বরূপতঃ চিৎশক্তি আত্ম-চৈতন্যের সৃষ্টি শক্তি? এ প্রশ্নের সমাধানের উপর বাকী সব নির্ভর করিতেছে।

দশম অধ্যায়

চিৎশক্তি

নিজের সচেতন ক্রিয়াধারার মধ্যে গভীরভাবে লুক্কায়িত ভগবৎ সত্তার এই আত্মশক্তি তাঁহারা দেখিতে পাইলেন।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ (১।৩)

যাহারা নিদ্রিত তাহাদের মধ্যে যাহা জাগ্রত তাহাই তিনি।

কঠ উপনিষদ (৫।৮)

গভীরভাবে দেখিলে দেখা যায় যে প্রাতিভাসিক এই নিখিল-বিশ্ব শক্তি অথবা শক্তির গতি ও স্পন্দনে পর্য্যবসিত হয়। শক্তিই নিজের অনুভূতির কাছে নিজে অল্পবিস্তর স্থূল সূক্ষ্ম অথবা ন্যূনাধিক জড় ভাবাপন্ন নানারূপে রূপায়িত হইয়া উঠিতেছে। যাহা হইতে সৃষ্টি ও সৃষ্ট পদার্থের বিধান আসিয়াছে অনন্ত সেই মহাশক্তিকে নিজেদের চেতনায় স্পষ্ট ও সত্য করিয়া তুলিতে গিয়া প্রাচীনেরা আদিতে স্থির সুতরাং রূপবিবর্জ্জিত এক সমুদ্রের সঙ্গে ইহার তুলনা করিয়াছেন। সেই সমুদ্রের মধ্যে প্রথমে এক আলোড়নের, এক গতির উদ্ভব হইতেই রূপসৃষ্টির প্রয়োজন জাগিয়া উঠে, তাহাই বিশ্বের বীজ স্বরূপ।

শক্তি যখন জড় আকারে রূপায়িত হইয়া উঠে, তখনই আমাদের বুদ্ধি তাহা সহজে ধারণা করিতে পারে। কারণ, জড়ের সংস্পর্শে জড় মস্তিষ্কের অধিগত মনে সাড়ার ক্রম জাগরণে এ বুদ্ধি গঠিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের পদার্থ-বিদ্যাবিদগণ জড় শক্তির আদিম অবস্থার নাম দিয়াছিলেন ব্যোম বা আকাশ, যে অবস্থার স্বরূপ দেশে শুদ্ধব্যাপ্তি, কম্পন যাহার বিশেষগুণ বা ধর্ম্ম যাহা আমাদের নিকট শব্দ রূপে প্রকাশ হয়। কিন্তু শুধু আকাশের কম্পন হইতে রূপ সৃষ্টি সম্ভব নয়। তার জন্য চাই শক্তি সমুদ্রের প্রবাহে একটা বাধা, সঙ্কোচন এবং সম্প্রসারণ, বিচিত্র কম্পনের পরস্পর মিলন, শক্তির উপর শক্তির অভিঘাত, যাহার ফলে পরস্পরের মধ্যে একটা নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধের সূত্রপাত হইবে; তাই জড় শক্তি তাহার

আদিমরূপ আকাশকে রূপান্তরিত করিয়া দ্বিতীয় অবস্থা বা "ভূত" সৃষ্টি করিল, প্রাচীনেরা তাহার নাম দিলেন বায়ু যাহার বিশেষ ধর্ম্ম শক্তির সঙ্গে শক্তির স্পর্শ, যে স্পর্শ সকল জড় সম্বন্ধের ভিত্তিস্বরূপ, তথাপি যথার্থ রূপ সৃষ্টি হইল না, কেবল বহুবিচিত্র শক্তি দেখা দিল। আশ্রয় স্থান অধিকার করিতে পারে এমন একটা তত্ত্ব চাই। আদ্যাশক্তি তাই আবার রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া আলোক, বিদ্যুৎ, অগ্নি, তাপরূপে যাহার বিশিষ্ট প্রকাশ সেই তেজরূপ ধারণ করিল। এ অবস্থায় শক্তি বিশিষ্ট ধর্ম্মে বিশিষ্ট ক্রিয়ায় নানা আকারে প্রকাশ পাইলেও দেখা দিল না তেমন জড়রূপ যাহা স্থায়ী (stable)। তাই যাহার বিশেষ ধর্ম্ম শক্তিকে চারিদিকে প্রেরণ বা সঞ্চার, স্থায়ীভাবে আকর্ষণ বিকর্ষণের যাহা একটা প্রথম বাহন, যাহার নাম অপ্ (বা তরল অবস্থা) সেই চতুর্থ ভূত দেখা দিল। তাহারপর আসিল পঞ্চমভূত যাহার বিশেষ গুণ দৃঢ়সংসক্তি বা কাঠিন্য, ইহার নাম ক্ষিতি। এমন করিয়া প্রয়োজনীয় পঞ্চভূতের সৃষ্ট হইল।

স্থূল অথবা সূক্ষ্ম জড় পদার্থের যত রূপ আমরা জানি তাহার সমস্তই এই পঞ্চভূতের সমবায়ে গঠিত হইয়াছে। আমাদের ইন্দ্রিয়বোধও ইহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, কারণ কম্পনকে গ্রহণ করিয়া আমাদের মধ্যে শব্দ বোধ জাগিয়াছে ; শক্তি-কম্পনের জগতে সাক্ষাৎ সংস্পর্শ বা সংযোগ হইতে আসিয়াছে স্পর্শজ্ঞান ; আলোক, অগ্নি, বিদ্যুৎ এবং তাপের শক্তিতে বিধৃত, উন্মিষিত এবং সংগঠিত রূপের মধ্যে আলোকের ক্রিয়া হইতে আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় ফুটিয়া উঠিয়াছে, এমনি করিয়া চতুর্থ ভূত অপ্ হইতে রসনা এবং পঞ্চমভূত ক্ষিতি হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় আমরা লাভ করিয়াছি। মূলতঃ সকল ইন্দ্রিয় বোধই শক্তির সঙ্গে শক্তির সংস্পর্শ জাত কম্পনের প্রতিক্রিয়া। শুদ্ধশক্তি এবং তজ্জাত বস্তুনিচয়ের মধ্যে আপাতদৃষ্টে যে গুরুতর ভেদ দৃষ্ট হয়, প্রাচীনেরা তাহা এইভাবে দূর করিয়াছিলেন। সাধারণ মানুষের ইন্দ্রিয় বোধের নিকট জগতের যে বস্তুনিচয় নিরেট বাস্তব এবং স্থায়ী বোধ হয় তাহা যে কি করিয়া একটা ক্ষণস্থায়ী প্রতিভাসমাত্র হইতে পারে অথবা ইন্দ্রিয়বোধ যাহা ধরিতে পারে না, এমন কি যাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন নয় সেই এক শুদ্ধাশক্তি বিশ্বের স্থায়ী মূল সত্য কি করিয়া হইতে পারে তাহা সে বুঝিতে পারে না, সুতরাং অবিশ্বাসের চোখে দেখে। প্রাচীন দার্শনিকগণের পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিলে ইহা বুঝা সহজ হয়।

কিন্তু শক্তি-কম্পনের সংস্পর্শে যে ইন্দ্রিয়বোধ জাগে তাহা সচেতন—এই সচেতনতা কোথা হইতে আসিল তাহার উত্তর ইহাতে নাই। বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাহার স্বভাব সেই সাংখ্যদর্শন তাই পঞ্চভূতের উপর মহৎ এবং অহঙ্কার নামে আর দুইটি তত্ত্ব স্বীকার করিল, এ দুইটি তত্ত্ব বস্তুতঃ অজড়, কারণ প্রথমটি শক্তির বিশ্বরূপ ছাড়া আর কিছু নয় এবং অপরটী বিভাগকারী অহংবোধ। তথাপি এই দুইটি তত্ত্ব এবং তৎসঙ্গে বুদ্ধিতত্ত্ব সচেতনভাবে সক্রিয় হয় শক্তির অভিঘাতে নয়, পরন্তু এক বা বহু নিষ্ক্রিয় চৈতন্যময় পুরুষের সান্নিধ্য বশতঃ, যে পুরুষে শক্তির ক্রিয়া প্রতিফলিত হয় এবং সেই প্রতিফলনের ফলে চৈতন্যের বর্ণরাগ ফুটিয়া উঠে।

ভারতের যে দর্শন এ যুগের জড়বাদের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে পৌছিয়াছে, গভীর বিচারপরায়ণ ভারতীয় মনের পক্ষে প্রাকৃতিক শক্তিকে অচেতন যান্ত্রিক রূপে ধারণা করা যতদূর সম্ভব তাহা যাহাতে পাই, সেই দর্শনের বিশ্বরহস্য ব্যাখ্যা এইরূপ। ইহাতে যতই দোষ ও ত্রুটি থাকুক না কেন ইহার প্রধান চিন্তাধারা একরূপ অবিসংবাদিত, তাই সাধারণ ভাবে তাহা স্বীকৃত। চৈতন্যের প্রকাশের যে ব্যাখ্যাই দেওয়া হউক না কেন, প্রকৃতি জড় বা চৈতন্যময় তত্ত্ব যাহাই হউক না কেন, বস্তুতঃ সে শক্তিরূপিনী তাহাতে সন্দেহ নাই। সর্ব্ব-পদার্থের মূলে যে তত্ত্ব কাজ করিতেছ তাহা একটা রূপায়নী শক্তি; নিরাকার শক্তি সমূহের পরস্পর সংঘাত, মিলন ও সামঞ্জস্য হইতেই সকল রূপ সৃষ্টি হইয়াছে। এক শক্তির সঙ্গে অন্য শক্তির সংস্পর্শজনিত প্রতিক্রিয়া হইতে আমাদের ইন্দ্রিয়বোধ এবং কর্ম্মপ্রবৃত্তি জাগিয়াছে। যে জগৎকে আমরা অনুভব করিতেছি তাহা এইরূপ এবং এই অভিজ্ঞতা হইতেই আমাদের যাত্রারম্ভ করিতে হইবে।

জড়কে বিশ্লেষণ করিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও এই একই সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন, যদিও সন্দেহের কিছু কিছু চিহ্ন এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। বোধি ও অভিজ্ঞতা, দর্শন ও বিজ্ঞানের এই এক মতকেই সমর্থন করে। তাহার নিজের মূল ও স্বাভাবিক ধারণা ইহাতে সমর্থিত হইতেছে দেখিয়া শুদ্ধবুদ্ধিও ইহাতে তৃপ্তি লাভ করে। কারণ বিশ্বকে মূলতঃ এক চৈতন্যের লীলা বলিয়া যে মত বলে, তাহাকেও স্বীকার করিতে হয় যে লীলার মধ্যে ক্রিয়া এবং ক্রিয়ার মধ্যে শক্তির গতি ও স্পন্দন অনুস্যূত রহিয়াছে। ভিতর হইতে আমাদের

অভিজ্ঞতা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেও বিশ্বের ইহাই যে মূল প্রকৃতি তাহা বোধ হইবে। প্রাচীনেরা যে ত্রিশক্তির নাম দিয়াছেন জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি তাহাদের খেলাই আমাদের সকল প্রবৃত্তি ও কর্ম্ম। আবার ইহাও দেখা যায় যে বস্তুতঃ এই তিন শক্তি এক মূল আদ্যা শক্তিরই তিনটি ধারা। এমন কি আমাদের স্থিতি এবং কর্ম্মবিরতিও এই শক্তিরই সাম্যাবস্থা।

সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিকে শক্তির গতি ও স্পন্দ বলিয়া স্বীকার করিলে দুইটি প্রশ্ন উঠে। প্রথম প্রশ্ন সতের বুকে কিরূপে এই গতি দেখা দিল? যদি আমরা মনে করি গতি ও স্পন্দ শুধু শাশ্বত নহে, তাহাই সতের স্বরূপ বা গতিই সদ্রূপে প্রতিভাত হইতেছে তবে অবশ্য এ প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু আমরা সে মত গ্রহণ করি নাই। আমরা সতের এমন এক অবস্থার কথা বলিয়াছি যাহা গতির বাধ্য বা গতি দ্বারা পরিচালিত হয় না। তাহা হইলে কিরূপে, কি কারণে কোন সম্ভাবনার বশে বা কোন্ রহস্যের সংবেগে সেই শাশ্বত স্থিতির বিপরীত এই গতি বা স্পন্দ আসিল?

প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকগণের সর্ব্বাপেক্ষা অনুমোদিত সিদ্ধান্ত এই যে সতের মধ্যে শক্তি অনুস্যূত হইয়া আছে। শিব ও কালীতে, ব্রহ্ম ও শক্তিতে অভেদ সম্বন্ধ, তাঁহারা এক, দুই নহেন, অতএব তাহাদিগকে কখন পৃথক করা যায় না। সত্তাতে অবস্থিত শক্তির গতি ও স্থিতি এই দুই অবস্থা হইতে পারে, স্থিতির অবস্থাতেও শক্তি নিরাকৃত বা ঊনীকৃত হয় না অথবা তাহার মূলতঃ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না। এ উত্তর এত যুক্তিযুক্ত এবং বস্তুস্বভাবের অনুগত যে ইহা স্বীকার করিতে কোন দ্বিধার কারণ দেখি না শক্তি অনন্ত অদ্বয় সত্তার বিজাতীয় কিছু এবং বাহির হইতে সত্তার মধ্যে আসিয়াছে, অথবা পূর্ব্বে ছিল না পরে কোন বিশিষ্টক্ষণে তাহাতে আসিয়াছে এরূপ ধারণা যুক্তি বিরুদ্ধ অতএব অসম্ভব। এমন কি মায়াবাদীকেও স্বীকার কবিতে হইবে ব্রহ্মে আত্ম-বিভ্রমরূপিনী মায়াশক্তি তাহার শাশ্বত সত্তার মধ্যে শাশ্বত সম্ভাবনারূপে বর্ত্তমান আছে। সেখানে একমাত্র প্রশ্ন তাহার প্রকাশ এবং অপ্রকাশ লইয়া। সাংখ্য দর্শনও বলে ’যে প্রকৃতি এবং পুরুষ (বা চৈতন্যময় আত্মা) অনাদি কাল হইতে একত্রাবস্থিত এবং প্রকৃতির গুণসাম্যে স্থিতি এবং গুণ বৈষম্যে গতি—এই উভয় অবস্থা একের পর অন্য দেখা দেয়।

শক্তি যদি সত্তাতে সর্ব্বদা অনুস্যূত থাকে এবং শক্তির পক্ষে প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে ছড়াইয়া দেওয়া অর্থাৎ গতি এবং নিজের মধ্যে গুটাইয়া আনা অর্থাৎ স্থিতি যুগপৎ বা পর্য্যায় ক্রমে এ উভয় সম্ভাবনা যদি বিদ্যমান থাকে তবে কিরূপে গতি, তাহার সম্ভাবনা বা তাহার প্রথম প্রবেগ দেখা দিল এ প্রশ্ন উঠিতে পারে না। কারণ যাহা সম্ভাবনা রূপে রহিয়াছে তাহা কালের মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে গতি ও স্থিতির ছন্দে ফুটিয়া উঠিবে অথবা নির্ব্বিকার সতের বুকে আত্মসংহরণে সমাহিত থাকিয়াও সমুদ্র বক্ষে যেরূপ তরঙ্গের উত্থান ও লয় হয় তদ্রূপ ভাবে বাহিরের ক্ষেত্রে গতি পরিবর্ত্তন বা রূপায়ন রূপে দেখা দিবে একথা বুঝা সহজ। এই বাহিরের খেলা (অবশ্য আমরা এখানে যে উপমা দিয়া কথা বলিতেছি সমগ্র ভাবে বুঝিবার পক্ষে তাহা যথোচিত নহে) সতের মধ্যে শক্তির আত্মসংহরণের সঙ্গে অনাদিকাল হইতে নিত্য বর্ত্তমান থাকিতে পারে সুতরাং খেলাও নিত্য ঘটনা হইতে পারে; অথবা খেলার প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি কালের ক্ষেত্রে একটা স্থায়ী ছন্দদোলায় দেখা দিতে পারে। তখন তাহা প্রবাহরূপে নিত্য না হইলেও আবৃত্তি রূপে নিত্য হইবে।

কিরূপে শক্তি ক্রিয়াশীলা হয় সে প্রশ্ন চলিয়া গেলে কেন ক্রিয়াশীলা হয় এ প্রশ্ন উপস্থিত হয়। সতের শক্তি নিজের মধ্যে সংহৃত হইয়া সমস্ত বৈচিত্র্য এবং রূপবিবর্জ্জিত অবস্থায় থাকিল না কেন? শুদ্ধ-সৎ যদি অচেতন হয়, চৈতন্য যদি জড় শক্তিরই পরিণতি হয় এবং তাহাকে আমরা ভুল করিয়া অজড় মনে করি, ইহা যদি সত্য হয় তবে এ প্রশ্ন উঠে না। তখন শুধু এই বলিলেই চলে যে গতির ছন্দে দোলায়িত হওয়াই এ শক্তির স্বভাব, আপনা আপনি নিত্য বর্ত্তমান থাকাই যাহার স্বভাব তাহার সম্বন্ধে কেন, কি কারণে কোন আদিম উদ্দেশ্য বা শেষ লক্ষ্যের জন্য সে আছে এরূপ কোন প্রশ্নের আর অবকাশ বা প্রয়োজন থাকে না। শাশ্বত স্বয়ম্ভূ সতের সম্বন্ধে যেমন জিজ্ঞাসা করে চলে না কেন তাহা বর্ত্তমান আছে অথবা কিরূপে তাহার আবির্ভাব হইল, তেমনি যে শক্তির মূলে সেই শক্তি ছাড়া আর কিছু নাই সেই শক্তিকেও আমাদের জিজ্ঞাসা করা চলে না সে কোথা হইতে আসিল, অথবা যে গতি ও ক্রিয়ার সংবেগ তাহার প্রকৃতিতে অনুস্যূত রহিয়াছে

তাহার কারণ কি? কি ধারায় সে শক্তির আত্মপ্রকাশ হয়, তাহার গতি ও রূপায়নের রীতি কি অথবা তাহার পরিণতির পদ্ধতি কি ইহাই শুধু জানিতে চাহিতে পারি। স্থিতি ও গতি, সত্তা ও শক্তি উভয়ই যেখানে জড় উভয়েই যেখানে অচেতন ও অপ্রবুদ্ধ সেখানে উদ্দেশ্য, পরিণতির কোন লক্ষ্য বা কারণ বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না।

কিন্তু যদি সৎকে চিন্ময় সত্তা বলিয়া স্বীকার করি, তাহা হইলে কেন প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা হয় সে প্রশ্ন উঠে। অবশ্য আমরা এমন এক সচেতন পুরুষের কল্পনা করিতে পারি যিনি নিজ শক্তির বা প্রকৃতির অধীন, তদ্দ্বারা পরিচালিত হইতে বাধ্য, শক্তির প্রকাশ হওয়া বা না হওয়ার উপর তাহার কোন হাত নাই। এইরূপ এক ঈশ্বর বা বিশ্বপুরুষের কল্পনা আমরা মায়াবাদে এবং তান্ত্রিকগণের মধ্যে পাই, যিনি মায়া বা শক্তির অধীন, যে ঈশ্বর মাযাদ্বারা আচ্ছন্ন বা শক্তি দ্বারা শাসিত ও পরিচালিত। কিন্তু আমরা যে অনন্ত পরমার্থ সতের কথা লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিয়াছি তিনি তেমন ভাবের ঈশ্বর নহেন। ইহা স্বীকার করিতে হইবে বিশ্বে ব্রহ্ম নিজেই নিজেকে রূপায়িত করিতেছেন এবং তিনি ন্যায়তঃ মায়া বা শক্তির পূর্ব্ববর্ত্তী এবং তাহার ক্রিয়া বা খেলার নিবৃত্তি হইলে শক্তিকে তিনিই তাহার তুরীয় বা সর্ব্বাতীত সত্তায় বিলীন করেন। যেহেতু সে চিন্ময় সত্তাই পরম এবং চরম তত্ত্ব তাঁহার প্রকাশ বা রূপায়নের তিনি অধীন নহেন, তাহার ক্রিয়া বা গতিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত হন না, সুতরাং তাহার মধ্যে শক্তির প্রকাশের যে যোগ্যতা বা সম্ভাবনা আছে তাহাকে প্রকাশ হইতে দেওয়া বা না দেওয়ার স্বাধীনতা তাহার মধ্যে নিত্য বর্ত্তমান। যিনি শক্তির সচেতন আধার হইয়াও তাহার অধীন, যাহার মধ্যে থাকিয়া ক্রিয়াশীলা প্রকৃতি তাহার অপেক্ষা শক্তিশালিনী হইয়াছে, তাহাকে এক অনন্ত স্বাতন্ত্র্যশূন্য জড় বলা যাইতে পারে কিন্তু প্রকৃতিপরিচালিত তেমন ব্রহ্মকে ব্রহ্ম বলা যায় না। যদি বলি তাহার নিজ প্রকৃতিদ্বারা পরিচালিত হওয়া নিজের শক্তিরূপের কাছে নিজের অধীন হওয়া মাত্র, তাহাতে বিরোধ নিবৃত্তি হয় না, আমরা পূর্ব্বে যাহা মূল সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়াছি তাহাকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা হয় মাত্র। কারণ তখন সত্তাতে শক্তিমাত্র ছাড়া আর কিছু

থাকে না, স্থিতি ও গতি এই দুইরূপে শক্তিই আছে বলা হয়। হয়ত তাহা চরমশক্তি হইতে পারে কিন্তু চরম ও পরম সত্তা নহে।

তাহা হইলে ভাল ভাবে বুঝিতে হইবে শক্তির সঙ্গে চৈতন্যের সম্বন্ধ কি। কিন্তু চৈতন্য বলিতে আমরা কি বুঝি? নিদ্রা, মূর্চ্ছা বা অন্যকারণে মানুষের বাহ্য বোধ যখন লোপ পায় নাই সেই সময় মনের মধ্যে যে বোধ স্পষ্ট ভাবে জাগে তাহাকেই আমরা চৈতন্য বলি, যে অবস্থা দেহধারী মানুষের জীবনের অধিকাংশকাল জুড়িয়া বসিয়া আছে। অবশ্য এ অর্থে জড় জগতের মধ্যে চৈতন্যের না থাকাই সাধারণ নিয়ম, যখন থাকে তখন তাহা নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। আমাদের মধ্যেও এ চৈতন্যকে সর্ব্বদা দেখিতে পাই না। কিন্তু চৈতন্যের স্বরূপ সম্বন্ধে ইহা প্রাকৃত ও অগভীর ধারণা, যদিও আমাদের চিন্তা ও সংস্কার এই ধারণা দ্বারা এখনও অনুরঞ্জিত তথাপি দার্শনিক বিচার ও ভাবনায় এ ধারণা আমাদিগকে বর্জ্জন করিতে হইবে। কারণ আমরা জানি যখন আমরা নিদ্রিত বা মূর্চ্ছিত বা আঘাত কিম্বা ঔষধের দ্বারা সংজ্ঞাশূন্য অথবা যে অবস্থায় আমাদের দৈহিক সত্তা অচেতন অবস্থায় আছে বলিয়া বোধ হয় তখনও আমাদের মধ্যে এমন কিছু থাকে যাহা সচেতন। শুধু তাহা নহে, এদেশের প্রাচীন দার্শনিকগণ যে বলিয়াছেন যে আমাদের যে জাগ্রত অবস্থাকে আমরা চৈতন্য বলিয়া অভিহিত করি তাহা আমাদের সমগ্র চেতন সত্তার অতি সামান্য নির্ব্বাচিত অংশ মাত্র, এ কথা সত্য। জাগ্রত অবস্থা চেতনার বহিরাবরণ মাত্র, ইহা আমাদের মনশ্চেতনারও সবটুকু নয় আমাদের এই জাগ্রত চৈতন্যের পিছনে ইহা অপেক্ষা বহুগুণে বৃহত্তর অধিচেতনা বা অবচেতনার ভূমি আছে, যাহার উচ্চতা বা গভীরতা এখনও কোন মানুষ মাপিয়া উঠিতে পারে নাই। এই জ্ঞান লইয়া যাত্রারম্ভ করিলে আমরা শক্তি ও তাহার ক্রিয়ার সত্য বিজ্ঞান গড়িয়া তুলিতে পারি। ইহাই আমাদিগকে জড়ের সীমাবদ্ধ এবং সুস্পষ্টের মরীচিকা হইতে মুক্ত করিবে।

জড়বাদ অবশ্য বলিবে চৈতন্যের যতই প্রসার হউক না কেন ইহা জড় ব্যাপার, আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য, চৈতন্য ইন্দ্রিয়-গণকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ হয় ইহা সত্য নহে, পরন্তু চেতনা ইন্দ্রিয়েরই পরিণাম, কিন্তু জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ গোঁড়া মতবাদ ক্রমেই অচল

হইয়া পড়িতেছে। এ ব্যাখ্যা অধিক হইতে অধিকতর অপর্য্যাপ্ত এবং কষ্ট-কল্পিত প্রমাণ হইতেছে। স্পষ্টতর আমরা দেখিতেছি আমাদের সমগ্র চৈতন্যের সামর্থ্য আমাদের ইন্দ্রিয়, স্নায়ুজাল এবং মস্তিষ্ককে যে কেবল বহুগুণে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে তাহা নয় পরন্তু সাধারণ ক্ষেত্রেও আমাদের চিন্তা ও চৈতন্য এসমস্ত হইতে জাত হয় না বরং ইহাদিগকেই তাহারা যন্ত্ররূপে ব্যবহার করে। চৈতন্যের উর্দ্ধায়নের আকৃতি হইতে মস্তিষ্ক সৃষ্ট হইয়াছে এবং চৈতন্যই মস্তিষ্ক ব্যবহার করিতেছে, বিপরীত যে কথা অর্থাৎ মস্তিষ্ক হইতে চৈতন্য জাত হয় বা মস্তিষ্কই চৈতন্যকে ব্যবহার করে তাহা সত্য নহে। এমন কি এরূপ অতিপ্রাকৃত ঘটনার কথা জানা যায় যাহা দ্বারা প্রমাণ হয় যে চৈতন্য দেহযন্ত্রকে ব্যবহার না করিয়াও পারে, হৃৎস্পন্দন বা শ্বাসপ্রশ্বাস ছাড়াও বাঁচিয়া থাকা যায় এবং মস্তিষ্কের মধ্যে যে সমস্ত সুনিয়ন্ত্রিত স্নায়ু-কোষ আছে তাহাদের সাহায্য না লইয়াও চিন্তা করা যাইতে পারে। এন্জিনের (engine) পরিচালক বিদ্যুৎ বা বাষ্প যেমন সে যন্ত্রের গঠন-কৌশল হইতে জাত নহে অথবা তদ্দ্বারা ব্যাখ্যাত হইতে পারে না তদ্রূপ ভাবনা বা চেতনা শারীর যন্ত্র হইতে জাত হয় নাই, তদ্দ্বারা ব্যাখ্যাতও হইতে পারে না, শক্তিই পূর্ব্বগত, জড়যন্ত্র নহে।

ইহা হইতে যুক্তির অনুসরণে আমরা গুরুতর সব সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারি। প্রথমতঃ যেখানে আমরা সজীবতাব চিহ্ন দেখিতে পাই না, অসাড়-তাই দেখি সেখানে যদি মনশ্চেতনা থাকা সম্ভব হয় তাহা হইলে জড় পদার্থের মধ্যে এক সার্ব্বভৌম অবচেতন মন আছে যাহা উপযুক্ত ইন্দ্রিয়ের অভাবে ক্রিয়া বা বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিতেছে না ইহা কি সম্ভব হইতে পারে না? জড়ের মধ্যে চেতনা কি একেবারেই নাই? বরং ইহাই কি সত্য নয় যে তথায় চৈতন্য নিদ্রামগ্ন—পরিণতির দিক দিয়া এ নিদ্রা পূর্ব্বাপর জাগরণের মধ্যাবস্থা না হইয়া আদিম নিদ্রা বলিয়া বোধ হইলেও মানুষের মধ্যে আমরা যে নিদ্রা দেখিতে পাই তাহা চেতনার বিনাশ নহে কিন্তু বাহ্যবস্তুর সংস্পর্শে স্থূলভাবে সচেতন সাড়া না দিয়া সেখানে চৈতন্য নিজের মধ্যে গুটাইয়া আসিয়াছে। বিশ্বের মধ্যে যাহা কিছু বহির্জগতের সহিত প্রকাশ্য যোগ স্থাপনের উপায় গড়িয়া তুলিতে পারে নাই তাহাতে চৈতন্য এই সুপ্তিদশাপ্রাপ্ত—

ইহাই কি হইতে পারে না? যাহা নিদ্রামগ্ন আছে তাহার মধ্যেও এক চিন্ময় পুরুষ সদা জাগ্রত আছেন ইহাই কি প্রকৃত সত্য নহে?

আমরা আরও অগ্রসর হইতে পারি। আমরা যাহাকে অবচেতনা বলি তাহা আমাদের বাহ্য মনশ্চেতনা হইতে স্বরূপতঃ পৃথক কিছু নয়, তবে তাহা জাগ্রত চেতনার নিম্নে থাকিয়া তাহার অজ্ঞাতে কাজ করে, যদিও হয়ত তাহার ব্যাপ্তি ও গভীরতা আরও বেশী। কিন্তু অধিচেতনা এ সমস্তের সীমা বহুগুণে অতিক্রম করিয়া যায়। কেবল যে তাহার উৎকর্ষ ও সামর্থ্য অনেক বেশী তাহা নয়। পরন্তু আমরা মনশ্চেতনা বলিয়া যে জাগ্রত অবস্থাকে জানি তাহা হইতে এ চেতনা অন্যরূপ। সুতরাং একথা বলা যাইতে পারে যে আমাদের মধ্যে যেমন অবচেতনা আছে তেমনি অতিচেতনাও আছে অথবা সচেতন বৃত্তি সমূহের একটা পর্য্যায় বা পরম্পরা আছে, এবং চৈতন্যের এমন একটা স্তর আছে যাহা আমরা যাহাকে মন বলি তাহার অনেক উর্দ্ধে অবস্থিত। আমাদের অধিচেতন-গত সত্তা মনের উপর উঠিয়া অতিচেতনায় পৌছিতে পারে, তেমনি তাহা মনের নীচে অবস্থিত অবচেতনার মধ্যেও কি ডুব দিতে পারে না? জগতে এবং আমাদের মধ্যে অবমানস বা মন অপেক্ষা তেমন নিম্নতর ভূমি কি নাই, যাহাকে প্রাণচেতনা এবং দেহচেতনা বলিতে পারি? যদি তাহা হয় তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে উদ্ভিদ ও ধাতুর মধ্যে এমন শক্তি আছে যাহার নাম চেতনা দেওয়া যাইতে পারে, যদিও তাহা পশু ও মানুষের মধ্যে যে চেতনা দেখিতে পাই এবং যাহাকে মাত্র আমরা চেতনা বলিয়া অভিহিত করিতে অভ্যস্ত, সেরূপ চেতনা নহে।

বস্তুতঃ ইহা শুধু সম্ভব নহে, নিরপেক্ষ ভাবে দেখিলে দেখিতে পাইব যে ইহা নিশ্চিত। আমাদের মধ্যে যে এইরূপ এক প্রাণচেতনা আছে তাহা শরীর মধ্যস্থ কোষগুলির (cells) ক্রিয়াতেও দেখা যায়। আমাদের মধ্যে যে সমস্ত স্বয়ংক্রিয় দৈহিক যন্ত্র (যেমন হৃদযন্ত্র বা পরিপাকযন্ত্র) আছে যেখানে মনের অগোচরে উদ্দেশ্যমূলক ভাবের ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তথায় দেখা যায় যে কোন বস্তুকে দেহযন্ত্র আত্মসাৎ করিয়া লইতেছে, কোন বস্তুকে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেছে সেখানে আমরা এই প্রাণচেতনাকে লক্ষ্য করিতে পারি। পশুর মধ্যে এ চেতনার প্রভাব আরও বেশী। উদ্ভিদ জগতেও ইহা দেখা যায় বোধি দ্বারা।

যাহার সত্য একজন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক খাঁটি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আমাদিগকে দেখাইয়াছেন,—উদ্ভিদ জগতের সেই সমস্ত আকুঞ্চন ও প্রসারণ, সুখ ও দুঃখ, নিদ্রা এবং জাগরণ এবং প্রাণস্পন্দনের আরও অনেক বিচিত্র রহস্যের মূলে চেতনা রহিয়াছে যদিও আমরা যতদূর দেখিতে পাই তাহা মানস চেতনা নহে। তাহা হইলে মনের নীচে প্রাণ চেতনার পরিচয় পাওয়া গেল যেখানে প্রতিক্রিয়া যেন ঠিক মনেরই মত অথচ একদিকে যেমন অতিচেতনা অন্য দিকে তেমনি প্রাণচেতনা এ উভয়ের অভিজ্ঞতা, গঠন বা প্রকাশধারা, মানস চেতনা হইতে ভিন্ন।

উদ্ভিদ জগতে পশুর প্রাণলীলার নিম্নতর অভিব্যক্তিতে আমরা যাহাকে চৈতন্য বলিতেছি তাহা ত দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু উদ্ভিদেই কি উহা শেষ হইয়া গিয়াছে? যদি তাই হয়, তবে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয়, জড় হইতে বিজাতীয় কোন শক্তি, প্রাণ ও চৈতন্যরূপে জগতে প্রবিষ্ট হইয়া জড়কে অধিকার করিয়াছে—হয় ত বা অন্য কোন জগৎ* হইতে আসিয়া। নৈলে জড়ের মধ্যে ইহারা কোথা হইতে আসিল? প্রাচীনেরা এরূপ অন্য জগতের অস্তিত্বের কথা বিশ্বাস করিতেন, যাহা হয়ত এজগতে প্রাণ ও চেতনাকে ধারণ করিয়া আছে, এমন কি হয়ত নিজের চাপে ইহাদিগকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে, কিন্তু এখানে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া প্রাণ ও চেতনাকে সৃষ্টি করিয়াছে ইহা সত্য হইতে পারে না, কারণ জড়ের মধ্যে যাহা সংবৃত হইয়া নাই, জড় হইতে তাহার বিবৃতি বা প্রকাশ কখনও সম্ভব হইতে পারে না।

কিন্তু আমরা যাহাকে নিছক জড় বলিয়া মনে করি সেখানে আসিয়া প্রাণ ও চেতনার ধারা হঠাৎ থামিয়া গিয়াছে এরূপ মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও চিন্তা অধুনা যে স্তরে আসিয়াছে তাহাতে যেন মনে হয় যে ধাতু ও মৃত্তিকা প্রভৃতি নিষ্প্রাণ পদার্থের মধ্যেও প্রাণের অস্পষ্ট আরম্ভ এবং হয়ত চেতনার এক প্রকার নিস্পন্দ ও নিরুদ্ধ আভাস দেখা যাইতেছে,

* একটা অদ্ভুত মতবাদ অধুনা প্রচলিত হইয়াছে যে লোকান্তর হইতে নয় পরন্তু গ্রহান্তর হইতে প্রাণ এ পৃথিবীতে আসিয়াছে। চিন্তাশীল দার্শনিকের নিকট ইহা কোন মীমাংসা নহে। আসল প্রশ্ন এই আদৌ জড়ের মধ্যে প্রাণ কি করিয়া আসিল? প্রশ্ন এই নয় যে কোন বিশেষ গ্রহে ইহা সঞ্চারিত হইল কি করিয়া।

অথবা অন্ততঃপক্ষে যাহা আমাদের মধ্যে চৈতন্যরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহার মূল উপাদান যেন সেখানে আছে। তফাৎ এই যে যাহাকে প্রাণ চেতনা বলিয়াছি তাহা উদ্ভিদের মধ্যে অস্পষ্ট ভাবে দেখিতে ও বুঝিতে পারি কিন্তু জড়ের মধ্যে চৈতন্য নিস্পন্দ অবস্থায় থাকাতে তাহা বুঝা বা কল্পনা করা বস্তুতই কঠিন। আর আমরা মনে করি যাহা বুঝা বা কল্পনা করা শক্ত তাহা অস্বীকার করিবার অধিকার আমাদের আছে। তথাপি যে চেতনাকে আমরা অনুসরণ করিয়া উদ্ভিদ জগতের এমন গহনে পৌঁছিয়াছি সেখানেই উহা শেষ হইয়া গিয়া প্রকৃতিতে হঠাৎ একটা ফাঁক পড়িয়াছে, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। বিশ্বব্যাপারের অন্য সকল ঘটনার মধ্যে যদি একটা ধারাকে দেখিতে পাই ও স্বীকার করি, এবং শুধু এক ক্ষেত্রে যদি তাহার চিহ্ন অপরের তুলনায় বেশী আবৃত বা গোপন থাকে ইহা দেখা যায় তবে সেখানেও সে ধারা ছেদ হয় নাই ইহা দাবি করিবার অধিকার আমাদের বুদ্ধি ও বিচার শক্তির আছে। এবং যদি মনে করি সেরূপ ভাবের ধারা ছেদ হয় নাই তবে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছি যে জগতে যত প্রকার শক্তির ক্রিয়া আছে তাহার সর্ব্বত্রই চৈতন্য বিদ্যমান আছে। তাহা হইলে সকল শক্তি বা রূপের মধ্যে চেতন বা অতিচেতন কোন পুরুষ যদি বাস নাও করেন তবুও সকলের মধ্যে যে এক চেতন শক্তি আছে যাহা দ্বারা তাহাদের বহিরঙ্গ অংশসকলও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় ইহা স্বীকার করিতে হয়।

এইভাবে দেখিতে গেলে চৈতন্য শব্দের সাধারণ অর্থ আমাদের বদলাইয়া লইতে হয়। তখন ইহা আর মনশ্চেতনার সমার্থবাচক থাকে না, কিন্তু সতের জ্ঞানময়ী শক্তি হইয়া দাঁড়ায়, মনশ্চেতনা তখন তাহার মধ্য পর্ব্ব মাত্র। মনশ্চেতনার নীচে নামিয়া ইহাই জীবন ও জড়ের ক্রিয়া ও গতিতে পরিণত হয় তখন আমরা তাহাকে অবচেতনা বলি। আবার ইহাই উর্দ্ধে উঠিয়া অতিমানস হইয়া দাঁড়ায় যাহা আমাদের কাছে অতিচেতন। কিন্তু এ সকল অবস্থায় একই চৈতন্য নানা রূপ ধারণ করিয়াছে মাত্র। চিতের ভারতীয় ধারণা ইহাই এবং ইহাই শক্তিরূপে জগৎ সকল সৃষ্টি করিয়াছে। মূলতঃ ইহা সেই অদ্বয় তত্ত্ব যাহার কথা জড় বিজ্ঞান অন্যদিক হইতে দেখিয়া বলিয়াছে—মন ও জড় পৃথক শক্তি নয়, পরন্তু মন জড় হইতে আসিয়াছে বা তাহার পরিণতি।

গভীরতম অনুভূতি হইতেই ভারতীয় চিন্তাধারা বলিয়াছে যে জড় ও মন এ উভয়ই সৎস্বরূপের এক চেতন শক্তির বিভিন্নরূপ বা বিভিন্ন পর্ব্ব মাত্র।

কিন্তু তবু প্রশ্ন উঠিবে যে এইভাবে যে শক্তির কথা বলা হইল তাহা যে সচেতন একথা বলার কি অধিকার আছে? চেতনা থাকিলেই তাহা আমাদের মানসিক জ্ঞানের যে আকারে দেখিতে আমরা অভ্যস্ত সে ভাবের না হইলেও, কতকটা বুদ্ধি কতকটা অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য মূলক প্রবৃত্তি কতকটা আত্ম জ্ঞান তাহাতে থাকিবে ইহা বুঝা যায়। কিন্তু এদিক দিয়াও দেখিলেও সার্ব্বভৌম সচেতন শক্তির খণ্ডন অপেক্ষা সমর্থনের কারণই আমরা বেশী দেখিতে পাইব। উদাহরণ স্বরূপ আমরা পশুর মধ্যে পূর্ণভাবে উদ্দেশ্যমূলক প্রবৃত্তি এবং বৈজ্ঞানিকের মত অতি সূক্ষ্ম জ্ঞানের পরিচয় পাই, যাহা সেই পশুর মানসিক সামর্থ্যের অনেক উপরে এবং যাহা লাভ করিতে মানুষের পক্ষেও দীর্ঘকালব্যাপী শিক্ষা ও সাধনার প্রয়োজন হয়, এমন কি সে শক্তি লাভ হইলেও পশুর মত অভ্রান্ত ক্ষিপ্রতার সহিত তাহা ব্যবহার করিতে মানুষ পারে না। এইরূপ সাধারণ ব্যাপার হইতে প্রমাণিত হয় যে পশু ও কীটের মধ্যে এমন এক চিৎশক্তির ক্রিয়া চলিতেছে যাহা এযাবৎ পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে যে উচ্চতম মনঃশক্তির বিকাশ হইয়াছে তাহা হইতে অধিক বুদ্ধির পরিচয় দেয়, যাহা স্বীয় অভিপ্রায় ও লক্ষ্য, তাহাতে পৌঁছাইবার উপায় এবং তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা সকল সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান সম্পন্ন। তেমনি জড় প্রকৃতিরও সকল ব্যাপারে প্রচ্ছন্ন এক পরাবুদ্ধির খেলা দেখা যায়, যে বুদ্ধি নিজের ক্রিয়া প্রণালীর মধ্যে গুপ্ত হইয়া আছে "স্বগুণৈর্নিগূঢ়া"।

জগতে এই উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়া, বুদ্ধির খেলা, নির্ব্বাচন করিবার শক্তি, খুঁজিয়া দেখা এবং নিজেকে নূতন অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিবার ক্ষমতা প্রভৃতি ইহাদের মূলে অবস্থিত সচেতন শক্তির পরিচয় দেয় বটে কিন্তু তাহার সচেতনতার বিরুদ্ধে এক যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে; প্রকৃতির ক্রিয়ার মধ্যে বহুল পরিমাণে আমরা যাহাকে অপচয় বলি তাহা দেখিতে পাই, শক্তি সচেতন হইলে এ অপচয় কেন? কিন্তু এ আপত্তি মানুষের বুদ্ধির সঙ্কীর্ণতা হইতে জাত। নিজ প্রয়োজনের সঙ্কীর্ণ-সীমার মধ্যে কার্য্যকরী তাহার নিজের বিশিষ্ট বিচার বুদ্ধি সে বিশ্বশক্তির ক্রিয়ার উপরেও আরোপ করিতে চায়; আমরা প্রকৃতির

উদ্দেশ্যের অংশ মাত্র দেখিতে পাই এবং সেই অংশের সঙ্গে যাহা মিলে না তাহাকেই অপচয় বলি। মানুষের কাজের মধ্যেও যাহা অপচয় বলিয়া মনে হয় তাহা প্রভূত পরিমাণে রহিয়াছে দেখিতে পাই, অবশ্য সে সমস্ত তাহার ব্যক্তিগত দিক হইতে দেখিলে অপচয় বলিয়া মনে হইলেও বৃহত্তর এবং সার্ব্বজনীন ক্ষেত্রে তাহাদের যথেষ্ট মূল্য আছে এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হইতে পারি। প্রকৃতির উদ্দেশ্যের যে দিকটা আমরা ধরিতে পারি সেখানে দেখা যায় যে অপচয় সত্ত্বেও অথবা বস্তুতঃ আপাত-প্রতীয়মান অপচয়ের সাহায্যেই প্রকৃতি তাহার কার্য্য নিপুণভাবেই সিদ্ধ করিতেছে। যে দিকটা আমরা এখনও ধরিতে পারি নাই সেই অবশিষ্ট অংশের জন্য প্রকৃতিকে পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পারি।

অপচয়ের কথা বাদ দিলে পশু উদ্ভিদ এবং জড়ে চৈতন্যসূচক বিশ্বশক্তির নানা ক্রিয়ার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট না হইয়া পারে না। এ সমস্ত ক্ষেত্রে প্রকৃতিতে নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যের বা যাহাকে অন্ধ প্রবণতা বলিয়া মনে হয় সেই দিকে অগ্রসর হইবার সংবেগ এবং নিপুণ পরিচালনা এবং শীঘ্র বা বিলম্বে লক্ষ্যে আসিয়া পৌছান সর্ব্বদাই দেখা যায়। যতদিন পর্য্যন্ত জড় বৈজ্ঞানিক মনের আদ্যন্ত ব্যাপিয়া অবস্থিত ছিল ততদিন পর্য্যন্ত বুদ্ধি হইতেই বুদ্ধি জাত হইয়াছে ইহা অস্বীকার করিবার যে প্রবৃত্তি ছিল তাহার কারণ বুঝা যায়। কিন্তু বর্ত্তমানে যদি কেহ মনে করে মানুষের চৈতন্য বুদ্ধি বা প্রভূত্বের শক্তি যাহার মধ্যে চৈতন্য কোনরূপেই বর্ত্তমান ছিল না সেইরূপ অপ্রবুদ্ধ অচেতন জড়ের এক অন্ধ প্রবেগ হইতে আসিয়াছে তবে তাহা অতীত যুগের এক হেঁয়ালির মতই বোধ হয়। মানুষের চেতনা প্রকৃতির চেতনার একরূপ ছাড়া অন্য কিছু হইতে পারে না। চৈতন্য অন্যরূপের আড়ালে মনের নীচে সংবৃত হইয়া ছিল, এখন মনরূপে প্রকাশ হইয়াছে, মনের উপরে দিব্যতর রূপায়নের ক্ষেত্রে তাহা উন্নীত হইবে। কারণ যে শক্তি বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছে তাহা চিন্ময়ী, ইহার মধ্যে যে সৎ-স্বরূপের আত্ম-প্রকাশ হইতেছে তিনি চিন্ময় পুরুষ। এ-রূপের জগতে তাহার মধ্যে যাহা সম্ভাবনা রূপে রহিয়াছে তাহার প্রকাশ হওয়াই এ সৃষ্টির একমাত্র তাৎপর্য্য, কেবল ইহাই যুক্তি-সম্মত ধারণা বলিয়া বুদ্ধিকে স্বীকার করিতে হয়।

একাদশ অধ্যায়

আনন্দ ব্রহ্ম—সমস্যা

কেই বা বাঁচিতে বা নিঃশ্বাস নিতে পারিত যদি এই আনন্দ আকাশ হইয়া আমাদিগকে ঘিরিয়া না থাকিত ?

তৈত্তিরীয় উপনিষদ (২।৭)

আনন্দ হইতে সর্ব্বভূত জন্মিয়াছে, আনন্দেই বাঁচিয়া আছে এবং পরিণতি লাভ করিতেছে এবং আনন্দেই তাহারা ফিরিয়া যাইবে।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ (৩।৬)

কিন্তু, সৎস্বরূপ ব্রহ্মই বিশ্বের আদি ও অন্ত, তাহার মধ্যেই সর্ব্বপদার্থ অবস্থিত এবং সেই ব্রহ্মের সত্তা হইতে যাহাকে পৃথক করা যায় না এমন এক আত্ম-সংবিৎ তাহাতে অনুস্যূত থাকিয়া নিজের মধ্য হইতে যে চিন্ময়ীশক্তি বিকীর্ণ করিতেছে তাহা হইতে শক্তির বহুরূপ ও জগতের নানা বৈচিত্র্য সৃষ্টি হইতেছে, একথা স্বীকার করিলেও, এ প্রশ্নের উত্তর এখনও পাই নাই "যাহার কোন প্রয়োজন কোন কামনা নাই, পূর্ণ, অনন্ত, চরমতত্ত্ব স্বরূপ, সেই ব্রহ্ম আদৌ কেন তাহার চিৎ শক্তিকে এরূপে বিকীর্ণ করিয়া তাহার নিজের মধ্যে এরূপ জগৎ সমূহ সৃষ্টি করিলেন ?" তাহার নিজ প্রকৃতির শক্তি দ্বারা বা তাহার নিজের মধ্যে গতি ও রূপ গ্রহণের যে সম্ভাবনা ছিল তাহা দ্বারা পরিচালিত হইয়া ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইয়াছেন এ সমাধান আমরা গ্রহণ করি নাই। সম্ভাবনা যে আছে তাহা সত্য কিন্তু ব্রহ্ম তাহা দ্বারা সীমিত, বদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত হন না, তিনি নিত্য মুক্ত। গতি বা নিত্যস্থিতিতে অবস্থান, রূপের মধ্যে নিজেকে রূপায়ন অথবা রূপের সম্ভাবনাকে নিজের মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবার শক্তি যদি তাহাতে থাকে, তাহা হইলে গতি ও স্পন্দ বা এইরূপ সৃষ্টির একমাত্র কারণ হইতে পারে তাহার আনন্দ।

অনাদি শাশ্বত এই চরম সত্তা বৈদান্তিকেরা যে কেবলমাত্র সত্তারূপে অথবা যাহার চৈতন্য স্থূলশক্তির আকার ধারণ করে এমন এক চিন্ময় তত্ত্ব রূপে মাত্র যে দেখিয়াছেন তাহা নহে, পরন্তু তাহারা ইহাকে এমন চিন্ময় সত্তারূপে অনুভব করিয়াছেন আনন্দই যে সত্তা ও চৈতন্যের স্বরূপ। যেমন সে পরম তত্ত্ব অসৎ বা কেবল শূন্য অথবা নিশ্চেতনার অন্ধ রাত্রি নহে, যেমন তাহাতে শক্তির কোন কুণ্ঠা বা ন্যূনতা নাই—কেননা, তাহা হইলে তাহাকে পরম তত্ত্ব বলা যায় না—তেমনি তাহাতে আনন্দের অভাব অথবা দুঃখ থাকিতে পারে না। পরম চিন্ময় সত্তা অনন্ত অপরিসীম আনন্দময়, চিন্ময় সত্তা এবং আনন্দ একই তত্ত্বের দুই প্রকার বাক্যে প্রকাশ পদ্ধতি মাত্র; অসীমতা, আনন্ত্য, চরমতত্ত্ব শুদ্ধানন্দময়। এমন কি আমাদের প্রাকৃত মানবজীবনের অভিজ্ঞতায়ও দেখিতে পাই যে যেখানেই সীমা, সঙ্কোচ বা বাধা সেইখানেই অতৃপ্তি বা নিরানন্দ—যাহা অবরুদ্ধ আছে তাহা মুক্ত করিযা, সীমাকে অতিক্রম করিয়া, বাধাকে জয় করিয়াই আমাদের তৃপ্তি। ইহার কারণ আমাদেব আদি বা স্বরূপ সত্তায় আমরা অপরিসীম ও অনন্ত আত্মসংবিৎ বা আত্মশক্তির পূর্ণ অধিকারী এবং সে অবস্থা লাভের অন্য নাম আত্মানন্দে বিভোর হওয়া। তাই ব্যবহারিক জীবনের মধ্যেও যখন বা যতটুকু আত্মজ্ঞানের সংস্পর্শ বা আভাস পাই তখন বা ততটা পাই তৃপ্তির সন্ধান বা আনন্দের সংস্পর্শ।

ব্রহ্মের এই আত্মানন্দ তাহার নির্ব্বিশেষ নিশ্চল আত্মসত্তার মধ্যে আবদ্ধ নহে। যেমন তাহার শক্তির অনন্তরূপ ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ফুটিয়া উঠিবার সামর্থ্য আছে, তেমনি তাহার আত্মানন্দও অনন্ত জগতের মধ্যে অনন্ত গতি অনন্ত পরিবর্ত্তন অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া অনন্ত সমুল্লাসরূপে প্রকাশিত হইতে পারে। বিশ্বব্যাপিনী সৃষ্টিলীলার উদ্দেশ্য আত্মানন্দের এই অনন্ত গতি ও বৈচিত্র্যের প্রকাশ ও সম্ভোগ।

অন্য ভাষায় বলা চলে সে সচ্চিদানন্দ এক অখণ্ডত্রয়ী যাহার চৈতন্যে স্বভাবতঃ অনন্ত-বৈচিত্র্য-পূর্ণ রূপ ও সৃষ্টির বা আত্মরূপায়নের অনন্ত সামর্থ্য এবং এবং সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে আনন্দরূপে অনন্তভাবে ভোগ করিবার সামর্থ্য যুগপৎ বর্ত্তমান আছে। বিশ্বে যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তই তাহার সত্তায় সত্তাবান, তাহার চৈতন্যে ও শক্তিতে চিন্ময় ও শক্তিময় এবং তাহার আনন্দে

আনন্দময়। যেমন আমরা দেখিয়াছি যে বিশ্বের সমস্ত পরিবর্ত্তনশীল রূপবৈচিত্র্য এক অরূপ ও অপরিবর্ত্তনীয় সত্তার বা এক অনন্ত শক্তির সান্তরূপে আত্মরূপায়ন তেমনি আমরা দেখিতে পাইব যে সর্ব্ব পদার্থ নানা বিচিত্ররূপ, সর্ব্বগত একরস এক আত্মানন্দেরই আত্মপ্রকাশ। যেমন যাহা কিছু আছে তাহাতে চেতন-সত্তার অধিষ্ঠান রহিয়াছে এবং সেই সত্তা আছে বলিয়াই তাহা আছে, তদ্রূপ যাহা কিছু আছে তাহাতে সত্তার আনন্দ অধিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং সেই অধিষ্ঠানের ফলেই তাহা বর্ত্তমান আছে।

বিশ্ব সৃষ্টির মূল সম্বন্ধে বৈদান্তিকের এই মতবাদের কথা বলিতে গেলেই ইহার বিরুদ্ধে হৃদয়ানুভব এবং ইন্দ্রিয়স্পর্শে যে বেদনা (pain) দেখা দেয় এবং নৈতিক ক্ষেত্রে অনর্থ, অধর্ম্ম বা পাপ (evil) বলিয়া যাহা অভিহিত করা হয় এই দুইটী প্রবল প্রতিপক্ষের কথা মানুষের মনে জাগিয়া উঠে। জগৎকে সচ্চিদানন্দের অভিব্যক্তি বলা হইয়াছে, ইহা শুধু সচ্চিতের বা চিন্ময় সত্তার অভিব্যক্তি হয়ত সহজে স্বীকার করা যাইত কিন্তু যখন বলা হয় যে ইহা অনন্ত আত্মানন্দময় সত্তারও অভিব্যক্তি তখন শোক, ব্যথা, দুঃখ কিরূপে আসিল? এই জগৎকে আনন্দ নিকেতন রূপে ত আমরা দেখিতেছি না বরং মনে হইতেছে যে ইহা একান্ত দুঃখময়। কিন্তু বস্তুতঃ জগৎ যে দুঃখালয় ইহা অতিশয়োক্তি, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর দোষে আমরা এরূপ দেখি। যদি আমরা হৃদয়াবেগ দ্বারা চালিত না হইয়া নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া দেখি তবে ব্যক্তিগত জীবনে কোথাও ব্যতিক্রম বলিয়া বোধ হইলেও, মানবজীবনে সুখের সমষ্টি দুঃখের সমষ্টি অপেক্ষা অনেক বেশী দেখা যাইবে—বুঝিব যে সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় ভাবে, জীবনের বহির্ভাগে অথবা অন্তরে বাঁচিয়া থাকিবার একটা আনন্দ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। সাময়িক বিপর্য্যয়রূপে দুঃখ কখন কখন তাহাকে অভিভূত করে বা ঢাকিয়া রাখে মাত্র। দুঃখের পরিমাণ অল্প হইলেও সুখের বৃহত্তর পরিমাণ অপেক্ষা তাহা আমাদের নিকট তীব্রতর মনে হয়, কারণ সুখ স্বাভাবিক বলিয়াই আমরা তাহা মনে রাখি না, এমন কি তাহা লক্ষ্যই করি না, কেবল যখন তাহা উল্লাসের বা হর্ষের একটা ঢেউরূপে আসিয়া আমাদিগকে উদ্বোধিত করে তখনই আমরা তাহাকে সুখ নামে অভিহিত করি এবং তাহা পাইতে চাই; যে স্বাভাবিক পরিতৃপ্তি কোন ঘটনা বা বিশেষ কোন

কারণে জাত নয় অথচ যাহা সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছে তাহাকে আমরা সুখ বা দুঃখ কোন নাম দিই না, তাহাকে একটা নিরপেক্ষ অবস্থা মাত্র ভাবি। কিন্তু ইহা আমাদের ব্যবহারিক জীবনে একটা মূল্যবান পদার্থ, কারণ ইহা না থাকিলে বাঁচিয়া থাকিবার বা আত্মরক্ষার এমন সার্ব্বজনীন প্রবল সহজাত সংস্কার থাকিত না; স্বাভাবিক বলিয়া, উহা চাহিতে হয় না বলিয়া প্রকৃত সুখ দুঃখের লাভ ক্ষতির হিসাবের খাতায় উহাকে আমরা জমা করি না; সে খাতায় আমরা লাভের ঘরে শুধু তীব্র সুখের এবং ক্ষতির ঘরে অস্বস্তি ও দুঃখের সমস্ত অঙ্ক বসাই। আমাদের সত্তার পক্ষে স্বাভাবিক নয় এবং স্বাভাবিক ভাবে আমরা যাহা চাই তাহার বিরোধী মনে করি বলিযাই দুঃখ আমাদের নিকট এত তীব্র হইয়া উঠে। মনে হয় ইহা যেন আমাদের সত্তার অবমাননা, আমরা যাহা আছি বা যাহা হইতে চাই তাহার উপর যেন ইহা একটা বহিরাক্রমণ একটা অত্যাচার।

কিন্তু তথাপি দুঃখ অস্বাভাবিক হউক বা তাহার পরিমাণে যতই ইতর বিশেষ থাকুক, তাহাতে যে দার্শনিক সমস্যা উঠিয়াছে তাহার মীমাংসা হয় না। কম বেশী হউক, দুঃখ আসাটাই সমস্যা। সকলই যদি সচ্চিদানন্দ হয়, তবে দুঃখ ও ব্যথার অস্তিত্ব সম্ভব হইল কি করিয়া? এইত আসল সমস্যা, ইহার সহিত ঈশ্বর প্রাকৃত জগতের বাহিরে অবস্থিত বিশেষ ব্যক্তিপুরুষ (extra-cosmic personal God) এই মিথ্যা ধারণার যোগ করিয়া দেওয়াতে একটী নৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে প্রকৃত সমস্যা আরও ঘনীভূত হইয়াছে।

এই ভাবে তর্ক করা যায় 'সচ্চিদানন্দ, ঈশ্বর বা চিন্ময় পুরুষই ত জগৎস্রষ্টা। তিনি যে জগতে জীবকে এত দুর্গতি ভোগ করাইতেছেন, যেখানে দুঃখ এবং অনর্থকে (evil) স্থান দিয়াছেন, এমন জগৎ গড়িলেন কি করিয়া? ঈশ্বর সর্ব্বমঙ্গলময় হইলে দুঃখ এবং অনর্থ কে সৃষ্টি করিল? দুঃখ জীবকে পরীক্ষা করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে বলিলে নৈতিক বা ধর্ম্মের সমস্যা মিটে না। কারণ তাহা হইলে বলিতে হয় ঈশ্বর হয় অনৈতিক অধার্ম্মিক, নয় তাহার মধ্যে ধর্ম্মবোধ জাগে নাই, হয়ত জগৎ গড়িবার পক্ষে নিপুণ কারিগর অথবা চতুর মনস্তত্ত্ববিদ হইতে পারেন, কিন্তু যে প্রেম ও মঙ্গলময়কে আমরা ঈশ্বররূপে পূজা করিতে

পারি তাহা নহেন। কেবল শক্তিশালী বলিয়া হয় বাধ্য হইয়া, না হয় তাহার খেয়ালকে খুশি রাখিতে তাহার বিধান মানিয়া চলি। কারণ পরীক্ষা করিবার জন্য যে পীড়ন ও দুঃখ দিবার কৌশল বাহির করিয়াছে তাহাকে হয় স্বেচ্ছায় নিষ্ঠুর হইয়াছেন স্বীকার করিয়া অথবা ধর্ম্মাধর্ম্মবোধ নাই বলিয়া দোষী সাব্যস্ত করিতে হয়। অথবা যদি ধর্ম্মবোধ কিছু থাকেও, তবে তাহা তাহার সৃষ্ট জীবের উচ্চতম স্বাভাবিক ধর্ম্মবোধ অপেক্ষা হীনতর। ধর্ম্মবোধের এ সমস্যা এড়াইতে গিয়া যদি বলি অধর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফল এবং স্বাভাবিক শাস্তিরূপে দুঃখ আসিয়াছে তাহাতেও জীবনের সকল ব্যাপারের সঙ্গত অর্থ মিলে না। ব্যাখ্যার জন্য যে মতে পূর্ব্বজন্মে অন্যদেহে যে পাপ করিয়াছে তাহার জন্য এ জীবনে জীব দুঃখ পাইতেছে সেই জন্মান্তর এবং কর্ম্মফল বাদ স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু তাহাতেও ধর্ম্মবোধের মূল সমস্যা থাকিয়া যায়; এই যে অধর্ম্ম যাহার ফলে জীবকে দুঃখ তাপ ভোগ করিতে হয় তাহা কে, কোথা হইতে, কেন সৃষ্টি করিল সে প্রশ্ন রহিয়া যায়। দেখিতে পাইতেছি যে অধর্ম্ম বা অনর্থ বস্তুতঃ একটা মানসিক ব্যাধি বা অজ্ঞানের ফল। কে এই মানসিক ব্যাধি বা অজ্ঞানকৃত কর্ম্মের সঙ্গে এমন ভীষণ, সময়ে সময়ে অতিভীষণ প্রতিক্রিয়া, এমন যন্ত্রণা ও প্রপীড়নের অপরিহার্য্য সম্বন্ধ বন্ধন করিল—এরূপ কঠোর বিধান সৃষ্টি করিল? ধর্ম্মবোধযুক্ত বিশেষ ব্যক্তিপুরুষরূপী কোন পরম-দেবতার সহিত কর্ম্মের এমন নিষ্ঠুর বিধানকে খাপ খাওয়ান যায় না। সেইজন্য বুদ্ধের তীক্ষ্ণবুদ্ধি স্বাধীন সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বরপুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করে নাই। তিনি বলিয়াছেন সর্ব্ববিধ পুরুষকল্পনা কর্ম্মের অধীন এবং অবিদ্যা হইতে জাত।

বস্তুতঃ এই কঠোর প্রশ্ন উঠে যদি আমরা বিশ্ববহির্ভূত এক ঈশ্বরপুরুষের (personal God এর) কল্পনা করি, যিনি নিজে বিশ্বরূপ নহেন; যিনি ভাল মন্দ সুখ দুঃখের বিধান তাহার সৃষ্ট জীবের জন্য শুধু করিয়াছেন নিজে তাহাতে অপরামৃষ্ট, যিনি বিশ্বের ঊর্দ্ধে অবস্থিত থাকিয়া দুঃখহত এবং সংগ্রামরত বিশ্ববাসীকে সাক্ষীরূপে দেখিতেছেন এবং শাসন করিতেছেন অথবা নিজের ইচ্ছায় পরিচালন করিতেছেন; কিম্বা নিজের ইচ্ছায় পরিচালনা না করিয়া নিষ্ঠুর বিধান দ্বারা জগৎ পরিচালিত হইতে দিতেছেন, নিজে তাহাতে কোন সাহায্য করিতেছেন না অথবা যে সাহায্যটুকু করিতেছেন তাহা অপ্রচুর,

তবে তাহাকে ঈশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান, মঙ্গলময় বা প্রেমময় বলা চলেনা। ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ রক্ষা করিয়া বিশ্ববহির্ভূত ঈশ্বরপুরুষের কোন ধারণা বা মতবাদ দুঃখ এবং অধর্ম্মের অথবা দুঃখ এবং অধর্ম্মের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করিতে পারে না। যাহারা করিতে চেষ্টা করে, তাহাদিগকে হয় কোন অযথোচিৎ কৌশল বাহির করিয়া আসল প্রশ্ন এড়াইতে হয় অথবা পারস্যদেশীয় মানিখ নামক ধর্ম্মমত-প্রবর্ত্তকের মতানুসারে পাপ ও পূণ্য, ঈশ্বব ও সয়তান এ উভয় দ্বারা জগৎ স্বষ্ট বা পরিচালিত হইতেছে ইহা প্রকাশ্যভাবে বা প্রকারান্তরে স্বীকার কবিতে হয়, যে স্বীকার করার অর্থ, তাহাব কায্য অথবা কায্যপদ্ধতি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বকে খণ্ডিত করা। কিন্তু বেদান্তের সচ্চিদানন্দ তেমন ঈশ্বর নহেন। বেদান্তের সচ্চিদানন্দ এক এবং অদ্বিতীয়, বিশ্বের সবই তিনি। যদি দুঃখ বা অনর্থ বলিয়া কিছু থাকে তবে যে জীবরূপে তিনি নিজেকে রূপায়িত করিয়াছেন সেই জীবরূপী তিনিই তাহার ভোক্তা। এমত স্বীকার করিলে সমস্যার রূপ পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। দুঃখ তাপ প্রভৃতি তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, সুতরাং নিজে তাহা হইতে মুক্ত অথচ এসমস্ত তাহাব স্বষ্ট জীবের জন্য কিরূপে বিধান করিলেন—এ প্রশ্ন আর থাকে না। প্রশ্ন তখন অন্য আকার ধারণ করে—যাহা আনন্দ নয় যাহা তাহার আত্মস্বরূপের একান্ত বিরোধী বলিয়া বোধহয় তাহা অনন্ত অখণ্ড সচ্চিদানন্দের মধ্যে দেখা দিল কিরূপে?

এ মীমাংসায় নৈতিক প্রশ্নের যে অর্দ্ধেক অংশের কোন উত্তর নাই তাহা কাটিয়া যায়। নিজে মুক্ত থাকিয়া অপরের প্রতি নিষ্ঠুরতা অথবা তাহাদের দুঃখ ও যন্ত্রণা ভোগের পর অনুশোচনা করা বা কাল গত হইয়া গেলে করুণাপর হওয়া এককথা, আর আমি ছাড়া আর কেহ যখন নাই তখন নিজেকে নিজে দুঃখ দিতেছি ইহা অন্য কথা। তবু নৈতিক প্রশ্নটা একেবারে যায় না, তাহা মন্দীভূত বা রূপান্তরিত হইয়া অন্য আকারে এই ভাবে উঠে। যিনি আনন্দময় তিনি-ত মঙ্গলময় এবং প্রেমময়ও বটে, তাহা হইলে অনর্থ এবং দুঃখ কিরূপে তাহার মধ্যে থাকিতে পারে? কেননা তিনি-ত যন্ত্রের মত পর-তন্ত্র নহেন, তিনি স্বাধীন এবং চিন্ময় পুরুষ, দুঃখ এবং অনর্থকে দোষ দেওয়ার এবং বর্জ্জন করিবার অধিকার তাহার নিশ্চই আছে। অবশ্য

আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে এভাবে কথাটা তুলিবার মধ্যে একটা ভুল আছে, যেহেতু আমরা এখানে একাংশে অবস্থিত একটা অবস্থার আরোপ করিতেছি সমগ্রের উপর। আনন্দময়ের স্বরূপের মধ্যে যে ভাবে আমরা কল্যাণ এবং প্রেমের ধারণা করিয়াছি তাহা আমাদের ভেদ ও দ্বৈত বুদ্ধি হইতে জাত। জীবে জীবে পরস্পরের ভিতর যে সম্বন্ধ আমরা দেখিতে পাই তাহাই আমরা যিনি সকলের মধ্যে একরূপে বর্ত্তমান তাহাতে আরোপ করিতেছি। ভেদের মধ্যে অভেদ এই তত্ত্বের উপর দাঁড়াইয়া আমাদিগকে প্রথমে দেখিতে হইবে এ সমস্যাটা কিরকম দেখা দেয় এবং কিরকমে মূল স্বরূপে ইহার মীমাংসা হয়; কেবল তখনই এ সমস্যার ইতরাংশ সব ও তাহাদের পরিণতির বিষয়—যেমন ভেদ ও দ্বৈত বোধের ভিত্তিতে স্থাপিত এক জীবের সঙ্গে অন্যজীবের সম্বন্ধ—বিচার ও মীমাংসা করিতে পারিব।

কেবলমাত্র মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী বা মানুষের সমস্যার মধ্য দিয়া না দেখিয়া যদি আমরা সমগ্রের দিক হইতে দেখি তবে দেখিব যে যে জগতে আমরা বাস করি তাহা নৈতিক জগৎ নহে। সমস্ত প্রকৃতির উপর তাহার নৈতিক বা ধর্ম্ম বোধ চাপাইতে গিয়া মানুষ নিজের জেদের বশে নিজেই বিভ্রান্ত হইয়াছে। মানুষ নিজের যে ক্ষুদ্র অহং বোধে অভ্যস্ত তাহারই প্রতিবিম্ব সে সর্ব্বত্র দেখিতে পায়, মানবীয় যে সংস্কার তাহার মধ্যে জাগিয়াছে তাহার দ্বারা তাহার মনগড়া মানদণ্ডের সাহায্যে সে সব কিছুকে বিচার করিতে বসে, ইহার ফলে সত্য-জ্ঞান বা পূর্ণদৃষ্টি লাভ তাহার ভাগ্যে ঘটে না। জড় প্রকৃতির মধ্যে নৈতিক বোধ নাই, তাহার মধ্যে যে নিয়মের খেলা চলে, তাহা অভ্যাসের সমাহার, সেখানে ভাল মন্দের বিচার নাই। সেখানে সেই শক্তি সব কিছুকে সৃষ্টি করে, শৃঙ্খলাবদ্ধ করে, রক্ষা করে অথবা যাহা আছে তাহার অদল বদল করে অথবা ভাঙ্গিয়া দেয় কিন্তু সমস্তই পক্ষাপাতশূন্য ভাবে করে, ভাল মন্দের কোন ধার ধারে না, প্রকৃতির মধ্যে যে গোপন ইচ্ছাশক্তি আছে, তাহা নিজ তৃপ্তির জন্য নিজেকে নিজে এইভাবে রূপায়িত করিয়া তোলে এবং ভাঙ্গিয়া দেয়। পশু জগতে বা প্রাণপ্রকৃতিতেও নৈতিক বুদ্ধি নাই, যদিও তাহাতে প্রগতির ফলে পরে যাহা উচ্চতর জীবের মধ্যে নৈতিক প্রবৃত্তিরূপে দেখা দিবে তাহার স্থূল উপাদান প্রকাশ পাইতে থাকে। ঝড়ে

বৃক্ষাদি ভাঙ্গে বা আগুনে আমাদিগকে দগ্ধ করে বা যন্ত্রণা দেয় এজন্য যেমন তাহাদিগকে আমরা দোষ দিই না, তেমনি বাঘ তাহার শিকার ধরিয়া খায় বলিয়া তাহাকে নিন্দা করিনা; অথবা ঝড় অগ্নি বা ব্যাঘ্রের মধ্যে যে চেতনশক্তি আছে তাহাও ইহাতে কোন দোষ দেখে না। নিন্দা করা এবং দোষ দেওয়া বিশেষতঃ নিজেকে নিন্দা করা বা দোষ দেওয়া হইতে নৈতিক বোধ আরম্ভ হয়। যখন আমরা অপরকে নিন্দা করি অথচ সে বিধান নিজের উপর প্রয়োগ করি না, তখন যে আমরা নৈতিক বিচার করি তাহা নহে, তখন শুধু যাহা আমাদিগকে আঘাত করে বা দুঃখ দেয় তাহার প্রতি আমাদের চিত্তের বিরাগকেই নৈতিক বা ধর্ম্মানুশাসনের ভাষায় প্রকাশ করি।

এই বিরাগ বা জুগুপ্সা নিজে নৈতিকবোধ না হইলেও তাহার জনক। আপন ব্যক্তিসত্তার আনন্দকে নষ্ট করিতে চায় বলিয়াই বাঘ দেখিয়া হরিণের ভয় হয় অথবা আক্রমকের প্রতি সবল প্রাণীর আক্রোশ জাগিয়া উঠে। প্রগতির পথে মন যত অগ্রসর হয় তত ইহা মার্জ্জিত হইয়া ঘৃণা, বিরাগ ও অননুমোদনের রূপ ধারণ করে—যাহা আমাদিগকে আঘাত করে বা অপকার করিতে চায় তাহাকে অনুমোদন করিনা, যাহা আমাদিগকে রক্ষা করে বা তৃপ্তি দেয় তাহাকে অনুমোদন করি। এই অনুমোদন করা বা না করা ক্রমে পরিণত হয়, প্রথমে নিজের ও নিজের সমাজের পরে অপরের বা অপরের সমাজের কল্যাণ ও অকল্যাণের ধারণায়, অবশেষে আমরা সার্ব্বজনীন ভাবে কল্যাণকে অনুমোদন করি, অকল্যাণকে করিনা, কিন্তু এই ক্রম-পরিণতির বিভিন্নক্ষেত্রে মূল ভাব একই। মানুষ চায় আত্ম প্রকাশ, আত্ম-পরিণতি; অন্য ভাষায় সে চায় তাহার সত্তার সচেতনশক্তির খেলার ক্রমবর্দ্ধমান প্রকাশ এবং তাহাই তাহার মূল আনন্দ। যাহা কিছু সেই আত্মপ্রকাশ আত্ম-পরিণতি বা তজ্জন্য তৃপ্তিকে আঘাত করে তাহাই তাহার কাছে অকল্যাণ, পাপ, যাহা কিছু ইহার সহায়, অনুকূল বা পোষক যাহা কিছু ইহাকে উপচিত বা মহিমামণ্ডিত করে তাহাই তাহার কাছে কল্যাণ বা পুণ্য। কেবল তাহার আত্ম-পরিণতির ধারণা বদলায়, তাহা ক্রমশঃ মহত্তর ও উদারতর হইয়া উঠে, আপনার ব্যক্তিত্বের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি ছাড়াইয়া অপরকে এবং অবশেষে সমগ্র বিশ্বকে আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করিতে চায়।

সুতরাং নৈতিকবোধ ক্রমপরিণতির একটা বিশেষ স্তরে দেখা দেয়। কিন্তু সকল স্তরের মধ্যে সচ্চিদানন্দের আত্মরূপায়নের একটা সংবেগ অনুস্যূত রহিয়াছে। পরিণতির ক্ষেত্রে প্রথমতঃ এ সংবেগকে নৈতিকবোধবিবর্জ্জিত (non-ethical) পরে ইতর প্রাণীতে ইহাকে প্রাকৃনৈতিক (infra-ethical) বলা যায়, তার পরে বুদ্ধিমান জীবে কখনও নৈতিক জ্ঞানের বা ধর্ম্মবোধের বিরোধী হইয়াও দাঁড়ায়,—যখন যে আঘাত আমরা নিজেরা গ্রহণ করিতে চাই না, অপরকে সেই আঘাত দেওয়া আমরা স্বচ্ছন্দে অনুমোদন করি। এই হিসাবে ধরিলে মানুষের মধ্যে নৈতিক বোধ এখনও পূর্ণরূপে জাগে নাই। যেমন নিম্নতর স্তরে জীব নৈতিক বোধের নিম্নে রহিয়াছে তদ্রূপ এমন হইতে পারে যে যখন আমরা উচ্চতর স্তরে পৌছিব তখন নীতিবোধকে অতিক্রম করিয়া যাইব অথবা তাহার কোন প্রয়োজন থাকিবে না। নৈতিক জীবন যাপনের জন্য মানুষের যে একটা অভীপ্সা বা আবেগ আছে তাহা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বটে, তবু তাহার জীবনের পরিণতির পক্ষে ইহা একটি মধ্যবর্ত্তী স্তর মাত্র; নিশ্চেতন জড় রাজ্যে যে নিম্নতর সামঞ্জস্য আছে, যাহা বহুক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জীবনের সংঘাতে ভগ্ন হয় তাহা হইতে এই বৃত্তির সাহায্যে মানুষ সর্ব্বভূতের সহিত একাত্মবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত যে মহত্তর সমন্বয় ও সাফল্য তাহাতে পৌছিতে চেষ্টা করে। কিন্তু এই লক্ষ্যে আসিয়া পৌছিলে নীতি বোধের আর প্রয়োজন থাকিবে না অথবা তাহাকে রক্ষা করা আর সম্ভব হইবে না, কারণ যে সমস্ত গুণ ও বিরোধের উপর তাহার ভিত্তি তাহা সেই পরম সাম্যের মধ্যে আসিলে গলিয়া গিয়া অন্তর্হিত হইয়া যাইবে।

জড়ের অচেতন সার্ব্বভৌম ক্ষেত্র হইতে আত্মার সচেতন সার্ব্বভৌম ক্ষেত্রে পৌছিবার উপায়স্বরূপে নৈতিক বোধ অপরিহার্য্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু জগৎ সমস্যার পূর্ণ সমাধান এই বোধের দ্বারা হইতে পারে না, সমাধানের অন্যতম উপাদান মাত্ররূপে ইহার ব্যবহার করিতে পারি। অন্যথা, আমরা জগতের সকল তথ্যকে মিথ্যার দ্বারা বিকৃত করিয়া দেখার সম্ভাবনার মধ্যে গিয়া পড়িব; একটা অর্দ্ধপরিণত অবস্থার উপযোগী সাময়িক দৃষ্টিভঙ্গীর উপর মনোযোগ দিতে গিয়া আমাদের পরিণতির পূর্ব্বাপর সকল তাৎপর্য্যকে ভুল করিয়া দেখিব। জগতের পরিণতির তিনটী স্তর আছে, প্রথম স্তর নীতিবোধবিবর্জ্জিত,

দ্বিতীয় স্তর নীতিবোধযুক্ত, তৃতীয় স্তর নীতিবোধের উর্দ্ধে স্থিত। এ তিনটী স্তরের মধ্যে সাধারণভাবে যাহা আছে তাহা আমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে এবং শুধু তাহা হইলে বিশ্বরহস্য সমাধান হইতে পারিবে।

আমরা দেখিয়াছি সকল স্তরের মধ্যে সাধারণভাবে রহিয়াছে সত্তের সেই চিন্ময়ী শক্তির আত্মতৃপ্তি যে শক্তি নিজেকে নানারূপে রূপায়িত করিয়া তুলিতেছে এবং সেই রূপায়নের মধ্যে আত্মানন্দ খুঁজিতেছে। স্বয়ম্ভূসত্তার সেই আনন্দ বা তৃপ্তিই এই শক্তির সুস্পষ্ট আদি উৎস, আনন্দই তাহার স্বাভাবিক অবস্থা, আনন্দকে ভিত্তি এবং আনন্দকে আশ্রয় করিয়া সে শক্তি থাকিতে চায়। কিন্তু নবরূপায়নের এক আকৃতি আছে তাহার মধ্যে এবং তাহার নিম্নতর হইতে উচ্চতর রূপে পৌছিবার পথে দুঃখ ও তাপ—যাহা তাহার সত্তার স্বরূপ প্রকৃতির বিরোধী কিছু বলিয়া মনে হয়—আসিয়া প্রতিভাসরূপে দেখা দেয়; কেবল মাত্র ইহাই মূল সমস্যা।

কিরূপে আমরা ইহার সমাধান করিব? আমরা কি বলিব যে সচ্চিদানন্দ বিশ্বের আদি ও অন্ত নহেন পরন্তু একটি পরমশূন্য হইতে বিশ্ব আসিয়াছে এবং সেই শূন্যেই ইহার অবসান হইবে; নিজে কিছু না হইলেও যে শূন্যের মধ্যে সকল সত্তা ও অসত্তা, সকল চেতনা ও অচেতনা, সকল আনন্দ এবং অনানন্দের সম্ভাবনা বর্ত্তমান? আমরা ইচ্ছা করিলে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারি কিন্তু সবকিছু ব্যাখ্যা করিতে চাহিলেও ইহার দ্বারা কিছুই ব্যাখ্যাত হয় না, কেবল শূন্যকে সব কিছু দ্বারা পূর্ণ করা হয়। যাহা কিছুই নয়, একান্ত অভাবমাত্র, তাহাই সর্ব্বসম্ভাবনায় পূর্ণ, ইহা বলিলে স্বতঃ বিরোধের একান্ত চূড়ান্ত অবস্থাকে স্বীকার করা হয়। ইহাতে ক্ষুদ্র বিরোধকে বৃহৎ বিরোধ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়; অর্থাৎ বিরোধের ব্যাখ্যা না হইয়া তাহার চরমে পৌছান হয়। যাহা কেবল শূন্য তাহার মধ্যে কোন সম্ভাবনা থাকিতে পারে না: সকল সম্ভাবনার প্রতি নিরপেক্ষ যে নির্ব্বিশেষ তাহাকে নির্ঋতি প্রলয় বা মহাবিশৃঙ্খলা (chaos) বলা যায়, ইহাতে শূন্যের মধ্যে নির্ঋতিকে স্থাপন করি কিন্তু কি করিয়া ইহা সেখানে স্থানলাভ করিল তাহার কোনও ব্যাখ্যা দিই না বা দিতে পারি না। অতএব আবার সচ্চিদানন্দের মূল ধারণায় ফিরিয়া আসা যাউক এবং দেখা যাউক এ ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আমরা কোন পূর্ণতর মীমাংসায় পৌছিতে পারি কি না?

প্রথমে আমাদিগকে একটা বিষয় স্পষ্ট বুঝিতে হইবে; যেমন আমরা সার্ব্বভৌম চেতনার কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছি যে তাহা আমাদের মানুষের জগতে মানসচেতনা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা হইতে স্বতন্ত্র এবং তদপেক্ষা উদারতর একটা মৌলিক কিছু, তেমনি আমরা যে সতের সার্ব্বভৌম আনন্দের কথা বলিতেছি তাহাও মানুষের মধ্যে সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়বোধ বা ভাবোচ্ছ্বাস হইতে যে প্রাকৃত সুখ আমরা পাই তাহা হইতে স্বতন্ত্র একটা কিছু, তাহা হইতে উদারতর স্বরূপানুগত কিছু। সুখ, হর্ষ ও আনন্দ অথবা ইহাদের বিপরীত বৃত্তি দুঃখ যন্ত্রণা ও বেদনা বলিতে মানুষ যাহা বুঝে তাহা সীমিত এবং সাময়িক, কতগুলি অভ্যস্ত কারণের উপর তাহারা নির্ভর করে, যে পটভূমিকা হইতে প্রকাশ পায় ইহারা সে সমস্ত হইতে স্বতন্ত্র কিছু। কিন্তু সৎস্বরূপের আনন্দ সর্ব্বগত, অসীম এবং স্বয়ম্ভূ (অর্থাৎ আপন স্বরূপ হইতে জাত), তাহা কোন বিশেষ কারণের উপর নির্ভর করে না, তাহা সকল অধিষ্ঠানের পরম অধিষ্ঠান, তাহা হইতে সুখ দুঃখ অথবা যাহা নিরপেক্ষ (অর্থাৎ সুখও নয় দুঃখও নয়) এমন সমস্ত অনুভব জাত হয়। সৎ বা অস্তির (beingএর) এই আনন্দ যখন সম্ভূতির (becomingএর) আনন্দ চায় তখন শক্তিরূপে সে স্পন্দিত হয় এবং নানা আকারে রূপায়িত হইয়া উঠে শক্তি ও আকারের সেই প্রবাহের মধ্যে সুখ ও দুঃখ জোয়ার ভাঁটার মত বিপরীতমুখী গতিরূপে প্রকাশ পায়। এ আনন্দ জড়ে অবচেতন এবং মনের উপরের ক্ষেত্রে অতিচেতনরূপে অবস্থিত। প্রাণ ও মনের ক্ষেত্রে সম্ভূতির মধ্যে আত্মোপলব্ধির অন্বেষণে ইহা উপচীয়মান আত্মসচেতনতার আকারে প্রকাশ পায়। ইহার প্রথম প্রকাশ অশুদ্ধ দ্বন্দ্বময়, ইহার গতি তখন সুখ ও দুঃখের দুই প্রান্তের মধ্যে; কিন্তু ইহার চরম উদ্দেশ্য সতের যে স্বয়ম্ভু পরম বিশুদ্ধ আনন্দ, যাহা কোন বস্তু বা কারণের উপর নির্ভর করে না, তাহাকে ধরিয়া আত্মপ্রকাশ। যেমন সচ্চিদানন্দ একদিকে ব্যক্তি বা ব্যষ্টির মধ্যে সার্ব্বভৌম সতের এবং দেহ ও মনের মধ্যে রূপাতীত চৈতন্যের অনুভূতি ক্রমশঃ ফুটাইয়া তুলিতেছেন তেমনি তিনি অন্যদিকে বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা ও বিষয়ের প্রবাহ মধ্যে সর্ব্বগত স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিষয়শূন্য আনন্দের অনুভূতি ফুটাইয়া তুলিতে চাহিতেছেন। আমরা এখন এই সমস্ত বিষয়কে খুঁজি ক্ষণিক সুখ ও তৃপ্তির উৎস রূপে; যখন আমরা মুক্ত এবং আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হইব তখন আর আমাদিগ

এ সমস্ত খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে না ইহাদিগকে নিজের মধ্যেই আনন্দের দর্পণ রূপে পাইব—সুখের বহিঃস্থিত কারণরূপে আর দেখিব না।

যে মনোময় পুরুষ জড়ের অন্ধ আবরণের মধ্য হইতে মানুষের মধ্যে অহংরূপে প্রকাশ পাইয়াছে তাহার মধ্যে শুদ্ধ সত্তার আনন্দ রসবর্জ্জিত, (neutral) প্রায় আবৃত, এখনও অবচেতনার ছায়াতে সমাচ্ছন্ন, এখনও যেন গুপ্তভাবে অবস্থিত, উর্ব্বর ক্ষেত্রমাত্ররূপে অবস্থিত। বাসনার বিষাক্ত আগাছার অতিপ্রাচুর্য্যে সে ক্ষেত্র ভরিয়া গিয়াছে, সে আগাছায় আমাদের অহমিকাক্লিষ্ট অভিজ্ঞতার সুখ ও দুঃখরূপ তেমনি বিষাক্ত ফুলের সমারোহ দেখা দিয়াছে। উপচিত এই বাসনা আমাদের মধ্যে গোপনে ক্রিয়াশীলা জ্ঞানময়ী ভাগবতী শক্তি দ্বারা যখন উন্মূলিত হইবে, ঋগ্‌বেদের ভাষায় ভগবান অগ্নিমূর্ত্তিতে যখন পৃথিবীর এই বন দগ্ধ করিবেন তখন সুখ ও দুঃখের উৎস এবং গোপনসত্তারূপে তাহাদের মূলে যে আনন্দরস লুক্কায়িত আছে তাহা প্রকাশ পাইবে,—বাসনার নবরূপে নয় কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত্ত এক আনন্দরূপে, মানুষের প্রাকৃত সুখের স্থানে তখন দেখা দিবে অমৃতত্ত্বের পরম উল্লাস। এ রূপান্তর সম্ভব, কারণ মানুষের ইন্দ্রিয়বোধ ও আবেগের যেমন সুখ তেমনি দুঃখের এই প্রাচুর্য্য, স্বরূপে সত্তার এই আনন্দ ছাড়া আর কিছু নয়। ইহারা এই আনন্দকে চায় কিন্তু রূপ দিতে পারে না কারণ ভেদবুদ্ধি, আত্মজ্ঞানের অভাব এবং অহঙ্কার তাহার প্রতিবন্ধক।

দ্বাদশ অধ্যায়

আনন্দ-ব্রহ্ম—সমাধান

তাহার নাম আনন্দ, আনন্দরূপেই তাহাকে আমরা খুঁজিব ও উপাসনা করিব। কেন উপনিষদ (৪।৬)

বিশ্বের মধ্যে অবিচ্ছেদ্যভাবে অনুস্যূত হইয়া আনন্দের এক মহাসমুদ্র বর্ত্তমান, তাহারই তরঙ্গ এবং ফেনোচ্ছ্বাস হইতে আমাদের বাহিশ্চেতনায় অনুকূল, প্রতিকূল এবং নিরপেক্ষ অনুভূতি ও সংবেদনের খেলা ফুটিয়া উঠিতেছে, এই কথা যদি বুঝিতে পারি তবে যে সমস্যার আমরা বিচার করিতেছিলাম তাহার সত্য সমাধান পাওয়া যাইবে! অনন্ত অখণ্ড এক সত্তা বিশ্বের আত্মা, এ সত্তার স্বরূপ-প্রকৃতিতে আছে অবিনশ্বর স্বয়ংপ্রজ্ঞ অসীম এক চিৎশক্তি, আবার সেই স্বয়ং-প্রজ্ঞের আত্মজ্ঞানে বা স্বরূপপ্রকৃতিতে আছে অন্তহীন অব্যভিচারী এক পরম আনন্দ। অরূপে অথবা সর্ব্বরূপে, অনন্ত অখণ্ড সত্তার শাশ্বত জ্ঞানে অথবা ভেদের রাজ্যের সীমিত বহু বিচিত্র প্রতিভাসে সর্ব্বত্র সৎস্বরূপের এই স্বরূপানন্দ চির-বর্ত্তমান। আমাদের আত্মা তাহার প্রগতির পথে বাহ্য সংস্কার এবং প্রাকৃত-ভাবের বিশিষ্ট সচেতন সত্তাকে অতিক্রম করিলে যেমন একদিকে দেখিতে পায় যে এক অনন্ত নিশ্চল চিৎশক্তি আপাতপ্রতীয়মান নিশ্চেতনকে আবৃত ও আবিষ্ট করিয়া নিত্য অবস্থিত আছে, তেমনি সে আবিষ্কার করে যে এক অসীম প্রশান্ত সচেতন আনন্দ বিশ্বের সব কিছুকে আলিঙ্গন করিয়া সদা বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং এই আনন্দের সুরে মানুষ তাহার নিজের জীবনের তার বাঁধিয়া লইতে পারে; এই আনন্দ ব্রহ্মের নিজের আনন্দ—এই আত্মা সর্ব্বভূতাত্মা। কিন্তু আমাদের প্রাকৃত দৃষ্টি আত্মা এবং বস্তুর বাহিরের ক্ষেত্রে শুধু জাগ্রত ও বিচরণশীল, ইহার কাছে এই আনন্দ গুপ্ত, অবচেতন, গহন গভীরে অবস্থিত। যেমন প্রত্যেক আকারের মধ্যে তদ্রূপ সুখ, দুঃখ ও নিরপেক্ষ যে কোন অভিজ্ঞতা আমাদের

নিকট উপস্থিত হয় তাহার অন্তরে এ আনন্দ গুপ্তভাবে বিরাজিত আছে। এই আনন্দই প্রত্যেক পদার্থকে নিজের সত্তা বজায় রাখিতে সমর্থ করিয়া তুলে, শুধু সমর্থ নয় বাধ্য করে, তাই ত দেখিতে পাই অন্য সকল বৃত্তিকে অভিভূত ও অতিক্রম করিয়া সম্ভূতি বা আত্মসত্তাকে বজায় রাখিবার অতি প্রবল এক ইচ্ছা-শক্তি নিত্য বর্ত্তমান ; ইহাই দেখা দিয়াছে প্রাণের ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তিরূপে, স্থূলে জড়ের অবিনশ্বরত্ব (indestructibility of matter) এবং মনে অমরত্বের বোধরূপে। আত্ম পরিণামের সকল পর্ব্বে সকল স্তরেই ইহার অস্তিত্ব দেখা যায়। এমন কি আত্মবলির সাময়িক প্রবৃত্তিতেও বিপরীত-ভাবে রহিয়াছে অমরত্বের এই পিপাসা ; কেন না মানুষ সেখানেও সত্তার লোপ চায় না, সত্তার অন্যরূপের প্রতি প্রবল আকর্ষণের জন্য বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি জুগুপ্সাই (recoil) সেখানে আত্মবলির কারণ হইয়া দাঁড়ায়। আনন্দ ও সত্তা এক, অভেদ্য, অচ্ছেদ্য ; আনন্দই সৃষ্টির রহস্য, আনন্দই জন্মের মূল, আনন্দ আছে বলিয়াই সব কিছু বর্ত্তমান আছে, আনন্দেই জন্মের অন্ত, সৃষ্টির বিলয়। তাই উপনিষদে আছে "আনন্দ হইতেই সর্ব্বভূত জাত, আনন্দের জন্য তাহারা বর্ত্তমান ও আনন্দই তাহার বৃদ্ধির মূল আবার আনন্দেই তাহারা প্রয়াণ করে।"

সৎ চিৎ ও আনন্দ মূল সত্তার এ তিনটি রূপণ স্বরূপতঃ এক, কিন্তু আমাদের মানসিক দৃষ্টিতে ত্রিরূপে প্রকাশিত, আমাদের খণ্ডিত চেতনায়, প্রতিভাসে ইহারা বিভক্তবৎ প্রতীয়মান হয় মাত্র। এই ত্রৈক ভাবের উপর সম্যক্‌ভাবে দৃষ্টি রাখিলে প্রাচীন দর্শনে, (যথা) মায়াবাদ, প্রকৃতিবাদ ও লীলাবাদে যে সমস্ত বিভিন্ন মত বা সূত্র আছে তাহাদিগকে যথাস্থানে এমনভাবে স্থাপিত করিতে পারিব যে তাহারা সকলে মিলিয়া এক অখণ্ড দর্শনের বিভিন্ন অঙ্গে পরিণত হইবে এবং তাহাদের মধ্যে চিরাগত যে তর্কযুদ্ধ চলিতেছে তাহা থামিয়া যাইবে। কারণ জগৎসত্তা আমাদের নিকট যেরূপ প্রতিভাত হয় তাহা শুদ্ধ-অনন্ত-অখণ্ড-নির্ব্বিকার সৎ বা সত্তার সম্বন্ধের দিক হইতে যদি দেখি তবে তাহাকে মায়া বলিয়া দেখিতে এবং বর্ণনা করিতে পারি। মায়া শব্দের প্রথম অর্থ ছিল একটা ব্যাপক চৈতন্য যাহার মধ্যে সব কিছু অন্তর্নিবিষ্ট আছে, যাহা সব কিছুকে আলিঙ্গন করিয়া রাখিয়াও তাহাদিগকে পরিমিত ও সীমিত সুতরাং রূপায়িত করিতে সমর্থ ; এই মায়া আকার ও পরিমাণ রচনা করে, অরূপকে রূপ দেয়,

অজ্ঞেয়কে মানসিক রূপণে যেন জ্ঞানগম্য করে, অসীমকে যেন সীমার মধ্যে প্রকাশ করে। ক্রমে অর্থের অপকর্ষে এ শব্দে, জ্ঞান, নিপুণতা বা বুদ্ধি না বুঝাইয়া, চাতুরী, ছলনা অথবা ভ্রম এই অর্থে ব্যবহৃত হইতে থাকে এবং পরবর্ত্তী কালে দর্শনশাস্ত্রে ভ্রান্তি, বিভ্রম, বা ইন্দ্রজাল, এই অর্থেই ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে।

জগৎ মায়া। জগৎ মায়া বা মিথ্যা এ কথার অর্থ যদি এই দাঁড়ায় যে ইহার কোন সত্তা বা অস্তিত্ব নাই তবে তাহা সত্য নহে, কারণ যদি জগৎ আত্মার স্বপ্নও হয় তবু স্বপ্নরূপে ব্রহ্মের মধ্যে ইহার একটি অস্তিত্ব থাকিবে, চরমে মিথ্যা হইলেও বর্ত্তমানে তাহা নিজের কাছে সত্য। ইহার কোন শাশ্বত সত্তা নাই সেই অর্থে জগৎ মিথ্যা—ইহাও বলা উচিত নহে। সত্য বটে কোন বিশেষ জগৎ বা বিশেষরূপ স্থূলতঃ লয় পাইতে পারে, মনোময় চেতনার কাছে ব্যক্ত অবস্থা হইতে অব্যক্ত দশায় পৌঁছিতে পারে, তথাপি স্বরূপতঃ রূপ বা জগৎ শাশ্বত, অব্যক্ত দশা হইতে অনিবার্য্যরূপে আবার ব্যক্ত দশায় ফিরিয়া আসে; সর্ব্বদা একরূপে বর্ত্তমান না থাকিলেও শাশ্বত পুনরাবৃত্তি তাহাদের আছে, ব্যষ্টি রূপণে, প্রতিভাসে বা আকারে ইহাদের পরিবর্ত্তন বা পরিণাম নিয়ত বর্ত্তমান থাকিলেও, সমষ্টির ক্ষেত্রে এবং ভিত্তিতে ইহারা নিত্য, পরিণামরহিত। যখন বিশ্বের কোন রূপ নাই বা শাশ্বত চিন্ময় সত্তার অনুভূতিতে আকারগত বা ভাবগত কোন খেলা নাই, এমন কাল ছিল বা আসিবে ইহা জোর করিয়া বলিবার কি অধিকার, কি নিশ্চিত প্রমাণ আমাদের আছে? কেবল আমাদের বোধিজাত এই ধারণাই আছে যে পরিদৃশ্যমান এই জগৎ তৎস্বরূপ হইতে আসিতে পারে এবং আসে এবং তাহাতেই ফিরিয়া যায়—অনন্তকাল ধরিয়া এই লীলা চলিয়া আসিতেছে।

তবু জগৎ মায়া, কারণ ইহা অনন্ত সত্তার স্বরূপ সত্য নহে। ইহা সচেতন আত্ম-সত্তার একটা বিসৃষ্টি; বিসৃষ্টি শূন্যের মধ্যে শূন্য বা অসৎ হইতে নয় কিন্তু আত্মসত্তার শাশ্বত সত্যের ভূমিকার মধ্যে শাশ্বত সত্যেরই বিসৃষ্টি। ইহার মূল উপাদান এবং অধিষ্ঠান সকলই সদ্‌ব্রহ্ম, তাহারই স্বানুভবের ক্ষেত্রে তাহার চিন্ময়ী সৃষ্টিশক্তি বলে ইহা তাহারই পরিবর্ত্তনশীল আত্মরূপায়ন। এ সমস্ত ব্যক্ত হইতে পারে, অব্যক্তে ফিরিয়া যাইতে অথবা অন্যরূপে প্রকাশিত হইতে পারে। এরূপ বৈচিত্র্যকে ইচ্ছা করিলে আমরা বলিতে পারি অনন্ত চৈতন্যের একটা ভ্রান্তি, কিন্তু তাহাতে মনের অতীত যে সত্তাতে ভ্রান্তি বা অসত্যের লেশ মাত্র নাই সেই পরম

চৈতন্যে স্পর্দ্ধাভরে ভ্রান্তি ও শক্তিহীনতার অধীন আমাদের এই প্রাকৃত মনের ছায়াপাত করা হইবে। সদ্ ব্রহ্মের স্বরূপে ও উপাদানে অসত্যের কোন স্থান নাই বুঝিলে এবং আমাদের খণ্ডিত চেতনার সকল ভ্রান্তি ও বিকৃতি অখণ্ড চিন্ময় সত্তার কোন না কোন সত্য বিভূতি হইতে আসিয়াছে ইহা জানিলে, আমাদিগকে বলিতে হয় যে বিশ্ব তৎ পদার্থের স্বরূপ বা অপরিণামী একত্বের সত্য নয় বটে কিন্তু ইহা তাহারই বহু বৈচিত্র্যময় অনন্ত পরিবর্ত্তনশীল প্রাতিভাসিক সত্য।

পক্ষান্তরে যদি বিশ্বসত্তাকে আমরা চৈতন্য এবং চেতনশক্তির দিক হইতে দেখি তখন আমাদের দৃষ্টি ও অনুভবে বোধ হইবে যে জগৎ কোন একটা নিগূঢ় ইচ্ছা হইতে জাত এবং তদ্দ্বারা পরিচালিত একটা ক্রিয়া কিম্বা শক্তিস্পন্দ, অথবা যিনি ইহাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং ইহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছেন এমন কোন চৈতন্যের দ্বারা আরোপিত কোন প্রয়োজন বা নিয়তির ফলে ইহার প্রকাশ হইয়াছে। তখন বলিব ইহা প্রকৃতির বা কার্য্যকরী শক্তির খেলা, যে খেলার উদ্দেশ্য সাক্ষী ও ভোক্তা পুরুষের তৃপ্তিসাধন, অথবা বলিব ইহা শক্তি, গতি ও ক্রিয়ার সঙ্গে যিনি নিজেকে এক করিয়া দেখিতেছেন এমন কোন পুরুষের খেলা। তখন ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে জগৎ নিত্য অফুরন্ত অভিজ্ঞতার রসাস্বাদন-আকৃতিতে উচ্ছ্বসিত নিখিল বিশ্ব জননীর অনন্তরূপে আত্মরূপায়ন।

আবার যদি জগৎসত্তাকে শাশ্বত সৎব্রহ্মের স্বরূপানন্দের দিক দিয়া দেখি তখন ইহাকে লীলা বলিয়া বুঝি ও বলিতে পারি; যাহার আনন্দ শিশুর হাসিতে, কবির কাব্যকলায়, অভিনেতার অভিনয়-দক্ষতায়, রূপকারের চারুশিল্পের মধ্যে সদা ফুটিয়া উঠে, নিখিল জগতের আত্মা, সেই সদানন্দময় চির কিশোর তাহার লীলার জন্য কেবলমাত্র তাহার আত্মবিসৃষ্টির বা আত্মপ্রকাশের পরম আনন্দের জন্য অনন্তকাল ধরিয়া অফুরন্ত ভাবে নিজের মধ্যে নিজেকেই পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিবার আনন্দোচ্ছ্বাসময় খেলা খেলিতেছেন; এ খেলায় ক্রীড়ক তিনি, ক্রীড়া তিনি, ক্রীড়াক্ষেত্রও তিনি। শাশ্বত স্থির অপরিণামী সচ্চিদানন্দের সঙ্গে বিশ্ব-লীলার সম্বন্ধ দেখিতে গিয়া মায়া, প্রকৃতি এবং লীলার ধারণা হইতে যে তিনটী পরস্পর বিরোধী মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বস্তুতঃ তাহাদের মধ্যে কোন অসঙ্গতি নাই, তাহারা পরস্পরের পরিপূরক এবং জগৎ ও জীবনকে পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে প্রত্যেকের প্রয়োজন আছে। যে জগতের আমরা অংশ, সর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্টতঃ

তাহা মনে হয় শক্তির ক্রিয়া বা স্পন্দ ; কিন্তু তাহার অন্তরে প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে, চিন্ময়ী এক সৃজনশক্তি নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল ছন্দদোলায় এক অনন্ত শাশ্বত সত্তার প্রতিভাসিক সত্যসমূহ নিত্য বিকীর্ণ করিতেছে। এই ছন্দদোলার মূল, কারণ বা উদ্দেশ্যে দেখিতে গেলে দেখা যাইবে যে অফুরন্ত আত্মরূপায়ণের সমুল্লাসে সদা ব্যস্ত সত্তার অনন্ত আনন্দের খেলা হইতেই তাহার উদ্ভব। জগৎকে বুঝিতে গেলে এই ত্রিভাবে বিভাবিত দৃষ্টি লইয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে।

তাহা হইলে সমস্ত জগদ্ ব্যাপারের মূলে এই দাঁড়াইল, যে শাশ্বত অপরিণামী আনন্দময় সত্তাই সমস্ত বৈচিত্র্যময় সম্ভূতির আনন্দ রূপে আত্ম-প্রকাশ করিতেছে, সুতরাং আমাদের সকল অভিজ্ঞতাকে নিজের অবিচ্ছেদ্য আনন্দ দ্বারা ধারণ করিয়া, তাহাদের পশ্চাতে এক অখণ্ড চিৎসত্তা সদা বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং সেই আনন্দই তাহার স্পন্দলীলার দ্বারা ইন্দ্রিয়বোধের ক্ষেত্রে সুখ দুঃখ এবং উপেক্ষার নানা বৈচিত্র্য ফুটাইয়া তুলিতেছে—এই ধারণাকেও আমাদের স্বীকার করিতে হইবে। সেই সচ্চিদানন্দই আমাদের খাঁটি সত্তা। সুখ দুঃখ এবং ঔদাসিন্যের ত্রিধাবৃত্তির অধীন মনোময় সত্তা তাহার প্রতিভূমাত্র। বিশ্বের বহু বিচিত্র স্পর্শের সাড়া এবং প্রতিক্রিয়া হইতে আমাদের খণ্ডিত চেতনায় প্রথম ছন্দরূপে যাহার প্রকাশ হয় সেই ইন্দ্রিয়বোধের অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য, এই মনোময় সত্তাকেই পুরোভাগে স্থাপন করা হইয়াছে। এই সাড়া পূর্ণ নয়, এ ছন্দের মধ্যে বহু জটিলতা, বহু বৈষম্য রহিয়াছে কিন্তু একদিন যে আমাদের মধ্যে চিন্ময় পুরুষের একত্বের পূর্ণ খেলা দেখা দিবে, ইহা তাহার আভাস ও আয়োজন। যখন আমরা সার্ব্বভৌম সেই পরমপুরুষের সুরের সঙ্গে আমাদের জীবনের তার এক সুরে বাঁধিতে পারিব তখন বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বের পূর্ণ সুরসঙ্গতির সন্ধান পাইব কিন্তু সে দিন আজিও আসে নাই, তাই এ বেসুর ও ছন্দঃপতন।

এই দৃষ্টি সত্য হইলে এমন কতগুলি সিদ্ধান্ত ইহা হইতে আসিয়া পড়ে যাহা আমাদিগকে অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। প্রথমতঃ আমাদের গভীরে যদি আমরা পরম একই হই, অখণ্ড সর্ব্বচিৎ সুতরাং সর্ব্ব-আনন্দই যদি আমাদের স্বরূপ সত্তা হয়, তাহা হইলে সুখ, দুঃখ ও ঔদাসিন্যের ত্রিধা স্পন্দনে আমাদের যে ইন্দ্রিয়বোধ জাগে, তাহা জাগ্রত চেতনায় যাহা সর্ব্বোপরি রহিয়াছে আমাদের

সেই খণ্ডিত অংশ হইতে জাত বহিরঙ্গ-ব্যাপার মাত্র। ইহার পিছনে আমাদের জাগ্রত চেতনা হইতে অনেক বৃহৎ গভীর এবং সত্য এমন কিছু নিশ্চয়ই আছে যাহা সকল অভিজ্ঞতা হইতে নিরপেক্ষভাবে আনন্দ রসাস্বাদন করে। সেই রসই আমাদের মনোময় প্রাকৃত চেতনাকে গোপনে ধারণ করিয়া রাখে এবং তাহাই আমাদের সম্ভূতির বিক্ষুব্ধ ক্রিয়া ও গতির সকল আয়াস, দুঃখ এবং অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে এ চেতনাকে আত্মসংরক্ষণের শক্তি দেয়। আমরা যাহাকে আমি বলি তাহা বাহিরে প্রকাশিত একটি আলোক-রশ্মি-স্পন্দ মাত্র। ইহার গভীরে স্থিত অতি বিপুল অবচেতনা এবং অতিচেতনাময় এক সত্তা বিশ্বের স্পর্শ গ্রহণের জন্য অনুভবসমর্থ এই বাহ্য সত্তাকে অনাবৃত রাখিয়া তাহার এই সমস্ত বাহ্য অনুভূতিকে নিজ ইষ্ট সিদ্ধির কাজে লাগায়। নিজে গুপ্ত থাকিয়া এ সমস্ত স্পর্শ সে গ্রহণ করে এবং পরিপাক করিয়া ইহাদিগকে গভীরতর সত্যতর সৃজনবীর্য্যে রূপান্তরিত করে; আবার সেই গভীর হইতে শক্তি, চরিত্র, জ্ঞান ও আবেগরূপে এ সমস্ত বাহ্য চেতনায় ফিরাইয়া দেয়। কোন্ রহস্য লোক হইতে যে মন এ সম্পদ লাভ করে তাহা সে জানে না, কারণ আমাদের চঞ্চল মন শুধু বাহিরে অবস্থিত থাকিয়া স্পন্দিত হয় মাত্র, নিজেকে সংহৃত করিয়া গভীরে বাস করিতে ইহা এখনও শিখে নাই।

আমাদের সাধারণ জীবনে এ সত্য আমাদের নিকট প্রচ্ছন্ন, অথবা ইহার অস্পষ্ট আভাস কখনও কখনও আমরা পাই, কিন্তু, ইহার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এখনও অপূর্ণ; তবে যখন আমরা অন্তরে বাস করিতে শিখি তখন আমাদের মধ্যে ইহার অনুভূতি নিশ্চয়ই জাগিয়া উঠে; সে অনুভূতিতে গভীর প্রসন্ন প্রশান্ত অসীম বীর্য্যশালী এক আত্মসত্তার পরিচয় পাই, জগতের কোন প্রভুত্ব তাহার উপরে নাই—এ অনুভূতিতে যাহার সাক্ষাৎ পাই তিনি স্বয়ং ভগবান না হইলেও আমাদের অন্তরস্থিত তাঁহারই আত্মজ্যোতি। তখন আমরা তাঁহার সম্বন্ধে সচেতন হই এবং বুঝি যে তিনিই আমাদের এই আপাতপ্রতীয়মান বহিরাত্মাকে ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন এবং দেখি যে তিনি ইহার সুখ দুঃখে, শিশুর ভ্রান্তি ও মানসিক উত্তেজনার সময় স্নেহশীল পিতার মত সকৌতুকে স্নিগ্ধভাবে হাসিতেছেন। যদি আমরা নিজেদের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের বাহ্য অভিজ্ঞতার সহিত নহে, পরন্তু সেই দিব্য ভাগবদজ্যোতির সহিত নিজেকে এক

করিয়া দেখিতে পারি, তাহা হইলে জগতের সমস্ত সংস্পর্শ ও অভিজ্ঞতাতে আমরা সেই অবিচলিত ভাব বজায় রাখিতে পারিব। তখন আমরা সেই সমগ্র চৈতন্তে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দেহ প্রাণ ও মনের সুখ ও দুঃখ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে অথচ তাহাদিগকে অভিজ্ঞতারূপে গ্রহণ করিতে পারি; কিন্তু এ সমস্ত স্বভাবতঃ বহিরঙ্গ বলিয়া আমাদের খাঁটি সত্তার অন্তঃস্থলে পৌছে না বা তথায় প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। সংস্কৃত ভাষার গভীরার্থবাচক শব্দ গ্রহণ করিয়া বলিতে পারি সঙ্কুচিত মনোময় পুরুষের উপরে এক বিশাল আনন্দময় পুরুষ আছেন—আনন্দময়েরই অস্পষ্ট ছায়া বা ক্ষুদ্র প্রতিবিম্বমাত্র হইল মনোময়। আমাদের স্বরূপ সত্য আমাদের ভিতরেই আছে, বাহিরে নয়।

আবার সুখ, দুঃখ ও ঔদাসীন্য এই ত্রিধা বৃত্তি শুধু বাহিরের ব্যাপার, আমাদের পরিণতির অসম্পূর্ণতার ফল ও ব্যবস্থা, সুতরাং এই ভাবের অনুভূতি অবশ্য হইতেই হইবে একথা ঠিক নহে। একটা বিশেষ স্পর্শে সুখ দুঃখ বা উদাসীনতার একটা বিশেষরূপে সাড়া দিতে আমরা বাধ্য নই, আমরা শুধু অভ্যাসের বশেই এরূপ সাড়া দিয়া থাকি, আমরা কোন বিশেষ স্পর্শে সুখ অথবা দুঃখ যে বোধ করি, তাহার কারণ আমাদের প্রকৃতি ঐ ভাবে অভ্যস্ত হইয়াছে, অথবা স্পর্শের সঙ্গে স্পর্শগ্রহীতার এক বিশেষ ভাবের সাড়া দেওয়ায় সম্বন্ধ অভ্যাসের ফলে স্থায়ী হইয়াছে মাত্র। এখন যেরূপ সাড়া দিতে অভ্যস্ত হইয়াছি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ধরণের সাড়া দেওয়া অর্থাৎ এখন যেখানে সুখ পাই সেখানে দুঃখের অথবা এখন যেখানে দুঃখ পাই সেখানে সুখের অনুভূতি লাভ করিবার শক্তি আমাদের মধ্যে আছে। আমাদের বহিশ্চেতনা যেখানে যন্ত্রের মত সুখ দুঃখ বা উপেক্ষার সাড়া দেয়, সেখানেও প্রতি ব্যাপারে আমাদের মধ্যে রহিয়াছেন সত্য ও বিশাল আনন্দময় পুরুষ এবং ইহার অনুভবে নিত্য বর্ত্তমান যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দের সাড়া, তাহা স্বাধীন ভাবে জাগাইয়া তুলিতে অভ্যস্ত হইবার শক্তিও আমাদের আছে। বাহিরের অভ্যস্ত সুখ বা দুঃখের যে কোন সাড়াকে আমাদের গভীরে নির্লিপ্তভাবে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করিবার শক্তি অপেক্ষা, সকল ব্যাপারে এই আনন্দের সাড়া জাগাইয়া তুলিবার শক্তি একটা মহত্তর সিদ্ধি, একটা পূর্ণতর ও গভীরতর আত্মজয়। কারণ পূর্ব্বের অবস্থায় আমরা সুখ দুঃখকে নির্লিপ্তভাবে গ্রহণ করিলেও জয় করি না, শুধু অভিজ্ঞতার অপূর্ণতাকে

অবিচল ভাবে গ্রহণ করি ; দ্বিতীয় অবস্থায় আমরা অপূর্ণতাকে পূর্ণতায়, মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করিবার শক্তি দেখিতে পাই—সেখানে আত্মার নিত্য সত্য ও আনন্দ, মনোময় পুরুষের দ্বৈতের বা দ্বন্দ্বের অভিজ্ঞতার স্থান অধিকার করে।

সুখ দুঃখের সাড়া যে অভ্যাসজাত এবং আপেক্ষিক, মানসিক ব্যাপারে তাহা বুঝা বেশী কঠিন নয়। আমাদের স্নায়বিক সত্তা নির্দিষ্ট অভ্যস্ত ধারায় ক্রিয়া করে, এমনকি সেই নির্দিষ্ট ধারায় সাড়া দিতে সে বাধ্য, এ ভ্রান্ত ধারণাও তাহার আছে। চিনি স্বভাবতঃ যেমন মিষ্ট তেমনি ভাবে বিজয়, সম্মান বা সকল প্রকার ঐশ্বর্য্যলাভের সহিত সুখের এবং নিম যেমন তিক্ত তেমনিভাবে পরাজয়, অপমান বা সকল প্রকার দুর্দ্দৈবের সহিত দুঃখের নিত্য সম্বন্ধ রহিয়াছে, ইহাই আমরা মনে করি। আমাদের ধারণা, নির্দিষ্ট সাড়ার ব্যতিক্রম ঘটে না, ব্যতিক্রম অস্বাভাবিক বা অসুস্থ অবস্থার পরিচায়ক। কারণ মানুষ তাহার জীবনক্ষেত্রে একই অবস্থায় যাহাতে একই নির্দ্দিষ্টভাবে সাড়া দিতে অথবা একই ঘটনায় যাহাতে একই অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে, প্রকৃতি তেমনি ভাবেই এই অভ্যাসের দাস স্নায়বিক সত্তাকে গড়িয়া তুলিয়াছে। পক্ষান্তরে মনোময় সত্তা ইহার অপেক্ষা স্বাধীন কেননা তাহাকে বৈচিত্র্য, পরিবর্ত্তন এবং উন্নতির উপায় রূপে গড়া হইয়াছে। যতক্ষণ সে ইচ্ছা করে ততক্ষণ মাত্র অধীন থাকে, যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ পর্য্যন্ত মানসিক অভ্যাসের কোন বিশেষ ধারা মানিয়া চলে বা ততক্ষণ মাত্র সে স্নায়ুর পরবশ থাকে। পরাজয়, ক্ষতি বা অপমানে সে দুঃখিত হইতে বাধ্য নয়, এ সমস্ত সে উদাসীন ভাবে গ্রহণ করিতে পারে, এমন কি পরিপূর্ণ প্রসন্নতার সহিত এগুলিকে সে বরণ করিয়া নিতেও পারে। এইজন্য স্নায়ু বা দেহের শাসন দ্বারা পরিচালিত হইতে যত বেশী সে অস্বীকার করে, যতই প্রাণময় ও অন্নময় অংশ হইতে নিজেকে পৃথক করিয়া নিতে পারে, ততই সে স্বাধীনতা লাভ করে। জগতের স্পর্শে তাহার সাড়া তখন অভ্যস্ত দাসের নয়, প্রভুর মত হইতে পারে।

কিন্তু শারীরিক সুখ দুঃখের ক্ষেত্রে এই সার্ব্বভৌম সত্য প্রয়োগ করা অধিকতর কঠিন। কারণ স্নায়ু ও দেহের রাজ্য যে চৈতন্যের কেন্দ্র ও আবাস-ভূমি, বাহিরের স্পর্শ বা বাহিরের সুখ দুঃখ দ্বারা পরিচালিত হওয়াই তাহার প্রকৃতি। তবু এখানেও সেই সত্যের আভাস পাওয়া যায় ; আমরা দেখিতে পাই অভ্যাসানুযায়ী একই বাহ্যসংস্পর্শ সুখ বা দুঃখের কারণ হইতে পারে

শুধু বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে নয়, একই ব্যক্তির বিভিন্ন অবস্থায় বা তাহার পরিণতির বিভিন্ন স্তরে। সাধারণ অবস্থায় যে স্পর্শ বা অভিঘাত তীব্র যন্ত্রণা দেয় তাহা উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও, তীব্র উত্তেজনা বা গভীর হর্ষোচ্ছ্বাসের সময় মানুষকে দৈহিক বেদনা বোধ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতেও ত অনেক সময় দেখা যায়। অনেক সময় যখন স্নায়ু নিজের অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া মনকে স্মরণ করাইয়া দেয় যে এরূপ ক্ষেত্রে সে বেদনা বোধ করিতে অভ্যস্ত সুতরাং বাধ্য, তখন যন্ত্রণা বোধ ফিরিয়া আসে। কিন্তু মনের এ বাধ্যতা অপরিহার্য্য নয় ইহা শুধু অভ্যাসের ফল মাত্র। বেদনাবোধ করিতে নিষেধ করিয়া সম্মোহিত অবস্থায় শরীরে অস্ত্রাঘাত করিলে বা কোন কিছু ফুটাইয়া দিলেও সম্মোহিত ব্যক্তি বেদনা বোধ করে না এমন কি সে অবস্থা হইতে তাহার সাধারণ অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেও বেদনাবোধ জাগিবেনা ইহা করা চলে তাহা ত দেখা যায়। ইহার কারণ স্নায়বিক অভ্যাসের দাস জাগ্রতচৈতন্যকে স্তম্ভিত করিয়া সম্মোহক গভীরে অধিচেতনাতে অবস্থিত মনোময় পুরুষের ক্রিয়া প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়; এই মনোময় পুরুষ ইচ্ছা করিলে স্নায়ু ও দেহকে বশে আনিতে পারে। সম্মোহনে অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রভাবে এ অধিকার লাভ হইলেও সে সময় অপরের ইচ্ছা দ্বারা চালিত হওয়াতে ইহাকে সত্যকার অধিকার বলা চলে না। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে নিজের ইচ্ছা দ্বারা বাস্তব অধিকারও ক্রমশঃ লাভ করা চলে, যাহার ফলে আমাদের মনোময় সত্তা, স্নায়ু ও দেহের অভ্যস্ত সাড়াকে আংশিক বা পূর্ণভাবে স্ববশে আনিতে পারে।

দেহ ও মনের যন্ত্রণাবোধ প্রকৃতির বা শক্তির খেলার একটা কৌশল মাত্র, ঊর্দ্ধপরিণামের পথে এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্তির সময় বিশেষ কোন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ইহা আসিয়াছে। ব্যক্তিচেতনার দিক দিয়া দেখিলে জগৎকে বহু বিচিত্র শক্তিসমূহের খেলা বা জটিলসংঘাত বলিয়া মনে হয়; এই জটিল খেলার মধ্যে জীব তাহার সীমিত সত্তা ও সীমিত শক্তি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহার উপর অগণিত আঘাত আসিয়া পড়িতেছে, যে আঘাতে সে যাহাকে 'আমি' বলে তাহাকে ক্ষত বিক্ষত বা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে পারে। এই সমস্ত বিপজ্জনক বা অনিষ্টকর সংস্পর্শ

হইতে জীবের দেহ ও স্নায়ুমণ্ডলি যে পশ্চাৎপদ হইতে চায়, তাহাই যন্ত্রণা বোধ রূপে দেখা দেয়। এ বোধ উপনিষদে যাহাকে জুগুপ্সা বলে তাহার অংশ। সীমাবদ্ধ সত্তা তাহার আত্মরক্ষার আবেগে সে যাহা নয় এবং যাহা তাহার প্রতিকূল বা "অপর" তাহার নিকট হইতে সরিয়া আসে, স্বরূপতঃ ইহাই জুগুপ্সা। এদিক দিয়া দেখিলে এই জুগুপ্সা বা পীড়া বোধ কাহাকে এড়াইয়া যাইতে হইবে, অথবা এড়ান অসম্ভব হইলে, কাহার প্রতিবিধান করিতে হইবে তাহার ইঙ্গিত দিবার জন্য প্রকৃতিদত্ত বিধান। যতদিন জড় জগতে প্রাণ দেখা দেয় নাই ততদিন যন্ত্রণাও আসে নাই, কারণ ততদিন প্রকৃতির কার্য্যের পক্ষে যান্ত্রিক পদ্ধতিই যথেষ্ট। প্রাণ যখন তাহার ক্ষণভঙ্গুরতা এবং জড়ের উপর অপূর্ণ ও অপ্রচুর অধিকার লইয়া আসিয়া রঙ্গমঞ্চে দেখা দিল, তখন হইতে বেদনাবোধের আবির্ভাব হইল। প্রাণের মধ্যে মনের উন্মেষ ও পরিণতির সঙ্গে বেদনাও বাড়িয়া চলিল। যে দেহ ও প্রাণকে সে ব্যবহার করে, মন যতদিন তাহার অধীন থাকে, যতদিন তাহার জ্ঞান ও কর্ম্মের জন্য তাহাদের উপর নির্ভর করিতে হয়, ততদিন দেহ ও প্রাণের যে সমস্ত সীমা ও বাধা আছে, যাহা হইতে তাহার অহন্তার আবেগ ও আকৃতি জাত হয়, সেই সমস্ত সীমা ও বাধাকেও মানিয়া মনকে চলিতে হয়, ফলে ততদিন বেদনাবোধ থাকাও অনিবার্য্য। কিন্তু যদি ও যখন মন ও মানুষ অহঙ্কারপরিশূন্য, মুক্ত এবং স্বাধীন হয়, যখন সর্ব্বভূত ও বিশ্বশক্তির সহিত তাহার সমন্বয় সাধিত হয় তখন যন্ত্রণা-বোধের প্রয়োজন প্রথমে কমিয়া যায় এবং পরে একেবারে লোপ পায়। উর্দ্ধচেতনা যতদিন তাহার মধ্যে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত না হয় ততদিন প্রয়োজন না থাকিলেও অভ্যাসজনিত সংস্কাররূপে উহা কিছুকাল থাকিতে পারে। জড়ের বশ্যতা এবং অহঙ্কারের বাধা মানুষ একদিন নিশ্চয়ই জয় করিবে ইহাই বিশ্ব-বিধান, এই পূর্ণ জয় লাভের জন্য দুঃখবোধের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ তাহাকে সেদিন করিতেই হইবে।

এই যন্ত্রণাবোধ দূর করা সম্ভব, কেননা সুখ এবং দুঃখ এ উভয়ই শুদ্ধ সৎ বা অস্তির আনন্দ রূপেরই দুটী ধারা, একটী অপূর্ণ অপরটী বিকৃত। অপূর্ণতা এবং বিকৃতির কারণ এই যে জীবের মধ্যে মায়াদ্বারা সীমিত ও পরিমিত খণ্ড-চৈতন্যের প্রকাশ হইয়াছে বলিয়া সে বিশ্বের স্পর্শ তাহার

অহঙ্কারের ভিতর দিয়া খণ্ড খণ্ড ভাবে গ্রহণ করে, সার্ব্বভৌম ভাবে করে না। বিশ্বাত্মার কাছে সকল পদার্থ, সকল স্পর্শই মৌলিক এক আনন্দকে জাগাইয়া তোলে, সংস্কৃত ভাষায় যাহা 'রস' এই সুন্দর নামে অভিহিত হইয়াছে। রসশব্দের অর্থে বস্তুর সার এবং স্বাদ এ দুইই বুঝায়। বাহিরের স্পর্শের মধ্যে আমরা পদার্থের সারকে খুঁজিনা, কেবল কিভাবে তাহা আমাদিগের মধ্যে কামনা, ভয়, লালসা বা সঙ্কোচ জাগায় সেই দিকে দৃষ্টি রাখি বলিয়া দুঃখ এবং যন্ত্রণা, অপূর্ণ অস্থায়ী সুখ বা ঔদাসীন্য আসিয়া উপস্থিত হয় অর্থাৎ পদার্থের সারগ্রহণের অসামর্থ্যের জন্য, রসই এ সমস্ত রূপ পরিগ্রহ করে। মন ও প্রাণে যদি আমরা পূর্ণরূপে অনাসক্ত হইতে পারি এবং সেই অনাসক্তি যদি আমরা আমাদের স্নায়ুমণ্ডলের উপর আরোপ করিতে পারি, তাহা হইলে রসের এই অপূর্ণ ও বিকৃত ধারা দূর করা এবং সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে শুদ্ধ সত্তের অব্যভিচারী আনন্দের মৌলিক সত্য আস্বাদন পাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়। কাব্য ও কলার সৌন্দর্য্যবোধের ভিতর দিয়া বিচিত্র অথচ সার্ব্বভৌম এই আনন্দের কতকটা আমরা অনুভব করিতে পারি। তখন সেখানে আমরা দুঃখময় করুণ, ভীতিপ্রদ ভয়ানক এমন কি জুগুপ্সাজনক বীভৎস রস হইতেও আনন্দ পাই। ইহার কারণ আমরা সেখানে নিঃস্বার্থ এবং অনাসক্ত, আত্মরক্ষার কথা তখন ভাবিনা, কেবল ভাবি মূল বিষয়টী ও তাহার রসের কথা। অবশ্য আমাদের লৌকিক সৌন্দর্য্য-বোধের অতীত শুদ্ধ অতিমানস আনন্দ বা তাহার অবিকল প্রতিরূপ এখানেও পাই না, কারণ এই যে সে ব্রহ্মানন্দে দুঃখ ভয় বা জুগুপ্সা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়, অথচ কাব্যকলায় তাহাদিগকে স্বীকার করা হয়। তবু প্রকাশের ক্ষেত্রে বিশ্বাত্মার যে আনন্দ ক্রমশঃ উপচিত হইয়া উঠিতেছে তাহার আংশিক এবং অপূর্ণ একটা অনুভূতি এ রসের মধ্য দিয়া পাওয়া যায় এবং আমাদের প্রকৃতির এক ভাগে আমাদিগকে অহংবোধে অনাসক্ত করিয়া এমন এক সার্ব্বভৌম বোধের সহিত যুক্ত করে যাহা দ্বারা আমাদের খণ্ডচেতনায় যেখানে বিশৃঙ্খলা এবং বিরোধ দেখিতে পাই, সেখানে বিশ্বাত্মা কিভাবে সৌন্দর্য্য ও সুষমা দেখেন তাহা বুঝিতে পারি। আমাদের পূর্ণ মুক্তি আসিবে সেইদিন, যেদিন আমাদের সত্তার সকল অংশ এই ভাবে মুক্ত হইবে,

যেদিন সার্ব্বভৌম এক প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে সর্ব্বগত রসস্বরূপকে দেখিতে পাইব, বিশ্বের সর্ব্বপদার্থে অনাসক্তি জাগিয়া উঠিবে কিন্তু তবু আমাদের স্নায়বিক এবং আবেগময় সত্তার সহিত আমাদের সহানুভূতি ও মিলন নষ্ট হইবে না।

আমাদের ভিতরকার চিৎশক্তি যখন বাহিরের আঘাত গ্রহণ করিতে গিয়া বাধাপ্রাপ্ত বা ব্যাহত হয় তখন সঙ্কুচিত বা পরাঙমুখ হইয়া পড়িলে যন্ত্রণাবোধ জাগিয়া উঠে। এ বেদনাবোধের মূলে রহিয়াছে বিশ্বকে গ্রহণ ও অধিকার করিবার শক্তিহীনতা বা বিশ্বের সংস্পর্শ অসমভাবে গ্রহণ। সচ্চিদানন্দই আমাদের আত্মার স্বরূপ অবিদ্যাবশতঃ একথা ভুলিয়া গিয়া আমাদের অহং নিজেকে দীন এবং সীমাবদ্ধ মনে করাতে এরূপ হইয়া পড়িয়াছে। তাই যন্ত্রণাবোধকে দুর করিতে হইলে যে সমস্ত অভিঘাতে আমাদের মধ্যে জুগুপ্সা বা সঙ্কোচ জাগায় তাহাদিগের সম্মুখীন হইয়া তিতিক্ষার দ্বারা তাহাদিগকে জয় করিতে হইবে, তাহা হইলে আমরা একটা সমত্ববোধে পৌঁছিতে পারিব, তখন সকল সংস্পর্শে, হয় আমরা সমভাবে উদাসীন থাকিব অথবা সমভাবে প্রসন্নতা লাভ করিব। যখন সুখ দুঃখ ভোগ করে যে অহংচেতনা তাহার স্থানে পরমানন্দ-ময় সচ্চিদানন্দচেতনার প্রতিষ্ঠা করিতে পারিব, তখন এই সমত্ববোধ একটা দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে সমর্থ হইবে। সচ্চিদানন্দচেতনা বিশ্ব হইতে সরিয়া গিয়া বিশ্বাতীত হইতে পারে, এই সুদূর আনন্দের অবস্থায় পৌঁছিবার পথ হইতেছে সব কিছুতে সমান ভাবে উদাসীন থাকা—সে পথ সন্ন্যাসীর। আবার সচ্চিদানন্দচেতনা বিশ্বাতীত হইয়াও বিশ্বাত্মক এবং সার্ব্বভৌম হইতে পারে—সবকে আলিঙ্গন করিয়া যে চেতনা সদা বর্ত্তমান আছে, এখানেই তাহাতে পৌঁছিবার পথ হইতেছে সেই সর্ব্বগত সমরস আনন্দে ক্ষুদ্র অহংএর সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পন, প্রাচীন বৈদিক ঋষিগণের ছিল এই পথ। কিন্তু সুখ এবং দুঃখে উদাসীন থাকাই অধ্যাত্মিকতার পথে প্রথম এবং স্বাভাবিক সাধনা এবং সকল অবস্থায় প্রসন্নভাব সাধারণতঃ পরে আসে, সুখ দুঃখ এবং উপেক্ষাকে আনন্দে রূপান্তর করাও সম্ভব কিন্তু মানুষের পক্ষে তাহা সহজ নহে।

পূর্ণ বেদান্তের দৃষ্টিতে জগৎ এইরূপ। নিজের শুদ্ধ আত্মচৈতন্যে পরমানন্দময় এক অনন্ত অখণ্ড সত্তা তাহার সেই মূল বিশুদ্ধভাব হইতে চিৎশক্তির বৈচিত্র্যময় নানা লীলায়, প্রকৃতির নানা গতি ও স্পন্দে আত্ম প্রকাশ করেন ইহাই তাহার

মায়া। সত্তার সে আনন্দ প্রথমে বাহ্য জড় জগতের ভূমিকায় অবচেতনে সমাহিত এবং আত্মসংহৃত, সেখানে একেবারে বাহ্যপ্রকাশ শূন্য, তারপর সেই আনন্দ এক সমরস ভাবের প্রবল উচ্ছ্বাস জাগাইয়া তোলে, তাহাকে তখনও আমরা ইন্দ্রিয়বোধ বলিতে পারি না, তারপর সেই আনন্দ হইতেই অহং এবং মনের উন্মেষ ও পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে সুখ দুঃখ এবং ঔদাসীন্যের ত্রিধা প্রকাশ দেখা দেয়। এই তিন ভাবের মূলে রহিয়াছে আকারের মধ্যে চিৎশক্তির সীমাবদ্ধতা, যাহা বিশ্বশক্তির অভিঘাত অনেক সময় বিরোধীরূপে দেখে, তাহার নিজের মান ও আদর্শের সঙ্গে মিলে না বলিয়া তাহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে না। অবশেষে নিজ সৃষ্টির মধ্যে সচ্চিদানন্দের সচেতন প্রকাশ হয় তখন তিনি নিজেতে নিজে প্রতিষ্ঠিত হন, সর্ব্বত্র সার্ব্বজনীনতা ও সমত্ব দেখা দেয়, প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। জগতের মধ্যে প্রকাশের ধারা এই।

তবু যদি প্রশ্ন হয়, তিনি একামেবাদ্বিতীয়ং, সংস্বরূপ সেই ব্রহ্মের এরূপ গতি ও স্পন্দে আনন্দ কেন, তাহার উত্তর এই যে তাহার অনন্তত্বের মধ্যে সকল সম্ভাবনা নিহিত আছে—তাহার নির্ব্বিকল্প সত্তায় নয়, পরন্তু তাহার রূপান্তরগ্রাহী সম্ভূতিতে—এই অনন্ত সম্ভাবনার নানা বিচিত্র প্রকাশেই তাহার আনন্দ। সেই অনন্ত সম্ভাবনার মধ্য হইতে একটী সম্ভাবনা ফুটিয়া উঠিয়াছে, আমরা যাহার অংশ সেই জগৎরূপে। এখানে আরম্ভে সচ্চিদানন্দ আত্মগোপন করিয়া যাহা তিনি নহেন যেন তাহার মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন, পরে তাহার স্বরূপের বিরোধী সেই ভাবের মধ্যে যেন নিজেকে আবার তিনি খুঁজিয়া পাইতেছেন। অনন্ত সংস্বরূপ যিনি তিনি দৃশ্যতঃ অসতের মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়া আবার সান্ত জীবের আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছেন। অনন্তচৈতন্য দৃশ্যতঃ এক বিশাল নির্ব্বিশেষ নিশ্চেতনের মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়া তাহা হইতে এক সীমিত বহিশ্চর চেতনারূপে ফুটিয়া উঠিয়াছেন, অনন্ত স্বপ্রতিষ্ঠ শক্তি পরমাণুর দৃশ্যতঃ এক নির্ঋতি বা মহাবিশৃঙ্খলতার মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়া জগতের অনিশ্চিত ব্যবস্থারূপে উন্মিষিত হইয়া উঠিতেছেন। অনন্ত আনন্দ দৃশ্যতঃ অসাড় জড়ের মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়া তথা হইতে সুখ দুঃখ ঔদাসীন্য, রাগদ্বেষ ও উপেক্ষার নানা বিরোধী ও বেসুর বিচিত্রতার ঝঙ্কারে আবার উন্মিষিত হইয়া উঠিতেছেন; অনন্ত অখণ্ডতা বহুত্বের দৃশ্যতঃ

মহাবিশৃঙ্খলতার মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়া বিরোধের মধ্য দিয়া নানা শক্তি ও সত্তারূপে উন্মিষিত হইয়া, পরস্পরকে কবলিত করিয়া, গ্রাস করিয়া, জীর্ণ করিয়া যেন সেই অখণ্ডতাকে ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করিতেছেন। এই সৃষ্টির মধ্যে সচ্চিদানন্দকে স্বরূপে উন্মিষিত ও প্রকাশিত হইতে হইবে। ব্যক্তিসত্তা হইয়াও মানুষকে বিশ্বপুরুষ হইতে হইবে, বিশ্বপুরুষ রূপে বাস করিতে হইবে। তাহার সীমিত মানসচেতনা বিস্তারলাভ করিয়া অতিচেতনার একত্বে পরিণত হইবে—যাহার মধ্যে প্রত্যেকে সকলকে আলিঙ্গন করিয়া নিত্য বর্ত্তমান; তাহার সঙ্কীর্ণ হৃদয় এমন উদারতা লাভ করিবে যে সে অনন্তকে আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হইবে এবং তাহার বাসনা ও বিরোধের স্থান অধিকার করিবে, এক সার্ব্বজনীন ভালবাসা; তাহার সঙ্কুচিত প্রাণ সমস্ত বিশ্বের অভিঘাত গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়া সার্ব্বভৌম আনন্দে ভরপুর হইয়া যাইবে; এমন কি তাহার জড় দেহও জানিবে যে সে পৃথক সত্তা নহে, অখণ্ড সর্ব্বগত মহাশক্তির সহিত এক হইয়া তাহাকে ধারণ করিবার সে যোগ্য হইবে। এমনি করিয়া ব্যক্তির মধ্যে একত্ব, সামঞ্জস্য ও সুষমা ফুটিয়া উঠিবে, যে সচ্চিদানন্দ সকলের মধ্যে পরম এক তিনিই তাহার সমগ্র প্রকৃতির মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিবেন।

এই সমস্ত খেলার মধ্যে প্রচ্ছন্ন সৎ বস্তু হইল অখণ্ড এবং সমরস আনন্দ। ব্যক্তিচেতনার যেখানে উন্মেষ নাই সেই অবচেতনার সুপ্তিতেও এই আনন্দই বর্ত্তমান; ব্যক্তিচেতনাকে কেন্দ্র করিয়া যে বিরোধ, বিচিত্র রূপান্তর, বিকৃতি ও বিপর্য্যয় চলিতেছে, অর্দ্ধচেতন স্বপ্নের সেই ঘন ঘোরের মধ্যেও সেই আনন্দ; আবার যাহাতে ব্যক্তিচেতনা জাগরিত হইয়া অখণ্ড সচ্চিদানন্দের সহিত এক হইবে সেই শাশ্বত স্বপ্রতিষ্ঠ অতিচেতনায়ও সেই একই আনন্দ। এই হইল যিনি প্রভু, যিনি এক, যিনি সর্ব্ব, তাহার খেলা, আমাদের নিকট তাহা আত্মপ্রকাশ করে যখন আমরা মুক্তিলাভ করিয়া বিজ্ঞানালোকিত দৃষ্টি লইয়া এই জড় জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করি।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভাগবতী মায়া

> পরমপুরুষ এবং আত্মাশক্তির নামরূপী বিভূতিদের দ্বারা তাহারা জ্যোতির্ম্ময়ী জননীর শক্তিকে আকারে এবং পরিমাণে নিবদ্ধ করিলেন; সেই শক্তির বিচিত্রবীর্য্যে বিভূষিত হইয়া মায়ীরা এই সতের মধ্যে রূপ ফুটাইয়া তুলিলেন। (ঋগ্বেদ ৩।৩৮।৭)

> তাহার মায়ার দ্বারা মায়ীরা সবাইকে রূপ দিলেন; দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন পিতৃগণ যিনি শিশুরূপে জন্মিবেন সেই পুরুষকে গর্ভমধ্যে নিহিত করিলেন। (ঋগ্বেদ ৯।৮৩।৩)

সৎ বা সত্তা তাহার শুদ্ধ আনন্দের ধা হইতে আনন্দেরই শক্তিতে সৃষ্টি ও ক্রিয়া করেন। তিনিই আমাদের স্বরূপ সত্য, আমাদের সকল ভাব ও ভঙ্গীর আত্মা এবং আমাদের সকল ক্রিয়ার, সকল সম্ভূতির, সকল বিসৃষ্টির তিনিই আদি কারণ এবং চরম লক্ষ্য। কবি, শিল্পী বা গায়ক, মনীষী বা রাষ্ট্রকর্ম্মী যেমন তাহাদের অন্তরের সামর্থ্যকে মূর্ত্ত করিয়া তুলে, তাহারা সৃষ্টি করে সেইসব, যাহা তাহাদের মধ্যে তাহাদের সহিত এক হইয়া গুপ্তভাবে অবস্থিত ছিল এবং যখন আকারের মধ্যে ফুটিয়া উঠে তখন তাহারাই এ সমস্তরূপে প্রকাশ পায়, জগতের সঙ্গে শাশ্বত সত্তার সম্বন্ধও ঠিক এই প্রকার। সকল সৃষ্টি বা সম্ভূতি এইরূপ একটা আত্মপ্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। বীজের মধ্যে যাহা নিহিত তাহাই অঙ্কুরিত হইয়া প্রকাশ পায়, বীজের মধ্যে তাহার সত্তা পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান, যাহা হইয়া উঠিতেছে তাহার ইচ্ছা বা সংবেগও তাহার মধ্যে রহিয়াছে, যে ভাবে প্রকাশ হইবে তাহাও তাহার সম্ভূতির আনন্দের মধ্যে যেন পূর্ব্ব হইতেই সাজাইয়া গুছাইয়া রাখা আছে। পরিণামে যে জীবাবয়ব organism) গঠিত হইবে তাহা ভ্রূণে শক্তিরূপে নিহিত আছে। কারণ

তাহার মধ্যে অবস্থিত আত্মসচেতন অথচ গোপন শক্তি তাহাকে রূপায়িত করিবার অদম্য আকূতি লইয়া সদা ক্রিয়াশীল। কেবলমাত্র ব্যক্তিচেতনা আপনার মধ্য হইতে কিছু সৃষ্টি করিয়াও তাহাতে তাহার নিজের, যে শক্তি তাহাতে ক্রিয়া করে তাহার এবং যে উপাদান লইয়া সে কর্ম্ম করে এই তিনের মধ্যে একটা ভেদ দেখে। কিন্তু বস্তুতঃ শক্তি সে নিজেই, যে ব্যক্তিচেতনা তাহার শক্তির সাধন, তাহার সৃষ্টির জন্য যে উপাদান সে ব্যবহার করে এবং পরিণামে যে আকার গড়িয়া উঠে সে সমস্তই সে নিজে। অন্য ভাষায় এই বলা যায় যে একই সত্তা, একই শক্তি, একই আনন্দ আত্মশক্তি বা আত্মরূপায়ণের নানা বিচিত্র লীলায় সদা রত থাকিয়া বিভিন্ন বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হইয়া প্রত্যেকের ভিতর হইতে যেন বলে 'এইত আমি'।

সৃষ্টি ও স্রষ্টা এক, এক ছাড়া অন্য কিছু হইতে পারে না; সৃষ্টি স্রষ্টার আত্ম-সত্তা, চিৎশক্তি এবং আনন্দ স্বরূপেরই একটা ছন্দ, একটা খেলা, একটা স্ফূর্তি বা পরিণতি। তাই জগতে যাহা কিছু ব্যক্ত হয় সে চায় সম্ভূতিরূপে আত্মরূপায়ণ, সংকল্পিতরূপের স্ফূরণ—চায় সেই রূপের মধ্যে আত্মভাবের উপচয়, প্রকাশ; যে চৈতন্য ও শক্তি তাহাতে অন্তর্নিহিত আছে তাহার অনন্ত ভাবের অনুভব,—চায় বিকশিত হইয়া উঠিবার আনন্দ, আত্মরূপগ্রহণের আনন্দ, চেতনার ছন্দদোলার আনন্দ, শক্তির খেলার আনন্দ। যে সত্তা, যে চিৎশক্তি, যে আনন্দ তাহার সত্তার গভীরতম প্রদেশে ক্রিয়াশীল তাহার ইঙ্গিতে যে কোন উপায়ে তাহার সম্বন্ধে যে কোন ধারণার আশ্রয়ে, যে কোন দিকে হউক এই আনন্দকে বাড়াইয়া তোলা এবং পূর্ণ করাই তাহার অন্তরের আকূতি—এই একমাত্র চাওয়া ছাড়া সত্যরূপে সে আর কিছু চায় না।

সৃষ্টির যদি কোন লক্ষ্য থাকে, কোন পূর্ণতালাভের দিকে যদি তাহার গতি বা অব্যক্ত ইচ্ছা থাকে তবে তাহা ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়ক্ষেত্রেই আত্মসত্তাকে, তাহার চৈতন্য ও শক্তিকে, তাহার আনন্দ স্বভাবকে পরিপূর্ণভাবে ফুটাইয়া তোলা ছাড়া আর কিছু নয়। যতক্ষণ ব্যক্তিচেতনা ব্যক্তিরূপের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে কেন্দ্রীভূত ততদিন এ পূর্ণতা সম্ভব নয়। সান্তের মধ্যে পরিপূর্ণ পূর্ণতা কখনও ফুটিতে পারে না, কারণ তাহা সান্তের আত্মধারণা বা স্বরূপকল্পনার বিরোধী। সুতরাং শেষ লক্ষ্যে পৌছা তখনই সম্ভব হইবে, ব্যক্তির মধ্যে

অনন্ত চেতনার যখন উন্মেষ ও স্ফুরণ হইবে। আত্মজ্ঞান এবং আত্মোপলব্ধি দ্বারা যখন সে আপনার স্বরূপ সত্য উপলব্ধি করিবে, তখন সান্ত ভাব নানারূপের মধ্যে প্রকাশের জন্য যাহার একটা মুখোশ বা যন্ত্রমাত্র, সেই অনন্ত সত্তা অনন্ত চৈতন্য এবং অনন্ত আনন্দের মধ্যে সে তাহার আত্মস্বরূপ পুনরায় লাভ করিবে।

সচ্চিদানন্দ তাহার অমেয় সত্তাকে দেশ ও কালরূপে বিস্তৃত করিয়া যে বিশ্বখেলার কল্পনা করিয়াছেন তাহার রহস্য বুঝিতে গেলে, আমাদিগকে প্রথমে বুঝিতে হইবে যে তাহার আত্মচেতনাকে সংবৃত এবং আত্মসমাহিত করিয়া তিনি অনন্ত বিভজ্যমান স্থূল জড়ে পরিণত হইয়াছেন, নতুবা সান্ত ভাবের বৈচিত্র্য দেখা দিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ বুঝিতে হইবে যে জড়ের মধ্যে সেই আত্মনিরুদ্ধ শক্তিই রূপময় প্রাণময় ও মনোময় বিগ্রহরূপে স্ফুরিত হইয়া উঠিয়াছে; অবশেষে বুঝিতে হইবে দেহধারী সেই মনপ্রাণময় সত্তা, যে অখণ্ড অনন্ত জগতের ভিতর খেলা করিতেছেন তাহার সহিত একত্ব অনুভবের দ্বারা নিজেকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিবে, ফলে এখনও তাহার গোপন সত্তায় শাশ্বত সত্যরূপে সে নিজে যাহা, সেই অসীম সৎ চিৎ ও আনন্দকে সে পুনরায় লাভ করিবে। এই ত্রিধা গতির মধ্যেই সমস্ত বিশ্বরহস্যের একমাত্র মীমাংসা পাওয়া যাইবে।

এইভাবে বেদান্তের প্রাচীন এবং শাশ্বত সত্য আধুনিক পরিণামবাদের ব্যবহারিক সত্যকে গ্রহণ ও সমর্থন এবং তাহার সকল উদ্দেশ্য ও অর্থ আমাদের নিকট উদ্ঘাটিত :করে। যাহা কালক্রমে ক্রমশঃ উপচিত হইয়া উঠিতেছে প্রাচীন সেই সার্ব্বজনীন সত্যের যৎকিঞ্চিৎ অস্পষ্ট জ্ঞান আধুনিক বিজ্ঞান, জড় ও তাহার শক্তির আলোচনা করিয়া পাইয়াছে, যাহার নাম দেওয়া হইয়াছে ক্রমপরিণতিবাদ। ইহার পূর্ণ অর্থ এবং সমর্থন পাইতে হইলে বেদান্ত শাস্ত্রে আজিও আমাদের জন্য যে প্রাচীন ও শাশ্বত সত্যের আলোক রক্ষিত হইয়াছে সেই আলোক দ্বারা এমতবাদকে আলোকিত করিতে হইবে। প্রাচ্যের প্রাচীন এবং প্রতীচ্যের নবীন জ্ঞানের এই পরস্পরের সহিত পরিচয় ও মিলন হইলে এ জ্ঞানের প্রত্যেকে অপরের আলোকে নিজের স্বরূপ বুঝিতে পারিবে—এই দিকেই জগতের চিন্তার প্রবাহ বহিতে আরম্ভ হইয়াছে।

তথাপি সকল পদার্থ সচ্চিদানন্দ ইহা স্বীকার করিলেও সকল সমস্যার সমাধান

আমরা পাই না। জগতের মূল কি, স্বরূপ সত্য কি তাহা জানিলেও কি করিয়া সেই সত্য এই প্রাতিভাসিক সত্যে পরিণত হইল তাহা এখনও আমরা জানি নাই। সমাধানের চাবি পাওয়া গিয়াছে, কোন্ তালায় এ চাবি ঘুরাইতে হইবে তাহার সন্ধান মিলে নাই। কারণ সচ্চিদানন্দ জগতে ত অনবধানে থাকিয়া কাজ করেন না অথবা ঐন্দ্রজালিকের মত চূড়ান্ত খেয়ালে শুধু মহাবাক্য বা আদেশ দিয়া বিশ্বসৃষ্টি করেন না। একটা পদ্ধতি একটা বিধানের অস্তিত্ব ত আমরা অনুভব করি।

ইহা সত্য যে এই বিধানকে যখন আমরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখি তখন তাহা নানা শক্তির খেলার মধ্যে একটা সাম্য ব্যবস্থা—সে খেলা ক্রমপরিণামের ফলে আগত বা অতীতের অভ্যাসে লব্ধ, ঠিক এই কারণেই কতকগুলি ধারার মধ্যে আপনাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা কেবলমাত্র শক্তিকেই দেখি ততক্ষণ এই আপাতপ্রতীয়মান গৌণ সত্যই আমাদের চরম জ্ঞান। কিন্তু শক্তিকে যখন সত্তার আত্মপ্রকাশরূপে দেখি তখন আমরা বোধ করিতে বাধ্য হই যে নির্দ্দিষ্ট ধারায় প্রবহমানতার সঙ্গে সেই সত্তার কোন আত্ম-সত্যের সম্বন্ধ আছে, সেই সত্তাই এ শক্তি পরিচালিত করিতেছে, ইহার লক্ষ্য এবং চলিবার পথ নিরূপিত করিতেছে। যেহেতু সে মূল সত্তার প্রকৃতি এবং শক্তি চৈতন্যময়, এই সত্য সেই চিন্ময় সত্তার আত্মবোধ ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না। সৃষ্টির মূলস্বরূপ যে আত্ম-প্রকাশেচ্ছা সেই চৈতন্যে প্রথমে জাগিয়াছিল, তাহাকেই উপযুক্ত ধারায় অব্যাহতভাবে প্রবাহিত করিবার জন্য তাহারই আত্মশক্তিকে এরূপ নির্দ্দিষ্টভাবে চলিতে হইয়াছে। এই শক্তি সে চৈতন্যে অনুস্যূত বা নিহিত ছিল। সুতরাং যে সত্যের বশে বিশ্বপ্রকাশ হইতেছে সেই বিশেষ সত্যের খাঁটি ধারণা এবং সেই সত্যের যথাযথ পথে সৃষ্টির প্রবেগকে নিয়ন্ত্রিত করিবার যে সামর্থ্য সেই অনন্তসত্তার আত্মচৈতন্যে আছে, তাহাই এই নিজ পথনির্দ্ধারক শক্তি।

কিন্তু অনন্ত চৈতন্য এবং ক্রিয়ার পরিণাম বা সৃষ্টির মধ্যস্থলে একটা বিশেষ শক্তি বা বৃত্তি আছে ইহা স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? সেমেটিক (ইহুদীদের) শাস্ত্রে যেমন আছে, ঈশ্বর বলিলেন 'আলোক হউক' এবং অমনি আলোক দেখা দিল, তেমনি ভাবে আত্মসংবিৎ স্বাধীনভাবে ইচ্ছামাত্র দ্বারা

সৃষ্টি করিতে এবং যতদিন পর্য্যন্ত তিনি প্রলয় হওয়ার আদেশ না দেন ততদিন পর্য্যন্ত সৃষ্টি বজায় রাখিতে কি পারেন না? কিন্তু যখন আমরা বলি "ঈশ্বর বলিলেন আলোক হউক" তখন একথা আমরা ধরিয়া লই যে সে চৈতন্যে এমন একটা শক্তি আছে—যাহা আলোক-নয়-এমন-যাহা-কিছু সে চৈতন্যের মধ্যে আছে তাহার মধ্য হইতে আলোকের জ্ঞানকে বাছিয়া লইয়াছে. আবার যখন বলি "অমনি আলোক দেখা দিল" তখনও একটি নিয়ন্ত্রণক্ষম শক্তিকে স্বীকার করিয়া লই, যাহা প্রথম যে আলোক বোধ জাগিয়াছে তদনুসারে ক্রিয়া করিতে সমর্থ, যাহা আলোক ভিন্ন অন্য অনন্ত-রূপে যে প্রকাশের সম্ভাবনা আছে তাহা দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে না এবং আলোক প্রকাশ রূপ ঘটনা ঘটাইতে সক্ষম। অনন্ত চেতনা তাহার ক্রিয়া দ্বারা অনন্ত প্রকার পবিণাম প্রকাশ করিতে সমর্থ। সেই অনন্ত পরিণামের মধ্যে একটী নির্দ্দিষ্ট সত্যকে বাছিয়া নেওয়া এবং সেই সত্য অনুসারে একটা জগৎ গড়িয়া তোলার জন্য জ্ঞানের এমন একটী নির্ব্বাচনী বৃত্তি বা শক্তি চাই, যাহা এইভাবে অনন্ত সত্য হইতে সান্ত প্রতিভাসকে ফুটাইয়া তুলিতে পারে।

বৈদিক ঋষিরা এই শক্তিকে মায়া নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাহাদের কাছে ইহা চিৎ সত্তার সেই শক্তি যাহা বিশ্বের আধার ও আশ্রয় এবং যাহা সেই চৈতন্যের অমেয় বিশাল সত্যের মধ্য হইতে পরিমিত করিয়া নামরূপকে ফুটাইয়া তুলে। মায়ার দ্বারা স্বরূপ সত্তার অচল এবং নিষ্ক্রিয় সত্য, সচল ক্রিয়াশীল সত্তার ছন্দময় সত্যরূপে দেখা দেয়, অথবা দার্শনিক ভাষায় বলিতে গেলে, যেখানে সমষ্টি বা সর্ব্ব ভেদাত্মক চৈতন্যদ্বারা সীমিত এবং বিভক্ত না হইয়া সর্ব্বরূপেই বর্ত্তমান আছে সেই পরম সত্যের মধ্য হইতে সত্তার সঙ্গে সত্তার, চৈতন্যের সঙ্গে চৈতন্যের, শক্তির সঙ্গে শক্তির, আনন্দের সঙ্গে আনন্দের খেলার জন্য এই মায়ার দ্বারা প্রাতিভাসিক সত্তার স্ফুরণ ও প্রকাশ হয়, যেখানে ব্যষ্টিতে বা প্রতি পদার্থে সর্ব্ব বা সমষ্টি এবং সর্ব্বে প্রতি পদার্থ বর্ত্তমান থাকে। প্রথমে মনের খেলা বা অপরা মায়ার ভ্রমবশতঃ ব্যষ্টিতে সমষ্টির এবং সমষ্টিতে ব্যষ্টির লীলা আমাদের নিকটে গুপ্ত থাকে। অপরা মায়া ব্যষ্টিতে এই ভাব জাগায়, সে সর্ব্বে আছে কিন্তু সর্ব্ব তাহাতে নাই, সর্ব্বে যে সে আছে তাহাও অপরের সঙ্গে অভেদ ভাবে এক হইয়া নয়, পরন্তু পৃথক বা ভিন্ন রূপে। শেষে কিন্তু এই ভ্রম হইতে আমাদিগকে

অতিমানসের খেলায় পরা মায়ার সত্যে জাগিতে হইবে যখন ব্যষ্টি ও সমষ্টি, এক এবং বহু একই সত্যের অবিভাজ্য একত্বরূপে পরস্পর মিলিত হইয়া বাস করিবে। অধুনা বর্ত্তমান ভ্রমোৎপাদক এই নিম্নতর মায়াকে প্রথমে মানিয়া লইয়া পরে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে, কারণ ইহা ভেদ অন্ধকার, সীমা, সংঘর্ষ ও দুঃখের সঙ্গে ঈশ্বরেরই খেলা, এ খেলায় তাঁহার ভিতর হইতে যে শক্তি উদ্‌গত, তিনি যেন নিজে তাহার অধীন হইয়াছেন এবং তাহার অন্ধতার দ্বারা নিজেকেও যেন অন্ধ হইতে দিয়াছেন। মনের মায়া দ্বারা আমাদের কাছে আবৃত অন্য যে পরা মায়া আছে তাহাকেও অতিক্রম করিয়া গিয়া ফিরিয়া আবার তাহাকে আলিঙ্গন করিতে হইবে। কারণ তাহা সত্তার অনন্ত ভাবের মধ্যে জ্ঞান ও শক্তির বিশালতা এবং ঐশ্বর্য্যে অসীম প্রেমের পরম আনন্দে ভগবানেরই খেলা। এ খেলায় তিনি শক্তির হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়াও নিজের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত সেই শক্তিকে আলিঙ্গন করিয়া যে আকৃতির জন্য সে শক্তি তাহা হইতে নির্গত হইয়াছিল তাহাই পূর্ণ ও সার্থক করিয়া তোলেন।

চিন্তায় এবং বিশ্বের তত্ত্বে পরা এবং অপরা মায়ার এই যে বিভেদ আছে দুঃখবাদী বা মায়াবাদীরা তাহা দেখিতে বা মানিতে চাহে না। তাহাদের নিকট মনোময়ী অথবা হয়ত অধিমানসী মায়া জগৎস্রষ্ট্রী। এই মনোময়ী মায়া দ্বারা সৃষ্ট জগৎ স্বভাবতঃ একটা অনির্ব্বচনীয় প্রহেলিকা, ইহা চিৎসত্তার একটা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ভাব হইয়াও ভাসমান স্বপ্ন বিকার, যাহাকে ভ্রম অথবা সত্য ইহার কোন কোঠায়ই ফেলা যায় না। আমাদিগকে বুঝিতে হইবে একদিকে পরিচালনা ও সৃষ্টি করিতে সমর্থ প্রজ্ঞা, অপর দিকে কর্ম্মের জালে আবদ্ধ প্রাকৃত জীব, মন ইহাদের মধ্যবর্ত্তী অবস্থা মাত্র। সচ্চিদানন্দ তাহার নিম্নতর গতি ও স্পন্দে জড়ের মধ্যে নিজে আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন অর্থাৎ তাঁহার নিজের সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে যেন হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তিনিই আবার সেই আত্মবিস্মৃতি হইতে নিজের স্বরূপ সত্তাকে ফিরিয়া পাইতে চলিয়াছেন। এই অবতরণ ও উত্তরণে মন তাঁহার যন্ত্রসমূহের অন্যতম; অবতরণে মন যন্ত্র মাত্র, সে গোপন স্রষ্টা নহে; উত্তরণের পথে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হওয়ার সময়ে ইহা একটা স্তর বা ভূমি—আমাদের মূল উৎপত্তি স্থান অথবা বিশ্বসত্তা যেখানে এক দিন পৌঁছিবে সে চরম স্থান নহে।

যে সমস্ত দার্শনিক মত একমাত্র মনকেই জগতের স্রষ্টা বলিয়া দেখে অথবা যাহারা একটা মূল তত্ত্ব স্বীকার করে, কিন্তু সেই তত্ত্ব এবং বিশ্বের মধ্যে কেবলমাত্র মনই মধ্যস্থতা করে এরূপ সিদ্ধান্ত যাহাদের, তাহাদিগকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায় ; এক ভাগকে বলা যায় ভাবাতিবাদ (noumenalism) অপরকে ভাববাদ (idealism)। খাঁটি ভাবাতিবাদীর মতে জগৎ হইল মন, চিন্তা বা ভাবনার খেলামাত্র ; সে জ্ঞান বা ভাব পূর্ণরূপে মন দিয়া গড়া ; সত্তার খাঁটি সত্যের সঙ্গে তাহার কোনরূপ মৌলিক সম্বন্ধ নাই। এরূপ স্বরূপ সত্য যদি কিছু থাকে তবে তাহা জগতের সহিত সম্বন্ধ রহিত ; জগতের সহিত তাহার কোন মিল বা সাম্য থাকা সম্ভব নহে। ভাববাদী পশ্চাতের মূল সত্য এবং সম্মুখের প্রতিভাসের ধারণার মধ্যে একটা সম্বন্ধ স্বীকার করে যে সম্বন্ধ কেবলমাত্র বিরোধ ও ব্যাবৃত্তির সম্বন্ধ নহে। আমি যে মত উপস্থিত করিতেছি তাহা ভাববাদের পথে আরো অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। এমত দেখে যে জ্ঞান সৃষ্টি করে তাহা সত্য জ্ঞান অর্থাৎ এ জ্ঞান চৈতন্যের সেই শক্তি যাহা খাঁটি সত্তাকেই প্রকাশ করে, সত্য সত্তা হইতে জাত সেই সত্তার প্রকৃতির ধর্ম্মই তাহাতে বর্ত্তমান—কেবল শূন্য হইতে তাহার জন্ম হয় নাই অথবা সে শুধু মিথ্যার জাল বুনিয়া চলে না। এক চিন্ময় সত্য নিজের মধ্য হইতে তাহার অপরিবর্ত্তনীয় অক্ষয় ও অমর উপাদানেরই পরিবর্ত্তনশীল নানারূপ, নানা আকার ফুটাইয়া তুলিতেছে। সুতরাং জগৎ বিশ্ব-মনের একটা মিথ্যা কল্পনা নহে, কিন্তু যাহা মনের অতীত সচেতনভাবে তাহার নিজ রূপবৈচিত্র্যের মধ্যে জন্ম বা আত্মরূপায়ণ। চিন্ময় সত্তারই এক সত্য এই রূপরাজিকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। এই ভাবে প্রকাশিত সত্যের জ্ঞান, যাহাকে অতিমানস ঋতচিৎ* নামে অভিহিত করা যায়, এ সমস্তকে দেহ মন প্রাণের ছাঁচে ঢালিবার পূর্ব্বে এক পূর্ণ সমন্বয় ও সুষমার সত্য ধারণারূপে গড়িয়া তুলিতেছে। মন-প্রাণ-দেহও একটা নিম্নতর চেতনা এবং সেই ঋতচিতের আংশিক প্রকাশ। ইহারা পরিণতির পথে মনের অতীত ক্ষেত্রে যে জ্ঞান নিত্য বর্ত্তমান তাহারই উচ্চতর প্রকাশের

* ঋতচিৎ শব্দটী আমি বেদ হইতে নিয়াছি। ইহার অর্থ সেই চেতনা, সত্তার স্বরূপ সত্য (সত্যম্) তাহার ক্রিয়াশীল সত্তার ছন্দোময় সত্য (ঋতম্) এবং সুবিশাল আত্মসংবিৎ (বৃহৎ) একীভূত হইয়া যে চৈতন্যকে সম্ভব করিয়া তুলে।

ছন্দে গঠিত হইয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেছে। এই নিম্নতর চেতনার পক্ষে মনের অতীত সেই অতিমানসই আদর্শ, তাহাতে পৌঁছিতে, তাহার ভাবে বিভাবিত হইতে, এ চৈতন্য তাহার নিজের বিধানের মধ্য দিয়া সাধনা করিতেছে।

উত্তরণের পথের দৃষ্টি দিয়া আমরা বলিতে পারি যাহা কিছু বর্ত্তমান আছে তাহার পশ্চাতে পরমসত্য রহিয়াছে। অতিমানসের মধ্য ভূমিতে নিজ সত্যের ছন্দসুষমার মধ্যে তাহার আত্মপ্রকাশ হয়; সেই অতিমানস বা বিজ্ঞানই তাহার সচেতন সত্তা হইতে নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাতিভাসিক জগৎ বিচ্ছুরিত করিতেছে। ফলে এই প্রতিভাসের একটা অবশ্যম্ভাবী আকর্ষণ রহিয়াছে তাহার স্বরূপসত্তার দিকে; তাই হয় প্রচণ্ড উৎক্রান্তি দ্বারা অথবা যে অতিমানস হইতে সে জাত হইয়াছে, তাহার মধ্য দিয়া সহজ ও স্বাভাবিকভাবে অগ্রসর হইয়া অবশেষে অখণ্ডরূপে তাহাকে পুনরায় লাভ করিতে সে চেষ্টা করে। মন দিয়া দেখিলে মানসসত্তার সত্য কেন যে অপূর্ণ বোধ হয়, কেন তাহার অতীত পূর্ণতা বা বিজ্ঞানলোকের গোপন ছন্দসুষমার দিকে তাহার সহজাত অভীপ্সা রহিয়াছে এবং কেন বিজ্ঞানময় ভূমিরও অতীত বিশ্বাতীত পরমপুরুষের প্রতি তাহার একটা ঐকান্তিক আকুলতা ও আকূতি আছে, এ সমস্ত ইহাতে বুঝা যায়। আমাদের চেতনার সকল অবস্থা, সমগ্র প্রকৃতি এবং সমস্ত প্রয়োজনের মূলে রহিয়াছে—পরমসত্য, বিজ্ঞান ও প্রতিভাস এই ত্রয়ী। নিখাদ সত্য এবং নিছক প্রতিভাসের দ্বৈতের মধ্যে যে একান্ত বিরোধ আছে, তাহাও এইভাবে দেখিলে নিরাকৃত হয়।

বিশ্বরহস্য নিরূপণের পক্ষে শুধু মনের তত্ত্ব যথেষ্ট নয়। অনন্তচৈতন্যকে প্রথমে অসীম জ্ঞানবৃত্তিরূপে প্রকাশিত হইতে হইবে, আমাদের দিক দিয়া ইহাকে সর্ব্বজ্ঞতা বলে। কিন্তু মন ত জ্ঞানের বৃত্তি বা সর্ব্বজ্ঞতার যন্ত্র নয়, মন জিজ্ঞাসার বা জ্ঞানকে খুঁজিবার বৃত্তি; প্রাতিভাসিক জ্ঞানের যতটুকু সে লাভ করিতে পারে তাহা প্রকাশ এবং কোন কর্ম্মশক্তির অনুকূলে তাহা ব্যবহার করাই তাহার ধর্ম্ম; এমন কি যাহা সে লাভ করে তাহার উপরেও তাহার পূর্ণ প্রভুত্ব থাকে না। স্মৃতির ধনাগারে সে যাহা জমা রাখে তাহা সত্যের কতগুলি চলতি মুদ্রামাত্র, খাঁটি সত্য নহে এবং তাহাই তাহার প্রয়োজনের সময় সে বাহির করিয়া আনে। বস্তুতঃ মন জানে না, জানিতে চায় মাত্র। যাহা সে

জ্ঞানে তাহা দর্পণে দৃষ্ট অস্পষ্ট প্রতিবিম্বের মত, পূর্ণ সত্য নহে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিশেষ কার্য্যের জন্য বিশ্বসত্তার সত্যকে আংশিকভাবে গ্রহণ করিবার শক্তি মাত্র তাহার আছে, যাহা জগৎকে জানে এবং পরিচালনা করে ইহা সে শক্তি নহে, সুতরাং ইহা বিশ্বসৃষ্টি বা বিশ্বপ্রকাশের শক্তি হইতে পারে না।

আমাদের মনের যে সমস্ত সঙ্কীর্ণতা এবং সীমা আছে তাহা হইতে মুক্ত এক অনন্ত মনকে কি বিশ্বস্রষ্টা বলিয়া কল্পনা করা যায় না? কিন্তু এরূপ অনন্ত মন আমরা মনকে যে সংজ্ঞা দ্বারা নির্দ্দেশ করি তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ, তাহা হইবে মনের অতীত কিছু বা অতিমানস সত্য। আমরা যে প্রাকৃত মনকে জানি, তাহার প্রকৃতি রাখিয়া তাহাকে অনন্তগুণিত করিয়া যদি অনন্ত মন কল্পনা করি, তবে তাহা হইতে এক অনন্ত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টিই শুধু হইতে পারে; সেখানে অনিয়ম এবং আকস্মিক ঘটনার বিপুল সংঘাত চলিবে, এমন পরিবর্ত্তন বা পরিণাম আসিবে যাহার থাকিবে না কোন সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য, যাহা হইবে অন্ধকারের মধ্যে উদ্‌ভ্রান্ত আকুলতা লইয়া হাতড়াইয়া বেড়ান। পক্ষান্তরে এক অনন্ত সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিযুক্ত মনকে মন বলা চলে না, তাহাই অতিমানস জ্ঞান।

যে মনকে আমরা জানি তাহা দর্পণের মত সত্যের বা তথ্যের প্রতিরূপ বা ছায়া প্রকাশ করে কিন্তু সে সত্য বা তথ্য তাহার বাহিরে অবস্থিত অথবা অন্ততঃ পক্ষে তদপেক্ষা বৃহত্তর। যে ঘটনা ঘটিয়াছে বা ঘটিতেছে মন প্রতি-মুহূর্ত্তে নিজের মধ্যে তাহার প্রতিরূপ গড়িয়া তুলে। ইহা ছাড়া যাহা ঘটে নাই অথচ ঘটিতে পারে এরূপ সম্ভাবনার প্রতিরূপ গড়িবার শক্তিও মনের আছে। কিন্তু এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, অতীত ও বর্ত্তমানের নিশ্চিত পুনরাবৃত্তি যাহা নয়, ভবিষ্যতে তাহা নিশ্চিত কিভাবে ঘটিবে তাহা সে বলিতে পারে না। যাহা হইয়াছে এবং যাহা হইতে পারে এ দুএর সমন্বয় ও সমাহারে নূতন কোন রূপায়ণ হইবে এ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্‌বাণী দিবার সামর্থ্যও মনের আছে। এখানেও দেখা যায় যে কোন কোন ক্ষেত্রে সে বাণী অল্পবিস্তর সার্থক হয়, আবার কখনও বা একেবারে ব্যর্থ হয় কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায় কল্পনায় সে যেরূপ গড়িয়াছিল বাস্তবে তাহা অন্যরূপে দেখা দিল, যে আশা বা উদ্দেশ্য সে পোষণ করিয়াছিল তৎস্থানে অন্য কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল।

এই প্রকৃতির এক অনন্ত মন যদিই বা দৈবক্রমে এক জগৎ সৃষ্টি করিয়া বসে, তবে তাহা হইবে বিরুদ্ধ সম্ভাবনার সংঘাতে সৃষ্ট অনিয়ত সদাপরিবর্ত্তনশীল, ক্ষণস্থায়ী জগৎ, সর্বদা অনিশ্চয়তার স্রোতে তাহা ভাসিয়া চলিবে, তাহা হইবে এমন, যাহাকে সৎ বলা চলে না অসৎও বলা চলে না। কোন উচ্চতর জ্ঞানময় পরিচালকশক্তি না থাকাতে তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য বা গন্তব্যস্থান থাকিবে না—থাকিবে শুধু ক্ষণিক উদ্দেশ্যের অন্তহীন পরম্পরা যাহার ফলে সে কোন সার্থকতায় পৌছিতে পারিবে না। এরূপ শুদ্ধ ভাবাতিবাদের (noumenalism) ন্যায়শাস্ত্রসম্মত পরিণতি শূন্যবাদ, মায়াবাদ বা তজ্জাতীয় কোন দর্শনে। এ দর্শনে জগৎকে যাহা সে নয় এমন একটা কিছুর অনুভব বা প্রতিবিম্ব বলিয়া বোধ হইবে, আবার তাহা হইবে সর্বদা এবং শেষ পর্য্যন্ত মিথ্যা অনুভব অথবা বিকৃত প্রতিবিম্ব। ইহাতে সমস্ত জগৎ সত্তা হইবে একটা মন যাহা নিজের কল্পনাকে পূর্ণরূপে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য বিপুল কিন্তু বিফল চেষ্টা করিতেছে, কারণ স্বরূপ সত্যের কোন দৃঢ় ভিত্তি তাহার কল্পনার পিছনে নাই, তাহার অতীত শক্তির প্রবাহদ্বারা অভিভূত হইয়া সে চালিত হয় এবং যতদিন পর্য্যন্ত আত্মহত্যা করিতে বা শাশ্বত নৈঃশব্দের মধ্যে ডুবিয়া যাইতে না পারে, ততদিন পর্য্যন্ত সে অনির্দ্দেশ্যভাবে পরিচালিত হইবে অথচ কোন সার্থকতায় পৌছিতে পারিবে না। ইহাই ত মূলতঃ শূন্যবাদ বা মায়াবাদ। যদি মানুষের মনন-শক্তি অথবা তজ্জাতীয় কিছু উচ্চতম বিশ্বশক্তি হয় এবং তাহাই বিশ্ব কল্পনার মূলে রহিয়াছে ইহা ধরা হয় তবে শূন্যবাদ বা মায়াবাদ হইবে আমাদের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার একমাত্র চরম পরিণতি।

কিন্তু যে মুহূর্ত্তে আমরা প্রাকৃত মনঃশক্তি অপেক্ষা উচ্চতর এক মূল জ্ঞানময় শক্তির সাক্ষাৎ পাই তখনই বিশ্বতত্ত্বের এ ধারণা অসম্পূর্ণ এবং অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। এ মতের ভিতরে কিছু সত্য আছে বটে কিন্তু সমগ্র সত্য নাই। আপাতদৃষ্টিতে জগৎকে যাহা দেখা যায় তাহার রীতি বা বিধান ইহা হইতে পারে কিন্তু মূল সত্য বা চরম তত্ত্ব ইহা নহে। কারণ আমরা অনুভব করি মন প্রাণ দেহের ক্রিয়ার পিছনে এমন কিছু আছে যাহা এই শক্তির আলিঙ্গনে ধরা দেয় নাই বরং তাহাই এ প্রবাহকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। সে-কিছু জগতে জাত হয় নাই বা জগতের অর্থ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে

না, পরন্তু তাহাই নিজের সত্তার মধ্যে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে, জগতের সকল তত্ত্ব ও তথ্য সে পূর্ণরূপে জানে। যাহার উপর নিজের কোন প্রভুত্ব নাই এরূপ এক অতীতশক্তির তরঙ্গে অসহায় ভাবে ভাসিয়া চলিবার সময় নিজের মধ্য হইতে নিজ হইতে পৃথক কিছু গড়িবার নিত্য চেষ্টায় সে ব্যাপৃত নয়, পরন্তু তাহার নিজ চৈতন্যে তাহার নিজেরই যে পূর্ণরূপ আছে তাহাই এখানে ক্রমশঃ ফুটাইয়া তুলিতেছে। বস্তুতঃ জগৎ এক পূর্ব্বদৃষ্ট সত্যের প্রকাশ, ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে তাহা পূর্ব্ব হইতে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে এমন এক ইচ্ছা শক্তি দ্বারা ইহা পরিচালিত, ইহার মধ্যে আত্মদৃষ্টিগত এক মূল রূপ ও ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে—এ জগৎ দিব্য সৃষ্টির ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিরূপ।

যতক্ষণ আমরা প্রাকৃত মনের মধ্য দিয়া ক্রিয়া করি, প্রতিভাস দ্বারা পরিচালিত হই, ততক্ষণ সর্ব্বাতীত সর্ব্বাধার অথচ নিত্য সর্ব্বগত এই-কিছুকে আমরা জানি শুধু অনুমানে; কখনও বা আভাসে পাই তাহার অস্তিত্বের অস্পষ্ট অনুভব। সংসারচক্রে পরিণতি ও বৃদ্ধির একটা বিধান দেখিতে পাই, তাহা হইতে অনুমান করি যে কোথাও পূর্ব্বজ্ঞাত সত্যস্বরূপ কিছু আছে তাহাই ক্রমবর্দ্ধমান পূর্ণতাতে ফুটিয়া উঠিতেছে। কারণ সর্ব্বত্রই দেখা যায় আত্মসত্তা ঋত বা বিধানের মূলভিত্তি; যখন আমরা প্রকাশের ধারার মূল সত্যে অনুপ্রবিষ্ট হই তখন দেখিতে পাই যে এক স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানই বিশ্ববিধানরূপে প্রকাশ পাইতেছে। যে সত্তা নিজেকে নিজে প্রকাশ করিতেছে তাহাতেই এজ্ঞান অন্তর্নিহিত ছিল, সত্তার স্বপ্রকাশের শক্তি দ্বারা ইহা উপলক্ষিত হয়। জ্ঞান দ্বাবা পরিণত ও বর্দ্ধিত এই বিধান নির্দ্দেশ করে যে এক দিব্য দৃষ্টির পুরোভাগে যে লক্ষ্য আছে, সেই লক্ষ্যের দিকেই ঋতের প্রগতি। আরও দেখি যে মননের স্রোতে আমরা অসহায় ভাবে ভাসিয়া চলি তাহা হইতে স্ফুরিত হইয়া বিচার বুদ্ধিই সে স্রোতকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চায়। কিন্তু বস্তুতঃ সে বুদ্ধি মনের অতীত এক বৃহত্তর চেতনার বার্ত্তাবহ, প্রতিভূ বা ছায়ামাত্র; সে চেতনাকে বিচার করিয়া জ্ঞান লাভ করিতে হয় না, কেননা সে চেতনা সর্ব্বময়, যাহা কিছু আছে তাহার সকলই সে জানে। ইহা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি বুদ্ধি যাহা হইতে জাত হইয়াছে সেই জ্ঞান বা চেতনাই বিশ্বে ঋত বা বিধান রূপে ক্রিয়া

করিতেছে। এই জ্ঞান নিজেই অকুণ্ঠ ভাবে নিজের বিধান (law) নিরূপিত করে, কারণ কি ছিল, কি আছে এবং কি হইবে ইহার সকল সে জানে—জানে কেননা ইহা নিত্য বর্ত্তমান আছে এবং নিজেকে জানাই ইহার ধর্ম্ম। সৎস্বরূপ যিনি তিনি অনন্তচৈতন্যস্বরূপ, যিনি অনন্তচৈতন্য তিনি সর্ব্বশক্তিমান—তিনি যখন তাহার চেতনার বিষয়রূপে জগৎ সৃষ্টি করেন, অর্থাৎ নিজেকেই এক ছন্দ সুষমায় প্রকাশ করেন, তখন তিনিই জগৎ সত্তারূপে মননের নিকট ধরা দিবার উপযোগী হইয়া উঠেন, এ সত্তা নিজের সত্যকে জানেন এবং যাহা জানেন তাহাই রূপে রূপে ফুটাইয়া তুলেন।

কিন্তু যখন আমরা বিচার বুদ্ধি ছাড়িয়া যেখানে মনের সকল ক্রিয়া থামিয়া যায় আমাদের অন্তরের সেই গভীরে প্রবেশ করি, তখন আমাদের মনের চিরাভ্যস্ত সংস্কার ও সীমার জন্য যতই অসম্পূর্ণ ভাবে হউক না কেন, এই অন্য চেতনার খাঁটি প্রকাশ আমাদের নিকট হইতে পারে। তখন বুদ্ধির ক্ষীণ ও চঞ্চল আলোকে অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত ভাবে যাহার পরিচয় পাইয়াছিলাম এই অবস্থার ক্রমবর্দ্ধমান আলোকে তাহাকে নিশ্চিতরূপে জানিতে পারি। তখন মন ও বুদ্ধির অতীতক্ষেত্রে আত্মজ্যোতির বিশাল আলোকে এই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞাকে সিংহাসনে সমাসীনা দেখিতে পাই।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

অতিমানস—স্রষ্টারূপে

সকল পদার্থই দিব্য জ্ঞানের নিজ মধ্য হইতে পরিস্ফূর্ত্ত রূপ।

বিষ্ণুপুরাণ (২।১২।৩৯)

অতএব সেই স্বপ্রতিষ্ঠ এক এবং বহুত্বের এই প্রবাহের মধ্যে, দুই এর অন্তর্ব্বর্ত্তী শক্তি এবং সত্তা রূপে মনের অতীত ইচ্ছা ও জ্ঞানের এক সক্রিয় তত্ত্ব আছে—সেই তত্ত্বই বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছে। এতত্ত্ব আমাদের একেবারে অনাত্মীয় নয়, ইহা হইতে আমরা যে এক বিচিত্র উপায়ে জন্ম মৃত্যুর এই খেলার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি তাহা নয; যাহা আমাদিগকে বর্জ্জন করিয়াছে এবং যাহাতে ফিরিয়া যাইবার আর কোন উপায় বা সামর্থ্য আমাদের নাই সেরূপ কোন সৎপুরুষ অথবা আমাদের সম্পূর্ণ বিজাতীয় কোন অস্তিত্বের মধ্যে একান্ত ভাবে অবস্থিত সুতরাং আমাদের সহিত যোগাযোগপরিশূন্য তত্ত্ব ইহা নহে। মনে হয় বটে ইহার স্থান আমাদের বহু উচ্চে তথাপি সে উচ্চতা আমাদেব আত্মসত্তারই উচ্চতা এবং সেখানে পৌছান আমাদের পক্ষে অসম্ভব নহে। কেবল অনুমানে বা আভাসেই যে তাহাকে জানিতে পারি এমন নহে। তাহাকে অপরোক্ষ ভাবে অনুভব করিতেও পারি। ক্রমিক আত্মপ্রসারণে অথবা যাহার স্মৃতি অমর হইয়া থাকে, আমাদের জীবনের এমন কোন শুভ মুহূর্ত্তে, আত্মজ্যোতির অতর্কিত উদ্ভাসে, আমাদের সত্তাকে অতিক্রম করিয়া সেই শিখর দেশে আমরা আরোহণ করিতে পারি অথবা সেই বৃহত্তম অতিমানস অনুভবের মধ্যে প্রহরের পর প্রহর, দিনের পর দিন, বাস করিতে পারি। যখন আমরা আবার তথা হইতে অবতরণ করি, তখন সেখানে যাওয়া আসার দরজা সর্ব্বদা খোলা রাখিতে পারি অথবা যদিও সে দরজা সতত বন্ধ হইতে চায় তবু তাহা পুনরায় খুলিবার শক্তি ও উপায় আমরা হারাই না। যে

মানুষ আত্মবিলোপ না চাহিয়া নিজের পরিপূর্ণতম সত্তায় পৌছিতে চায় তাহার পরিণতির শেষ ও উচ্চতম শিখরে সৃষ্ট জীব এবং স্রষ্টা শিবের এই পরমধামে স্থায়ীভাবে বাস করা তাহার জীবনের চরম সার্থকতা। কারণ আমরা দেখিয়াছি ইহাই জগতের মূলীভূত বিজ্ঞান এবং জগতে ক্রমশঃ আত্মবিকাশের ধারা ধরিয়া মানুষ যে চরম সমন্বয় ও সত্যে পুনরায় পৌছিবে তাহাও এই। এখানে পৌছাই তাহার বিধিনির্দ্দিষ্ট বিধান।

তথাপি এই অবস্থার খবর মানুষের মন বা বুদ্ধির নিকট এখন কেহ পৌছাইয়া দিতে পারে কিনা, এরূপ পৌছান আদৌ সম্ভব কিনা, অথবা কোন উপায়ে ইহার দিব্য বীর্য্য মানুষের জ্ঞান ও কর্ম্মে সঞ্চারিত করিয়া তাহাকে উপরে তুলিতে পারা যায় কিনা—এ সন্দেহ জাগে; মানুষের জীবন ও কর্ম্মে এই দিব্য বৃত্তির স্ফুরণ অতি বিরল এবং সন্দেহসঙ্কুল; যাহা যাচাই করিয়া দেখা যায় প্রাকৃত মানুষের সেই অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান হইতে এ বৃত্তির ক্রিয়া বহু দূরে ভিন্ন ভাবে অবস্থিত; এই কারণে সংশয় আসে, তাহা ছাড়া ভগবদ্‌ভাবে বিভাবিত অতিমানস এবং মানুষের প্রাকৃত মনের ধর্ম্ম বা প্রকৃতি এবং ক্রিয়াতে আপাতপ্রতীয়মান বিরোধ অতি প্রবল বলিয়া সংশয় আরও ঘনীভূত হইয়া পড়ে।

একথা ঠিক যে এই চৈতন্যের সঙ্গে মনের কোন সম্বন্ধ বা মনোময় পুরুষের সহিত কোথাও কোন একাত্মতা বা সাযুজ্য যদি না থাকিত, তবে মানুষের কাছে ইহার বিবরণ দেওয়া অসম্ভব হইত, অথবা আপন প্রকৃতিতে ইহা সক্রিয় প্রজ্ঞাশক্তি না হইয়া যদি শুধু প্রজ্ঞা দৃষ্টি মাত্র হইত, তাহা হইলে ইহার সংস্পর্শে আসিয়া মানুষ দিব্য কল্যাণপ্রদ মনের আলোক পাইত বটে কিন্তু সে সংস্পর্শ হইতে জগতে তাহার কর্ম্মের ক্ষেত্রে কোন বৃহত্তর আলোক-রশ্মি পড়িত না বা মহত্তর শক্তিলাভ ঘটিত না। এই চেতনাই জগৎস্রষ্ট্রী বলিয়া ইহা শুধু প্রজ্ঞাময় একটা স্থিতির অবস্থা মাত্র হইতে পারে না, পরন্তু ইহা জ্ঞানময় সক্রিয় শক্তিও বটে, ইহা কর্ম্ম এবং শক্তিরও ইচ্ছাশক্তি, শুধু আলোক এবং দিব্যদৃষ্টির নয়। মধ্যবর্ত্তিনী এই পরাচেতনার বা এই আদ্যাশক্তির আত্মসঙ্কোচনী ক্রিয়ার ফলে ইহারই মধ্য হইতে জাত হইয়াছে বলিয়া, বিপরীত ধারা ধরিয়া আত্মপ্রসারণ দ্বারা মন আবার ফিরিয়া গিয়া

ঐ চেতনাতে সম্মিলিত হইতে পারে। কারণ বাহ্য আকারে এবং ক্রিয়া পদ্ধতিতে যতই বিভিন্ন এমন কি বিপরীত বোধ হউক না কেন, স্বরূপে সে সতত অতিমানসের সহিত এক এবং তাহার মধ্যে অতিমানস, সম্ভাবনারূপে সদা বর্ত্তমান আছে। তাই বুদ্ধির দিক হইতে কোথায় মিল আছে এবং কোথায় নাই, তাহারই ভাষায় তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া অতিমানসের কিছু ধারণা করিতে চেষ্টা করা অযৌক্তিক বা নিরর্থক নহে। যে ভাবে ও ভাষায় বিবৃতি দেওয়া হইবে তাহা অপর্য্যাপ্ত হইতে বাধ্য, তথাপি যে পথে হয়ত আমাদিগকে চলিতে হইবে, অন্ততঃ পক্ষে তাহার কিছুদূর পর্য্যন্ত তাহার জ্যোতির্ম্ময় অঙ্গুলিসঙ্কেতে আমাদিগকে দেখাইয়া দিতে পারে। তাহা ছাড়া, মন কখনও কখনও চৈতন্যের এমন উচ্চভূমিতে উঠিতে পারে যেখানে অতিমানস-চেতনার কিছু আলোক পড়ে, কিছু শক্তি প্রকাশ পায়—সেই আলোক পাইয়া, বোধি দ্বারা অথবা সাক্ষাৎ স্পর্শ ও অভিজ্ঞতা দ্বারা অতিমানসের কিছু জ্ঞান তাহার অধিগত হইতে পারে; কিন্তু অতিমানসে স্থিত হইয়া তাহার আলোকে দেখা বা তাহার শক্তিতে কাজ করা যে পরম বিজয় বা সিদ্ধি, তাহা লাভ করা মানুষের পক্ষে আজিও সম্ভব হয় নাই।

এই যে প্রজ্ঞার ভূমি আমরা আজিও সম্যক্ আবিষ্কার করিতে পারি নাই, ইহার সম্বন্ধে কোন্ আলোক বা কোন খবর অতীতকালের কোথাও পাওয়া পাওয়া যায় কিনা ইহা আমরা জানিতে চাহিতে পারি। এ ভূমির একটা নাম আমরা চাই, এমন একটা অবস্থা চাই যেখান হইতে ইহাকে খুঁজিবার পথে আমরা যাত্রারম্ভ করিতে পারি। চৈতন্যের এই অবস্থাকে আমরা অতিমানস নামে অভিহিত করিয়াছি; কিন্তু শব্দটা দ্ব্যর্থ-বোধক, ইহার এক অর্থ হইতে পারে প্রাকৃত মনেরই অতিবর্দ্ধিত সংস্করণ, সাধারণ মন হইতে তাহা অনেক উপরে উঠিয়াছে বটে কিন্তু তাহার কোন আমূল পরিবর্ত্তন হয় নাই; আর এক অর্থ হয় এই যে ইহা প্রাকৃত মনের অতীত যাহা কিছু তাহার সব; তখন অর্থের অতিব্যাপ্তিতে অনির্ব্বচনীয় পরমতত্ত্বও ইহার মধ্যে আসিয়া পড়ে, তাই খাঁটিভাবে অর্থ-নির্দ্দেশ করিবার জন্য, প্রত্যক্ষ বিবরণ দিতে না পারিলেও, গৌণ ভাবে ইহার কিছু বিবৃতি দেওয়া প্রয়োজন।

গূঢ়ার্থপূর্ণ বৈদিকমন্ত্র এখানে আমাদিগকে সহায়তা করে, বেদে দিব্য অমর অতিমানসের বার্ত্তা আছে যদিও প্রচ্ছন্নভাবে, তথাপি সে আবরণের অন্তরাল

হইতে বিদ্যুৎঝলকের মত তাহার আলোকরশ্মির সাক্ষাৎ মিলিতে পারে ; এই সমস্ত বাণীর মধ্যে আমাদের প্রাকৃত চিদাকাশের ওপারে বৃহৎ প্রসাররূপে অতি-মানসের একটা ধারণা রহিয়াছে দেখিতে পাই ; অতিমানসে সত্তার সত্য এবং যাহা কিছু সে সত্যকে প্রকাশ করে তাহা পরম জ্ঞানজ্যোতির মধ্যে এক হইয়া আছে ; ইহাই সকল দৃষ্টির, রূপায়ণের বিধি ব্যবস্থার, সকল বাক্, ক্রিয়া এবং গতির সত্যতা অনিবার্য্যরূপে নির্দ্দিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত করে, সুতরাং গতির ক্রিয়ার প্রকাশের ফল এবং অমোঘ নিয়ম বা বিধানকেও নিশ্চিতরূপে নিয়ন্ত্রিত করে। বৃহৎ সর্ব্বব্যাপিত্ব, আর সেই বৃহতের মধ্যে অস্পষ্ট বিশৃঙ্খলা (chaos) বা আত্মহারা অন্ধকার নয়, পরন্তু জ্যোতির্ম্ময় সত্য ও ছন্দসুষমা, বিধির ও ক্রিয়ার সত্য এবং সেই জ্ঞান যাহা সত্তার সুসমঞ্জস সত্যের প্রকাশ—ইহাই অতিমানস সম্বন্ধে বৈদিক বিবৃতির মূল কথা কয়েকটি। দেবতারা তাহাদের উচ্চতম গোপন সত্তায় এই অতিমানসের শক্তি ; ইহা হইতে জাত, ইহার মধ্যে 'স্বেদমে' বা নিজ গৃহেই তাহারা অবস্থিত,—জ্ঞানে তাহারা 'ঋত চিন্ময়' বা সত্যস্বরূপ চৈতন্য ; কর্ম্মে তাহারা "কবিক্রতু" বা দিব্য দর্শনের সঙ্কল্প শক্তি। ক্রিয়া এবং সৃষ্টির দিকে প্রযুক্ত ইহাদের সচেতন শক্তিকে এক পূর্ণ এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞান ধারণ এবং পরিচালন করে, যে জ্ঞানে যাহা করিতে হইবে তাহা, তাহার মূল এবং বিধান, সমস্তই প্রকাশিত আছে ; এ জ্ঞান পূর্ণরূপে কার্যকরী এক সঙ্কল্পশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে, যে সঙ্কল্প তাহার বিধান বা পদ্ধতি অথবা তাহার ফলে পৌছিবার পথে কখনও বিপথগামী হয় না, ইতস্ততঃ করে না বা টলে না পরন্তু তাহার দিব্যদৃষ্টিতে যে ভবিষ্যরূপ ফুটিয়াছে তাহা স্বাভাবিক ও অব্যাহত ভাবে ক্রিয়ার মধ্য দিয়া রূপায়িত ও পরিপূর্ণ করিয়া তোলে। এখানে আলোক এবং শক্তি, জ্ঞানের স্পন্দ বা সঙ্কল্পের ছন্দ, ধ্রুবসিদ্ধির নিশ্চয়তা লইয়া পূর্ণরূপে এক হইয়া আছে, এ মিলন চাহিতে হয় নাই, আয়াস করিয়া খুঁজিয়া বাহির করিতেও হয় নাই, পরন্তু নিত্য বর্ত্তমান। এ দিব্য প্রকৃতিতে আছে দুইটী শক্তি বা ছন্দ,—একটী স্বতঃস্ফূর্ত্ত আত্মরূপায়ণ এবং আত্মবিন্যাস যাহা বিসৃষ্টির স্বরূপ সত্তা হইতে স্বাভাবিক ভাবে উৎসারিত হইতেছে এবং যাহা তাহার মধ্যস্থ মূল সত্যকে প্রকাশ করিতেছে, অপরটী বিসৃষ্টিতে অন্তর্গূঢ় ভাবে অবস্থিত আত্মশক্তি, যাহার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত এবং অপরিহার্য্য রূপে আত্মনিয়ন্ত্রণের মূল রহিয়াছে।

বেদে ইহা ছাড়া আনুষঙ্গিক অথচ প্রয়োজনীয় বিবরণও কিছু আছে। ঋষিরা 'ঋত চিন্ময়' আত্মার দুইটী মুখ্য বৃত্তির বর্ণনা দিয়াছেন, এ দুইটীর নাম 'চক্ষুঃ' এবং 'শ্রবঃ', দর্শন এবং শ্রবণ ; ইহারা স্বাভাবিক জ্ঞান-স্বরূপ অতিমানসের সাক্ষাৎ ক্রিয়া, যাহাকে সত্য বা দিব্য দর্শন এবং সত্যশ্রবণ নামে অভিহিত করা যায়, সুদূর হইতে ইহাদেরই ছায়া আসিয়া যখন প্রাকৃত মনের উপর পড়ে তখন তাহারা সাক্ষাৎপ্রকাশ (revelation) এবং সাক্ষাৎপ্রেরণা (inspiration) নামক বৃত্তিরূপে দেখা দেয়। ইহা ছাড়া মনে হয় বেদে অতিমানসের দুই ভাবের ক্রিয়াকে একটু পৃথক করিয়া দেখা হইয়াছে যাহাদের একটীর নাম সংজ্ঞান অপরটীর প্রজ্ঞান ; সংজ্ঞান (comprehending consciousness) সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বগত চেতনা, আমাদের মধ্যে যে ভাব বিষয়ী বা জ্ঞাতারূপে বর্ত্তমান, সে নিজের সঙ্গে যাহাকে পূর্ণরূপে এক করিয়া দেখে তাহার সম্বন্ধে তাহার জ্ঞানের ধারা যেরূপ, এ চেতনা কতকটা তদনুরূপ ; অপর পক্ষে প্রজ্ঞানচেতনা (apprehending consciousness) যেন নিজের মধ্য হইতেই বিষয় বা বস্তুকে বাহির করিয়া নিজের সম্মুখে রাখিয়া দেখে, ইহা হইতেই আমাদের জ্ঞেয়রূপী বস্তু-জ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। অতিমানসকে বুঝিবার পক্ষে এসমস্ত বৈদিক ইঙ্গিত বা সঙ্কেত ; আমরা এই প্রাচীন অভিজ্ঞতা হইতে 'ঋত-চিৎ' কথাটা অতিমানসের প্রতিশব্দ রূপে গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে অতিমানস শব্দে যে অতিব্যাপ্তি আছে তাহা নিবারিত হইবে।

যাহার বিশেষত্বের এইরূপ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে সেই অতিমানস চৈতন্য একদিকে তাহার উপরের এবং অন্যদিকে নীচের তত্ত্বের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। স্পষ্টতঃ ইহাকে সংযোগসূত্র এবং উপায়রূপে গ্রহণ করিয়া উচ্চতর তত্ত্ব নিম্নতর রূপে অবতরণ করিয়াছে এবং আবার ইহাকেই যোগসূত্র এবং সাধনরূপে গ্রহণ করিয়া এই অবর তত্ত্বকে তাহার উৎপত্তিস্থানে পুনরায় ফিরিয়া যাইতে হইবে। একদিকে উপরের তত্ত্ব শুদ্ধ সচ্চিদানন্দের এক অবিভাজ্য অখণ্ড চৈতন্য, সেখানে ভেদ ভাবের কিছু নাই, অন্যদিকে নিম্নের তত্ত্ব, মনের বিশ্লেষণ ও বিভজনশীল চেতনা—পৃথক না করিয়া ভেদ-দর্শন না করিয়া তাহা কিছু জানিতে পারে না, তাহা বড় জোর একত্ব এবং অনন্তত্বের একটা অস্পষ্ট এবং গৌণ আভাস বা অনুভূতি মাত্র পাইতে পারে, কেন না ইহা যদিও খণ্ড অংশগুলিকে জোড়া দিতে

পারে, কিন্তু কখনই অখণ্ডের পূর্ণ এবং খাঁটি অনুভব লাভ করিতে পারে না। এ দুয়ের মধ্যে সেতুরূপে বিদ্যমানা সেই সর্ব্বগতা এবং সৃষ্টিশীলা অতিমানসচেতনা; তাহার সর্ব্বব্যাপী সংজ্ঞানের দিক দিয়া দেখিলে বলিতে হয়, ইহা ব্রহ্মের সেই ভাবের কন্যা যে ভাবে তিনি অদ্বয় অখণ্ড আত্মজ্ঞানময়, আবার তাহার যে শক্তি নিজের বাহিরে বা নিজের সম্মুখে রাখিয়া দেখে সেই প্রজ্ঞানের দিক দিয়া দেখিলে বলা যায়, যে ইহা ভেদের মধ্যে বহুত্বের যে বোধ ফুটিয়া উঠে, যাহা মনোময় জ্ঞানের প্রকাশপদ্ধতি, তাহার জননী।

ঊর্দ্ধে আছে শাশ্বত অচল অপরিণামী এক অদ্বয় তত্ত্ব, নিম্নে আছে সতত পরিবর্ত্তনশীল বহু, যাহা এই প্রবাহের মধ্যে স্থির পরিণামরহিত একটা দাঁড়াইবার স্থান খুঁজিতেছে কিন্তু লাভ করিতে পারিতেছে না। আর এ দুইএর মাঝে আছে একটা ভূমি, যাহা সকল ত্রয়ীর আবাসস্থান, সকল দ্বয়ীর আলয়, যেখানে একের মধ্যে বহু হইয়াও বহুর মধ্যে এক সদা বর্ত্তমান, কেননা যাহা গোড়ায় এক তাহার মধ্যে বহু সম্ভাবনারূপে চিরবর্ত্তমান আছে। মধ্যবর্ত্তী এই তত্ত্ব সকল সৃষ্টি এবং ঋতায়ণের আদি ও অন্ত, ইহা প্রকাশের প্রথমবর্ণ অ এবং শেষ বর্ণ ক্ষ, একদিকে সকল ভেদের উৎপত্তিস্থান, অন্যদিকে সকল ঐক্যের পরম সাধন, যাহা হইয়াছে এবং যাহা হইবে সেই সকলের সমন্বয় ও সুষমার উৎস, কার্য্যকরী শক্তি এবং চরমসিদ্ধি। ইহার মধ্যে আছে একের জ্ঞান, কিন্তু সেই এক হইতে তাহার মধ্যে সম্ভাবনারূপে যে বহুত্ব লুক্কায়িত আছে তাহা টানিয়া বাহির করিবার সামর্থ্যও ইহার আছে। ইহা বহুত্বকে প্রকাশ করে কিন্তু তাহার মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়া একত্বকে কখনও ভুলে না। ইহার অস্তিত্ব আমাদিগকে এমন কিছুর দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করে যাহা অনির্ব্বচনীয় একত্বের যে পরম প্রত্যয় এবং অনুভূতি আমরা পাইতে পারি, তাহারও পরপারে স্থিত। সে-কিছু আমাদের মনঃকল্পিত এই সকল সূত্র হইতে মুক্ত এমন কি একত্ব ও বহুত্বের দ্বৈতভাবেরও পরপারে স্থিত বলিয়াই অবর্ণনীয় এবং মনের অগম্য, তাহার একত্ব এবং অখণ্ডতার জন্য নয়। তাহা সেই চরম ও পরম সত্য যাহা সর্ব্বাতীত হইয়াও আমাদের কাছে ঈশ্বর জ্ঞান এবং জগৎজ্ঞান এ উভয়কে সমর্থন করে।

এ সমস্ত বিশাল তত্ত্বের ধারণা করা কঠিন, তাই আরও স্পষ্ট করিবার

চেষ্টা করা যাউক। অদ্বৈত তত্ত্বকে আমরা সচ্চিদানন্দনামে অভিহিত করি। কিন্তু ইহার বিবরণের মধ্যেই আমরা তিনটি সৎবস্তুকে ধরিয়া লই এবং তাহাদিগকে মিলাইয়া পাই এই ত্রয়ী। আমরা বলি সৎ, চিৎ, আনন্দ তাহার পর বলি এই তিনটি এক। এই ধরণেই মনের ক্রিয়া চলে। কিন্তু অদ্বৈত চেতনায় এ ধারণা চলেনা। সৎই চৈতন্য ইহাদের মধ্যে কোন ভেদ থাকিতে পারে না। তেমনি চৈতন্যই আনন্দ, এই দুইয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই। সচ্চিদানন্দে এই ভাবের স্বগতভেদ পর্য্যন্ত না থাকাতে তাহাতে জগৎ থাকিতে পারে না। ইহাই যদি একমাত্র সত্য হয় তবে জগৎ নাই, কখনও ছিলনা, তাহার কল্পনাও কখনো সম্ভব হইতে পারে না। কারণ অখণ্ড-চৈতন্য অবিভাজ্য, ভেদ বা খণ্ড ভাবের উৎপত্তি তাহা হইতে হইতে পারে না। আমরা এবার এক অসঙ্গতিতে বা অসম্ভব সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌছিলাম। যদি অসম্ভব স্ববিরোধী উক্তি এবং অমীমাংসিত বিরোধের উপর সব কিছুর ভিত্তিস্থাপন করিয়া তৃপ্ত থাকিতে না চাই, তবে এ সিদ্ধান্ত আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

পক্ষান্তরে মন খণ্ডকেই সত্য বলিয়া স্পষ্টরূপে ধরিতে পারে। খণ্ড সমূহকে জোড়া দিয়া সে সমগ্রের একটা ধারণা গড়িতে অথবা সান্তের অসীম প্রসারের কল্পনা করিতে পারে। খণ্ড পদার্থের সমাহার এবং তাহাদের মধ্যের সাদৃশ্যও সে ধরিতে পারে কিন্তু চরম একত্ব বা পরম আনন্ত্য তাহার নিকট বস্তু-নিরপেক্ষ ধারণা মাত্র; তাহার আয়ত্তের বাহিরে সুতরাং সত্যরূপে সে ধরিতে পারে না, ইহাকে একমাত্র সত্য বলিয়া কল্পনাও করিতে পারে না। সুতরাং ইহা অখণ্ড চৈতন্যের ঠিক বিপরীত তত্ত্ব। আমরা এখানে দেখি মৌলিক অবিভাজ্য একত্বের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এক মৌলিক বহুত্ব, যাহা নিজের বিলোপ সাধন না করিয়া কিছুতেই একত্বে পৌছিতে পারে না—পৌছিতে গেলেই তাহাকে মানিতে হয় যে সত্যিকার অস্তিত্ব তাহার কোন কালে ছিল না। অথচ ইহার অস্তিত্ব ছিল, কারণ ইহাই একত্ব দর্শন করিয়াছে এবং নিজেকে লয় করিয়া দিয়াছে। আমরা আবার একটা ভীষণ স্ববিরোধী উক্তি বা অসম্ভব সিদ্ধান্তে পৌছিলাম, যে উক্তি মনকে মূর্চ্ছিত করিয়া তাহার বোধ-শক্তিকে জাগাইতে চায়; যাহাতে অনপনেয় যে বিরোধ ছিল তাহা অনপনীতই থাকিয়া যায়।

নিম্নতর তত্ত্বের সমস্যা সমাধান হয় যদি আমরা বুঝিতে পারি যে মন চেতনার উদ্যোগপর্ব্ব শুধু। মন বিশ্লেষণ এবং সংশ্লেষণের (analysis and synthesis) যন্ত্র, স্বরূপ জ্ঞানের নয়। অবিজ্ঞেয়ের কিছুটা অস্পষ্ট ভাবে কাটিয়া লইয়া সেই পরিমিত সসীম অংশটুকুকে পূর্ণ করিয়া ধরা, তাহাকে পৃথক ভাবে মননের বিষয় করা এবং এই সমগ্রকে পুনরায় অংশে ভাগ করিয়া দেখা—এই হইল মনের কাজ। মন অংশ এবং আনুষঙ্গিক গুণ বা আগন্তুক ধর্ম্ম (accident) মাত্র দেখিতে পায় এবং তাহার নিজস্ব ধরণে জানিতে পারে। অংশগুলির সমাহার অথবা তাহাদের ধর্ম্মও আনুষঙ্গিক বা আগন্তুক গুণের সমষ্টি—এইটুকু তাহার অখণ্ড সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা। কোন কিছুর খণ্ডরূপে বা নিজের মধ্যস্থিত অংশ, ধর্ম্ম বা আকস্মিক গুণের সমাহার বলিয়া অখণ্ডকে না দেখিয়া সমগ্রকে যে জানা, তাহা মনের কাছে অস্পষ্ট অনুভব ছাড়া আর কিছু নয়। বিশ্লেষণ করিয়া একটী বৃহত্তর বস্তুর মধ্যে স্থিত একটী বস্তুরূপে কোন কিছুকে পৃথকভাবে যখন দেখিতে পারে তখনই মন বলিতে পারে—'ইহা এখন আমি জানি'; কিন্তু বস্তুতঃ ইহা জানে নাই; মন বস্তু সম্বন্ধে নিজের বিশ্লেষণের খবর শুধু রাখে এবং তাহার সম্বন্ধে যে ধারণা করে, তাহা যে বিভিন্ন অংশ এবং ধর্ম্ম সে দেখিয়াছে তাহার সমাহার মাত্র। মনের বিশিষ্ট শক্তি, নিশ্চিত ক্রিয়া এই পর্য্যন্ত আসিয়া শেষ হইয়া যায়। যদি বৃহত্তর গভীরতর এবং সত্য জ্ঞান চাই, একটা তীব্র কিন্তু আকারহীন ভাবাবেশ যাহা কখন কখন মনের গভীর এবং অব্যক্ত প্রদেশে দেখা দেয়, তাহা লইয়া যদি তৃপ্ত থাকিতে না চাই, তবে মনের স্থানে আমাদিগকে এমন এক বৃহত্তর চেতনাকে বসাইতে হইবে, যাহা মনকে অতিক্রম করিয়া গিয়াই তাহাকে পূর্ণ করিয়া তুলিবে অথবা উল্লঙ্ঘন করিয়া গিয়া মনকে নূতনভাবে গড়িবে এবং তাহার ক্রিয়ার শুদ্ধি সাধন করিবে। মানসিক জ্ঞানের শিখরদেশ হইতেছে সেই স্থান যেখান হইতে এই লম্ফ দিতে হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত বৃহত্তর জ্যোতি গ্রহণ বা ধারণ এবং উচ্চতর স্থানে আরোহণের উপযুক্ত না হয় ততদিন পর্য্যন্ত জড়ের অন্ধ কারা হইতে মুক্ত চেতনাকে শিক্ষা দেওয়া, ইহার মূঢ়-প্রবৃত্তি, সহজাত-সংস্কার, অনিয়ত বোধি এবং অনুভবের অস্পষ্টতাকে আলোকিত করা—ইহাই মনের চরম সাধনা। মনের মধ্য দিয়া মানুষের পথ কিন্তু মন শেষ গম্যস্থান নহে।

পক্ষান্তরে অদ্বৈত চেতনা বা অবিভাজ্য সেই একত্ব, যাহার ভিতরে কিছু নাই—অথচ যাহা হইতে সকল পদার্থ, সকল সত্ত্বা বা রূপ বাহির হইয়া আসিয়াছে এবং এই সমস্ত পুনরায় যখন তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইবে তখন সকল নাশ হইয়া যাইবে—এমন অসম্ভব কিছু হইতে পারে না। পরন্তু ইহা একটা মৌলিক আত্মসংহরণ যাহার মধ্যে সব কিছুই আছে কিন্তু দেশে ও কালে তাহাদের যেরূপ প্রকাশ হয় সেভাবে নাই—অন্তভাবে। যাহা এই ভাবে আত্মসংহরণ (self-concentration) করিয়াছে তাহা একেবারে অবর্ণনীয় অচিন্তনীয় সত্তা, শূন্যবাদীর মনে যাহার প্রতিমূর্ত্তি উদ্ভাসিত হয় এক পরম শূন্যরূপে যেখানে আমরা বা আমাদের জ্ঞান কিছুই নাই। তুরীয়বাদী ঠিক অনুরূপ যুক্তি দিয়া ইহাকেই আমাদের বা আমাদের জ্ঞানের সর্ব্বাধার ও পরমাশ্রয়রূপী অথচ ভেদ-ভাব পরিশূন্য পরম ইতি রূপে দেখিতে পারে। বেদান্তে আছে 'অগ্রে এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ ছিলেন' ; অগ্র বলিয়া এখানে যে কালবিন্দুর নির্দ্দেশ আছে তাহার পূর্ব্বে এবং পরে, এই মুহূর্ত্তে, নিত্যকালে এবং কালের অতীত অবস্থায় যাহা আছে তাহাকে আমরা এক বলিয়াও বর্ণনা করিতে পারি না—যখন তাহা ছাড়া আর কিছু নাই তখনও। ইহার যে আদিম আত্ম-ঘনীভূত ভাব আমরা চেতনায় প্রথম ধারণা করিতে পারি, তাহা আমরা অখণ্ড অদ্বৈতরূপে অনুভব করিতে চেষ্টা করি। দ্বিতীয়তঃ অনুভব করি সেই একত্বের মধ্যে যাহা ছিল তাহাই যেন বিচ্ছুরিত হইতেছে, মনে হয় যেন ভাঙ্গিয়া চূর্ণীকৃত হইয়া পড়িতেছে, যাহার ধারণা বিশ্ব বা জগৎরূপে মনের মধ্যে জাগিতেছে। তৃতীয়তঃ দেখিতে পাই সেই সত্তা দৃঢ়ভাবে আত্মপ্রসারণ করিতেছে ঋতচিৎরূপে, যাহা বিকিরণের আধার ও আশ্রয় রূপে থাকিয়া চূর্ণ ভাবকে বাস্তব খণ্ডতায় পর্য্যবসিত হইতে দিতেছে না, অনন্ত বৈচিত্র্য এবং বহুত্বকে একের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়াছে, অতি-পরিবর্ত্তনে বা বিপুল চাঞ্চল্যের মধ্যে রহিয়াছে স্থির, অবিচল, বিশ্বব্যাপী, আপাত-সংঘাত ও সংঘর্ষের মধ্যে রক্ষা করিতেছে ছন্দসুষমা, যেখানে মন আকার দেওয়ার নিয়ত চেষ্টা সত্ত্বেও এক মহাবিশৃঙ্খলা বা নির্ঋতিতে (chaos) পৌঁছিত, সেখানে ইহা ফুটাইয়া তুলিয়াছে, চিরস্থায়ী এক বিশ্ব। ইহারই নাম অতিমানস, ঋতচিৎ বা সত্য-বিজ্ঞান, যাহা নিজেকে এবং নিজে যাহা হইয়া উঠে তাহা জানে।

অতিমানস ব্রহ্মের বিশাল আত্মপ্রসারণ, যাহার মধ্যে সব আছে এবং যাহা সবকে ফুটাইয়া তোলে। নিজের বিজ্ঞান-শক্তির অবিভাজ্য পরম অদ্বয় তত্ত্বকে সত্তা, চৈতন্য এবং আনন্দের ত্রৈক রূপে প্রকাশ করে, ইহা স্বগত ভেদ বা বিভেদ জাগায় বটে—কিন্তু বিভাগ করেনা। মনের মত তিন হইতে সে একে পৌছিতে চেষ্টা করে না, এক হইতেই তিনকে প্রকাশ করে, কারণ প্রকাশ করা বা ফুটাইয়া তোলাই ইহার ধর্ম্ম, তথাপি ফুটাইতে গিয়াও তিনকে একের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত রাখে, কারণ ইহা সত্য-জ্ঞানময় এবং সকল প্রকাশ নিজের মধ্যে ধারণ করিয়া রাখে। এই তিন বিভাবের কোন একটীকে কার্য্যসাধক দেবতা রূপে সম্মুখভাগে নিয়া আসে বটে কিন্তু সেই বিভাবের মধ্যে অন্য বিভাব দুইটী গুপ্ত বা ব্যক্ত থাকে। এই রীতিতেই সে সর্ব্বের উপাদানভূত ত্রিতত্ত্ব হইতে সকল তত্ত্ব, সকল সম্ভাবনা ফুটাইয়া তোলে। ইহার উপচয় বা বৃদ্ধি, বিবৃতি বা পরিণাম, স্ফুরণ বা প্রকাশ করিবার সামর্থ্য যেমন আছে, তেমনি অন্যদিকে আছে আচ্ছাদন বা সঙ্কোচ, সংবৃতি বা গোপন, সংরক্ষণ বা গুটাইয়া আনিবার শক্তি। এক অর্থে সমস্ত সৃষ্টি, দুইটী সংবৃতির (involution) মধ্যে যেন একটী ছন্দ-দোলা। ইহার এক দিকে রহিয়াছে চৈতন্য, যাহার মধ্যে-সব সংবৃত হইয়া আছে এবং যাহা হইতে সর্ব্বের বিবৃতির (evolution) একটা দোলা চলিয়াছে নিচের দিকে, অপর প্রান্তস্থিত জড়ের দিকে; আবার জড়ের মধ্যে সবকিছু আছে সংবৃত হইয়া, সেখান হইতে সর্ব্বের আর একটা উর্দ্ধমুখী বিবৃতির দোলা চলিয়াছে চৈতন্যের অভিমুখে।

বিশ্বসৃষ্টিতে এই বিভাজন প্রক্রিয়া দ্বারা নানা তত্ত্ব, শক্তি এবং আকার ফুটাইয়া তোলা ঋতচিতের কার্য্যের রীতি, কিন্তু অতিমানসের সংজ্ঞানশক্তি এই সমস্তের মধ্যে এতদতিরিক্ত সমস্ত সত্তা দেখিতে পায় এবং প্রজ্ঞানশক্তি ইহাদের বিশিষ্ট প্রকাশকে সম্মুখে রাখিয়া সমগ্র সত্তাকে প্রচ্ছন্ন অথচ বোধগম্য রাখে। এই জন্য প্রত্যেকের মধ্যে সর্ব্ব এবং সর্ব্বের মধ্যে প্রত্যেক বিদ্যমান থাকে। তাই পদার্থের প্রতি বীজে গুপ্তভাবে অনন্ত বিচিত্র সম্ভাবনা নিহিত আছে কিন্তু ঋতসংকল্প বা চিন্ময় পুরুষের জ্ঞানশক্তি দ্বারা তাহা এক বিশেষ ছন্দে ও এক বিশেষ পরিণামের দিকে চলে, এই পুরুষই আত্মপ্রকাশ করিতেছেন বা তাহার মধ্যস্থিত এই ঋতচিৎকে নিশ্চিতরূপে অনুভব করিয়া তাহা দ্বারা

তাহার ক্রিয়া এবং রূপায়ণ যে পথে চলিবে তাহা পূর্ব্ব হইতে নির্ণয় করিতেছেন। পরম সৎ নিজের মধ্যে নিজ সত্তার যে সত্যের প্রতি দৃষ্টি করেন তাহাই বীজ; আত্মদৃষ্টিজাত সেই বীজের পরিণাম রূপে তাহার আত্মক্রিয়া বা বীজ হইতে স্ফুরণ, রূপায়ণ, পুষ্টি ও প্রবৃত্তির (functioning) স্বাভাবিক বিধান প্রকাশ পায়; এই প্রকাশ সেই আত্মদৃষ্টি অনুসারে নিশ্চিত ভাবে চলে এবং সেই মূল সত্যে যে রীতি বা পদ্ধতি সংবৃত হইয়া ছিল সেই রীতিতে চলিবার পথ হইতে ভ্রষ্ট হয় না। তাহা হইলে এই দাঁড়াইল যে চিন্ময় পুরুষ নিজের মধ্যের এক সত্যকে ঈক্ষণ করিয়া তাহাতে যেন আত্মসমাহিত হইয়া যান এবং সেই দিব্যদর্শনের সঙ্গে যুক্ত সঙ্কল্পশক্তি বা কবিক্রতু বা চিৎশক্তি বা সমগ্র প্রকৃতি সেই দৃষ্ট সত্যকে অনিবার্য্যরূপে শক্তি এবং রূপের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য ক্রিয়াশীল হয়।

এই বিবৃতি হইতে আমাদের মানসচেতনা এবং ঋতচিতের মধ্যে মৌলিক বিভেদ কোথায় তাহা বুঝিতে পারি। আমরা চিন্তাকে দেখি সত্তা হইতে পৃথক, বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন, সত্য হইতে বিভিন্ন অবাস্তব কিছু বলিয়া, কোথা হইতে তাহা আসে তাহা কেহ জানে না; তাহা পর্য্যবেক্ষণ, বোধ বা অবধারণ এবং বিচার করিবার জন্য বস্তু বা বিষয় হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লয়। সব কিছুকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যে মনের স্বভাব, তাহার কাছে মননটা এইরূপ বোধ হয়। মনের প্রথম কাজই পৃথক করা, নির্দ্ধারণ অপেক্ষা বিভাজনের দিকেই তাহার ঝোঁক বেশী; তাই বস্তুর সত্য এবং বস্তুর ধারণার মধ্যে এত ভেদ দেখা যায়। কিন্তু অতিমানসে সমস্ত সত্তা চিন্ময়, সমস্ত চেতনা সত্তারই চেতনা; চেতনার স্পন্দন তাহার গর্ভে ধারণ করে যে ভাব বা বিজ্ঞান, তাহা আবার নিজের গর্ভে নিজেকে ধারণ করে যে সত্তা তাহারই স্পন্দন; সৃষ্টি বিমুখ নিক্রিয় অবস্থায় আত্মসংবিদের মধ্যে যাহা ঘনীভূত হইয়া অব্যক্ত অবস্থায় ছিল সক্রিয় আত্মজ্ঞানের আকারে ইহা তাহারই বহির্গমন; সৎ বা সত্যই এইভাবে বিজ্ঞান রূপে আত্মপ্রকাশ করে, বিজ্ঞানের এই সত্যই নিজ শক্তি এবং চৈতন্য সহযোগে সর্ব্বদা এইভাবে পরিণতি প্রাপ্ত হয়; ইহা সর্ব্বদা আত্মসচেতন, নিজের অন্তর্নিহিত আত্মসঙ্কল্পের শক্তি বলেই তাহার এই আত্মরূপায়ণ বা তাহার প্রতি প্রেরণার মজ্জাগত জ্ঞান সহযোগে তাহার এই আত্মোপলব্ধি। সকল বিসৃষ্টির, সকল পরিণামের ইহাই মূল সত্য।

মনের কাছে সত্তা, জ্ঞানাত্মকচেতনা আর সঙ্কল্পাত্মকচেতনা যেমন পৃথকভূত বলিয়া মনে হয় অতিমানসে তেমন নয়। তাহারা ত্রৈক বা ত্রয়ী, একই গতি বা স্পন্দনের তিনটী কার্য্যকরী বিভাব মাত্র। অবশ্য ইহাদের প্রত্যেকের পরিণতির বিশিষ্ট ধারা আছে। সত্তার পরিণাম হয় বস্তুরূপে; চৈতন্যের বিবর্ত্তনে দেখা দেয় আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং আত্মরূপায়ণের জ্ঞান—সংজ্ঞান ও প্রজ্ঞান; সঙ্কল্পের পরিণতিতে আসিয়া পড়ে আত্মসার্থক শক্তি ও সংবেগ। আত্ম জ্যোতিতে আলোকিত সৎস্বরূপের প্রকাশকেই ভাব বা বিজ্ঞান বলা যায়। ইহা মনের চিন্তা বা কল্পনা নহে। ইহা কার্য্যসাধক বা ফলপ্রসূ আত্মসংবিদ, ইহাকে বলিতে পারি সম্ভূত বিজ্ঞান (Real-Idea)।

অতিমানস পরমপুরুষের সত্তা হইতে ভিন্ন কিছু নহে পরন্তু তাহার জ্যোতি ও শক্তি বলিয়া সেই সত্তার সহিত এক। ঠিক তেমনি অতিমানস বিজ্ঞানে জ্ঞান ও সঙ্কল্পের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ নাই। যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি অগ্নি হইতে ভিন্ন কিছু নহে, তদ্রূপ যিনি বিজ্ঞানের শক্তি এবং পরিণতির মধ্য দিয়া নিজেকেই ফুটাইয়া তুলিতেছেন তিনি বিজ্ঞান হইতে পৃথকভূত কিছু নহেন। আমাদের মননের ক্ষেত্রে সকলই পৃথক পৃথক; আমাদের মধ্যে ভাব ও সঙ্কল্পের কখন কখনো যোগ থাকে কখন কখনো থাকে না, কার্যতঃ আমরা ভাবকে সঙ্কল্প হইতে আলাদা করিয়াই দেখি এবং এ দুয়ের উভয়কেও আমাদের নিজেদের নিকট হইতে পৃথক মনে করি; আমি আছি, এ ভাব (idea) বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন একটি রহস্যরূপে আমাদের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়; সঙ্কল্প আর একটা রহস্য, এ শক্তি মূর্ত্ত বা বাস্তব (concrete) না হইলেও মূর্ত্তের কাছাকাছি; ইহা আমাতে আছে বা আমি ইহাকে পাইয়াছি অথবা হয়ত ইহাই আমাকে সাপ্‌টিয়া ধরিয়াছে, কিন্তু আমার সঙ্কল্প আমি নয় কখনও। আমার সঙ্কল্প, তৎসাধনোপায় এবং তাহার পরিণাম এ তিনটী আমার কাছে পৃথক, কারণ আমরা মনে করি আমা হইতে বাহিরে তাহাদের পৃথক বাস্তব সত্তা আছে। এইজন্য আমি, আমার ভাব বা আমার সংকল্প ইহারা কেহই স্বয়ং ফলপ্রসূ নয়। ভাব আমার নিকট হইতে খসিয়া পড়িতে পারে, সঙ্কল্প ব্যর্থ হইতে পারে, সাধনোপায়ের অভাব ঘটিতে পারে, উহাদের কাহারও বা সকলের দ্বারাও আমি নিজে অসার্থক থাকিয়া যাইতে পারি।

যাহাতে পঙ্গু করিয়া দেয় এমন কোন ভেদ অতিমানসে নাই, সেখানে জ্ঞান, শক্তি বা সত্তা কিছুই নিজের মধ্যে খণ্ডিত বা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন নয়, কারণ অতিমানসই বৃহৎ, একত্ব হইতে তাহার যাত্রারম্ভ বা প্রবৃত্তি, ভেদ হইতে নয়। মূলতঃ ইহা সর্ব্বগ্রাহী, বৈচিত্র্যসৃষ্টি ইহার গৌণক্রিয়া মাত্র। সত্তার যে সত্যই তাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠে, বিজ্ঞান বা ভাব হয় তাহার খাঁটি প্রতিরূপ, সঙ্কল্প শক্তি হয় সে ভাবের একান্ত অনুগামী—কারণ শক্তি চেতনারই ক্রিয়া এবং ফলও হয় সঙ্কল্পের ঠিক অনুযায়ী। এখানে ভাবের সঙ্গে অন্য ভাবের, সঙ্কল্প বা শক্তির সঙ্গে অন্য সঙ্কল্প বা শক্তির কোন বিরোধ নাই—যেমন আছে মানুষ ও তাহার জগতে। কারণ এখানে আছে এক বিরাট চেতনা যাহার মধ্যে সকল ভাব একেরই ভাবরূপে বর্ত্তমান এবং এই চেতনাই নিজ মধ্যে স্থিত সকল ভাবকে নিজের ভাবরূপে ধারণ করে, মিলাইয়া ধরে; এখানে আছে এক বিরাট সঙ্কল্প বা ইচ্ছাশক্তি যাহার মধ্যে সকল শক্তি বর্ত্তমান নিজেরই শক্তিরূপে এবং এই সঙ্কল্পই নিজ মধ্যে স্থিত সকল শক্তিকে নিজের শক্তিরূপে ধারণ করে, মিলাইয়া ধরে। ইহা একটী বিভাব বা প্রবৃত্তিকে সংহৃত বা সংযত করে অন্য একটীকে অগ্রসর করিয়া দেয় তাহার ভবিষ্যদ্দর্শী বিজ্ঞানময় সঙ্কল্প অনুসারে।

প্রচলিত ধর্ম্মসমূহের মধ্যে সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের যে ধারণা আছে এইরূপে তাহা সমর্থিত হয়। এ সমস্ত অযৌক্তিক কল্পনা ত নয়ই; বরং পূর্ণরূপে যুক্তিযুক্ত, কোন রূপেই ইহা উদার দার্শনিক যুক্তি অথবা প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণ বা অভিজ্ঞতার বিরোধী নয়। জীবে এবং শিবে, জগতে এবং ব্রহ্মে অনপনেয় ভেদ কল্পনা হইতেই ভ্রমের সৃষ্টি হয়। প্রকাশের ক্ষেত্রে কার্য্যসাধনোদ্দেশ্যে সত্তা, চৈতন্য এবং শক্তিতে যে বৈচিত্র্য কার্য্যতঃ সৃষ্টি হইয়াছে, এই ভ্রম তাহাকে একটা মৌলিক ভেদরূপে কল্পনা করিয়া বসে। কিন্তু প্রশ্নের এই দিক্‌টার কথা আমরা পরে আলোচনা করিব, বর্ত্তমানে আমরা স্রষ্ট্রীরূপিনী অতিমানসশক্তির অস্তিত্ব এবং তাহার প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু ধারণা লাভ করিলাম। দেখিলাম ইহার মধ্যে সর্ব্ব, সত্তা চৈতন্য সঙ্কল্প এবং আনন্দে এক হইয়া আছে অথচ যাহা একত্বকে নষ্ট না করিয়া প্রসারিত প্রস্ফুটিত বা স্পষ্ট করিয়া তোলে এরূপ নানা বিচিত্র বিভাবনার অনন্ত সামর্থ্যও ইহার

মধ্যে রহিয়াছে। ইহার মধ্যে সত্যই মূলবস্তু, সত্যই ভাবরূপে ভাসিয়া উঠে, সত্যই রূপের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। ইহাতে আছে জ্ঞান এবং সঙ্কল্পের একই সত্য, একই সত্যের আত্মসার্থকতা (self-fulfilment), সুতরাং আনন্দ ; কেননা সকল আত্ম সার্থকতাই সত্তার আত্মতৃপ্তি, সুতরাং সকল পরিবর্ত্তন এবং সংযোগের মধ্যে এক অনপনেয় আপনাতে-আপনি-বর্ত্তমান বা স্বয়ম্ভু সামঞ্জস্য এবং সুষমা সদা বর্ত্তমান রহিয়াছে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ঋতচিৎ

অতিচেতনার সুষুপ্তিতে অবস্থিত যে এক তিনি প্রজ্ঞান ঘন, আনন্দময় এবং আনন্দভুক্। ইনি সর্ব্বেশ্বর, ইনি সর্ব্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্যামী, ইনি সকলের কারণ।

মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ (৫।৬)

যাহার ভিতরে সকল পদার্থ ও ভাব বিদ্যমান, যাহা সকলের মূল এবং যাহা সকলকে পূর্ণপ্রতিষ্ঠায় লইয়া যায় সেই অতিমানসকে পরমপুরুষের প্রকৃতি বা স্ব-ভাব বলিয়া জানিতে হইবে। ইহা তাহার নির্ব্বিশেষ কেবল-সত্তার প্রকৃতি নয় বটে, কিন্তু যখন তিনি বিশ্বেশ্বর এবং বিশ্বস্রষ্টা তখন তাহার ভিতরে যে প্রকৃতি প্রকাশ পায় ইহা তাহাই। এই সত্যকেই আমরা ঈশ্বর নামে অভিহিত করি। পাশ্চাত্যে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে অতিমাত্রায় সীমাবদ্ধ ব্যক্তিরূপের ধারণা আছে, যাহাতে তাহাকে মানুষের অতিবর্দ্ধিত ও অতিপ্রাকৃত সংস্করণ মনে করা হয়, স্পষ্টতঃ ইনি সে ঈশ্বর নহেন। কারণ সে ধারণায় একটা বিশেষ সম্বন্ধকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্টিশীল অতিমানস এবং জীবের অহংজ্ঞানের মধ্যে, নিতান্ত মানবভাবাপন্ন একটা ছায়ামূর্ত্তিকে ঈশ্বররূপে ধরা হইয়াছে। অবশ্য ঈশ্বরের ব্যক্তিরূপকে আমরা বাদ দিতে পারি না কারণ নৈর্ব্যক্তিকতা তাহার সত্তার একটা বিভাব মাত্র। তিনি সর্ব্বময় সৎস্বরূপ কিন্তু আবার তিনিই একমাত্র সত্তা—তিনিই একমাত্র চিৎপুরুষ, তবু তিনি পুরুষ বা পুরুষোত্তম। তথাপি তাহার এ বিভাব আমাদের বর্ত্তমান আলোচনার বিষয় নয়। আমরা এখন দিব্য পুরুষের নৈর্ব্যক্তিক চেতনার সত্যকে গভীরভাবে বুঝিতে চাই—ইহার সম্বন্ধে আমাদের ধারণাকে উদার ও পরিমার্জ্জিত করিতে চাই।

এই ঋতচিৎ বা সত্যচেতনা বিশ্বের সর্ব্বত্র এক নিয়ামক আত্মজ্ঞানরূপে বর্ত্তমান; ইহাতে করিয়া যিনি এক তিনি নিজের অনন্ত সম্ভাবনার মধ্য হইতে

নানা ছন্দ সুষমা ফুটাইয়া তোলেন। নিয়ামক এক আত্মজ্ঞান না থাকিলে অনন্ত সম্ভাবনা নিয়তপরিবর্ত্তনশীল মহাবিশৃঙ্খলা (chaos) রূপে ভিন্ন কোন ছন্দের মধ্যে কিছুতেই প্রকাশ পাইতে পারে না। কারণ যেখানে শুধু অনন্ত সম্ভাবনা আছে অথচ তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার আত্মদৃষ্টি নাই অথবা প্রকাশের ক্ষেত্রে পরিণতির জন্য যে বীজ উপ্ত হইয়াছে, তাহা কি হইয়া উঠিবে তাহার পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কোন ভাব বা বিজ্ঞান নাই, সেখানে অনিয়ম অনিশ্চয় এবং মহাবিশৃঙ্খলা ছাড়া আর কি হইতে পারে? কিন্তু যেহেতু যে প্রজ্ঞা বিশ্বের জননী তাহার আত্মরূপ এবং আত্মশক্তিই সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ হইতেছে, তাহা হইতে ভিন্ন অন্য কিছু নয়, সুতরাং প্রত্যেক সম্ভাবনাকে যে সত্য এবং ঋত বা বিধান নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে, তাহা ও তাহার পূর্ণদৃষ্টি ঐ প্রজ্ঞার নিজ সত্তায় বর্ত্তমান আছে; আবার প্রত্যেক সম্ভাবনার সহিত অন্য সম্ভাবনার সম্বন্ধ কি, কোন্ সূত্রে বা কোন্ সামঞ্জস্যে তাহারা পরস্পর মিলিত হইতে পারে তাহার যথার্থ বোধও সেখানে আছে; জগৎ যে ভাবে প্রকাশ পাইবে, তাহাকে যে সার্ব্বভৌম সামঞ্জস্যে নিয়ন্ত্রিত হইয়া তাহার সকল ছন্দ সুষমা ফুটাইতে হইবে, তাহার জন্মলগ্নে তাহার সেই সমগ্রজ্ঞান ও ভাব এই প্রজ্ঞাতে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে, এই জ্ঞানই জগতের মূল উপাদানসমূহের অন্যোন্যক্রিয়া অপরিহার্য্যরূপে নিয়ন্ত্রিত করে, এই জ্ঞানের মধ্যে প্রত্যেক সম্ভাবনার সত্য এবং বিধানও নিহিত। বিশ্বের সকল ধর্ম্ম এবং বিধান ইহা হইতে জাত, ইহাই তাহাদিগকে ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করিতেছে; এই ধর্ম্ম বা বিধান যদৃচ্ছ অনিয়ম নয়। প্রত্যুত ইহা পদার্থের স্ব-ভাবের স্ফুরণ, যে স্ফুরণ নিয়ন্ত্রিত হয় সেই পদার্থের মূলে নিহিত সৎপ্রতিষ্ঠ বা সদ্ভূত বিজ্ঞানের এক অপ্রতিহত সত্য বীর্য্যে। সুতরাং বিসৃষ্টির সমগ্র পরিণতি এই আত্ম-সংবিতে প্রথমেই পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট হইয়া বর্ত্তমান এবং তাহাই স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে ইহার আত্মপরিণামের প্রতিমুহূর্ত্তে ফুটিয়া উঠিতেছে। অন্তর্নিহিত সেই মূল সত্যের জন্য বিসৃষ্টিকে প্রতিমুহূর্ত্তে যাহা হওয়ার কথা তাহা হইতে হইয়াছে, আবার ভবিষ্যতে যাহা তাহাকে হইতে হইবে, এই সত্যের বশেই সেই দিকে পরিচালিত হইতেছে, সর্ব্বশেষে বীজের মধ্যে যে উদ্দেশ্য ছিল এবং যে উদ্দেশ্য বহন করিয়া সে পরিণতির পথে চলিতেছে এই সত্যের বীর্য্যে তাহা সিদ্ধ হইবে।

নিজসত্তার মূলসত্য অনুসারে পুষ্টি ও উন্নতির পথে চলিতে জগতে কাল,

দেশ এবং নিমিত্তের (time, space and causality) প্রকাশ হইয়াছে। প্রকাশের পৌর্ব্বাপর্য্যে কাল এবং অবস্থিতির সম্বন্ধে দেশ দেখা দিয়াছে। দেশে ব্যবস্থিত বস্তু সকলের সুনিয়ত পারস্পরিক ক্রিয়ার সহিত কালপরম্পরা যুক্ত হইয়া নিমিত্ত বোধ উপস্থিত করিয়াছে। দার্শনিকগণের মতে দেশ ও কাল মনের ধারণা বা কল্পনা মাত্র, তাহাদের কোন বাস্তব সত্তা নাই। কিন্তু যাবতীয় পদার্থই যখন সচেতনসত্তার নিজের চৈতন্যে আত্মরূপায়ণ তখন দেশ কালকে শুধু মনের কল্পনা বলিয়া মনে করিবার বিশেষ কোন মূল্য নাই। সেই সচেতন সত্তার আত্মব্যাপ্তির অনুভব হইতে দেশ কাল জ্ঞান আসিয়াছে, বিষয়ী বা জ্ঞাতৃসম্পর্কীয় অনুভব হইতে কালজ্ঞান এবং বিষয় বা বস্তু সম্পর্কীয় অনুভব হইতে দেশজ্ঞান। এই দুই বিভাব সম্বন্ধে আমাদের মানসিক ধারণা আসিয়াছে পরিমাণবোধের ভিতর দিয়া ; বিভাগ কারয়া, বিশ্লেষণ করিয়া দেখা হইল যে মনের প্রবৃত্তি, সে মনের ধর্ম্মই সব কিছুকে পরিমিত করা। একটি বিশেষ বিন্দুতে দাঁড়াইয়া মন সম্মুখে এবং পশ্চাতের দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং নিরবচ্ছিন্ন গতিশীলতা বা প্রবহমানতাকে অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের পরম্পরায় পরিমিত করিয়া তোলে, ইহাই কালের কলনা বা গতি। স্থিতির ব্যাপ্তিকে বস্তুর বিভজনশীলতা দ্বারা পরিমিত ও খণ্ডিত করিয়া সেই খণ্ড বিন্দুসমূহের এক বিন্দুতে নিজেকে স্থাপিত করিয়া মন দেশের ধারণালাভ করে এবং নিজের চারিদিকে বস্তুর বিন্যাস এবং সম্বন্ধ লক্ষ্য করে।

প্রাকৃত জগতে মন ঘটনা দ্বারা কাল এবং জড়বস্তুর দ্বারা দেশ পরিমিত করিয়ে তোলে ; কিন্তু বিশুদ্ধ মননে ঘটনা বা বস্তুর অবস্থিতি উপেক্ষা করিয়া চিৎশক্তির সেই শুদ্ধ ক্রিয়া অনুভব করা যায় যাহা দেশ ও কালের মূল উপাদান। তখন ইহাদিগকে সর্ব্বগত চিৎশক্তির দুইটি বিভাব বলিয়া বুঝা যায়। ইহাদের পরস্পর মিশ্রণে এবং নানাপ্রকার সম্বন্ধে তাহার নিজের উপর ক্রিয়াজালের টানা পোড়েন বোনা হইয়াছে। মনের অতীত এমন এক চৈতন্য আছে যেখানে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এক সঙ্গে দেখা যায়, সে চেতনা কালের আধার নয়, আধেয় কালের অন্তর্গত নয়, কালকে ধারণা করিয়া রহিয়াছে, দর্শনের জন্য তাহাকে কালের কোন বিশেষ মুহূর্ত্তের উপর দাঁড়াইতে হয় না, কাল তাহার কাছে নিত্য বর্ত্তমান। সেই চৈতন্য দেশের কোন বিন্দুতে অবস্থিত নয় পরন্তু সকল বিন্দু

এবং সকল স্থান তাহাতে অবস্থিত; সে চেতনার কাছে দেশ চৈতন্যময় একটা অখণ্ড ব্যাপ্তি, কালের চেয়ে কম চৈতন্যময় নহে। কোন বিশেষ শুভ মুহূর্ত্তে আমরা সেইরূপ এক অখণ্ড দৃষ্টির দেখা পাই, যাহা তাহার অপরিবর্ত্তনীয় আত্ম-সচেতন একত্বের মধ্যে বৈচিত্র্যপূর্ণ বিশ্বকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। দেশ ও কালের অভ্যন্তরস্থ বস্তু বা ভাবনিচয়ের জগদতীত সত্য সে চৈতন্যে কিভাবে আছে, সে প্রশ্ন যেন আমরা তুলিতে না যাই, কারণ তাহা আমাদের ধারণার অতীত। এই অখণ্ড চৈতন্য মন ও ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ভিন্ন অন্য উপায়ে যে এই বিশ্বকে জানিতে পারে, আমাদের প্রাকৃত মন এতটুকুও স্বীকার করিতে চায় না।

অতিমানস কিরূপে অখণ্ড এবং সর্ব্বগ্রাহী দৃষ্টি দ্বারা কালের পরম্পরা এবং দেশের খণ্ডতাকে এক করিয়া ধারণ করিয়া আছে তাহা আমরা আভাসে কিছু ধারণা করিতে পারি কিন্তু ইহার পূর্ণ অনুভূতি আমাদিগকে সাধনা দ্বারা পাইতে হইবে। প্রথমতঃ কালের পরম্পরা বলিয়া কিছু যদি না থাকিত তবে কোন পরিবর্ত্তন, কোন উন্নতি বা প্রগতি সম্ভব হইত না, একটা পূর্ণ সামঞ্জস্য ও সুষমা অন্য সুষমারাজির সহিত একত্রে একরূপ একটা শাশ্বত মুহূর্ত্তে নিত্য প্রকাশিত থাকিত কিন্তু তাহাদের মধ্যে অতীত হইতে ভবিষ্যতের দিকে কোন গতির পরম্পরা দেখা দিত না। কিন্তু জগতে দেখিতেছি একটা ক্রমবর্দ্ধমান সুষমার ছন্দপরম্পরা নিয়ত চলিতেছে, পূর্ব্ববর্ত্তী সুরছন্দ হইতে উঠিয়া এবং তাহাকে নিজের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া একটা নূতন ছন্দ পুরাতনের স্থান অধিকার করিতেছে। অন্যপক্ষে আত্মপ্রকাশের বা বিসৃষ্টির মধ্যে যদি খণ্ডিত দেশের ধারণা না আসিত তবে রূপ বৈচিত্র্যের মধ্যে পরিবর্ত্তনশীল নানা সম্বন্ধ অথবা শক্তির সঙ্গে শক্তির সংস্পর্শ বা সংঘাত থাকিতে পারিত না। সকল পদার্থ বা ভাব বর্ত্তমান থাকিলেও কিছুরই স্ফুরণ বা বহিঃপ্রকাশ থাকিত না, দেশশূন্য অবস্থায় আত্মচৈতন্য নিজেরই মধ্যে সর্ব্ব পদার্থকে এক অনন্ত অন্তরচৈতন্যের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়া দিত, যেন এক বিশ্ব কবির মনে বা বিশ্ব পুরুষের স্বপ্নে; কিন্তু বিষয়রূপে বহির্জগতে আত্মপ্রসারের নানা রূপের মধ্যে তাহাদিগকে ছড়াইয়া দিত না। আবার শুধু কালই যদি সত্য হইত তাহা হইলে গায়কের অথবা কবির মনে সুর অথবা কবিকল্পনা যেমন একটার পর একটা ভাসিয়া উঠে,

তেমনিভাবে বিশ্বাত্মার অন্তরচৈতন্যে পরম্পরাক্রমে স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে একটার পর আর একটা প্রকাশের ছবি ভাসিয়া উঠিত কিন্তু তাহাদের বাহ্যরূপ দেখা দিত না। কিন্তু বস্তুতঃ সর্ব্বাধার দেশের পরিব্যাপ্তির মধ্যে কালবশে নানা রূপ ও শক্তি পরস্পরের সহিত যুক্ত ও সম্বন্ধ হইয়া এক সুষমার ছন্দে ফুটিয়া উঠিতেছে; রূপ, শক্তি ও ঘটনার অবিরাম প্রবাহ, কালের পরম্পরা আমাদের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইয়া উঠিতেছে।

দেশ ও কালের ক্ষেত্রে বহু অব্যক্ত শক্তি অবস্থিত রহিয়াছে, রূপায়িত ও পরস্পরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া উঠিতেছে, প্রত্যেক শক্তি তাহার সামর্থ্য এবং সম্ভাবনা লইয়া অপর বহুশক্তির সামর্থ্য ও সম্ভাবনার সম্মুখীন হইতেছে, ফলে আমাদের মনে হইতেছে যে কালের স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও অনায়াস পারম্পর্য্যের মধ্য দিয়া তাহাদের প্রকাশ না হইয়া যেন পরস্পরের সহিত সংঘাত ও বিক্ষোভের মধ্য দিয়া তাহাদের পরিণতি হইতেছে। কিন্তু বস্তুতঃ এই পরিণতির অন্তরে একটা সহজ স্বতঃস্ফূরণ আছে, বাহিরের সংঘাত ও বিক্ষোভ তাহার বহিশ্চর একটা গৌণবিভাব মাত্র। কারণ যিনি এক অখণ্ড তাহার স্বভাবজ বিধান অপরিহার্য্যরূপে সামঞ্জস্য ও সুষমাবিধায়ক হইবেই। যেখানে সংঘর্ষ আছে বলিয়া বোধ হয়, সেখানেও এই বিধানই সেই সমস্ত অংশ ও রূপের বহির্বিধান এবং প্রণালীও নিয়ন্ত্রিত করে। অতিমানসী দৃষ্টির নিকট সামঞ্জস্য ও সুষমার এই বৃহত্তর এবং গভীরতর সত্য নিত্য প্রকাশিত আছে। প্রতি পদার্থকে পৃথক করিয়া দেখে বলিয়া মনের নিকট যাহা বিরোধ ও বৈষম্য বলিয়া মনে হয় অতিমানসের নিকট তাহা নিত্য বর্ত্তমান ও উপচীয়মান এক ছন্দময় সুষমারই অঙ্গ বা উপাদান বলিয়া অনুভূত হয়; কেননা অতিমানস দৃষ্টিতে বিশ্ব একেরই বহুধা রূপায়ণ। তাহা ছাড়া মনের দৃষ্টি একটা বিশেষ দেশ ও কালের মধ্যে নিবদ্ধ, মন দেখে সেই দেশ-কালের মধ্যে বহু সম্ভাবনা—যাহাদের প্রত্যেকে অল্পবিস্তর বাস্তব ঘটনায় পরিণত হইতে পারে—বিশৃঙ্খলভাবে বর্ত্তমান আছে। কিন্তু দিব্য অতিমানসী দৃষ্টির নিকট দেশ ও কালের সমগ্র প্রসার উদ্ভাসিত, এজন্য তাহা মনের সকল সম্ভাবনা দেখে, তাহা ছাড়া যাহা মনের অগোচর তেমন অনেক কিছু দেখিতে পায় এবং সে দর্শনের মধ্যে ভ্রান্তি, অনিশ্চয়তা অথবা বিশৃঙ্খলতার কোন স্থান নাই। কারণ প্রত্যেক সম্ভাবনা কোন্ শক্তির বশে কোন্ মূল

প্রয়োজনে চালিত হইতেছে, তাহার সহিত অপর সম্ভাবনার সম্বন্ধ কি, কোন্ সময় কোন্ স্থানে কি ভাবে তাহা ক্রমশঃ ফুটিয়া উঠিবে এবং তাহার শেষ পরিণাম কোথায় এ সমস্তের কিছুই সে দৃষ্টির অগোচর নাই। স্থিরভাবে সমগ্র দৃষ্টিতে কোন কিছু দেখা মনের পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু অতীন্দ্রিয় এই অতিমানসের সেই ভাবে দেখাই স্বভাব ও স্বধর্ম্ম।

অতিমানসের চেতনশক্তি যাহা কিছু সৃষ্টি করে তাহার সেই সমস্ত আত্ম-রূপব্যাপ্তি যে কেবল তাহার চিন্ময়ী দৃষ্টিতে রহিয়াছে তাহা নহে পরন্তু ইহা তাহাদের সকলের মধ্যে অন্তর্য্যামী একটা আবির্ভাব রূপে অনুস্যূত হইয়া একটা আত্মপ্রকাশক জ্যোতিরূপে বর্ত্তমান আছে। গুপ্তভাবে হইলেও জগতের প্রতিরূপ প্রতিশক্তি ইহার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। ইহাই পূর্ণ ও স্বাভাবিক বা স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে সকল রূপ, শক্তি বা প্রবৃত্তি ব্যবস্থিত, নিরূপিত ও নিয়ন্ত্রিত করে, বৈচিত্র্যকে আসিতে ইহা যেমন বাধ্য করে, তেমনি তাহাকে সীমার মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখে; যে শক্তিকে ইহা ব্যবহার করে তাহাকে সংহৃত করে, ছড়াইয়া দেয় অথবা পরিণতির পথে লইয়া যায়; রূপের প্রথম জন্মলগ্নে অথবা শক্তির প্রথম আরম্ভের সময় ইহার আত্মজ্ঞানে যাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে তাহারই প্রথম ধর্ম্ম * বা বিধানানুসারে এ সমস্ত কৃত হয়। ইহাই ঈশ্বর বা প্রভুরূপে সর্ব্বভূতের হৃদয়দেশে অবস্থিত থাকিয়া নিজ মায়ার দ্বারা সকলকে যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় ঘুরাইতেছে। [ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে......তিষ্ঠতি ভ্রাময়ণ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া—গীতা] ইহা সর্ব্বপদার্থের অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপ্ত রহিয়াছে ('তদ্ অন্তরস্য সর্ব্বস্য, তদু সর্ব্বাস্যাস্য বাহ্যঃ') এবং ইহাই 'কবি' এবং 'পবিভূ' বা দিব্য সত্যদ্রষ্টা, এবং ইহাই অনাদিকাল হইতে সর্ব্ব পদার্থকে স্বভাবে যথাযথরূপে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিতেছে ('যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ'—ঈশোপনিষদ)।

এক অন্তর্যামী প্রজ্ঞা ও শক্তি, সজীব বা নির্জ্জীব, সচেতন বা অচেতন সকল পদার্থের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া তাহাদের সত্তা ও প্রবৃত্তি বা ক্রিয়া পরিচালিত

* প্রথমধর্ম্ম—'ধর্ম্মানি সা প্রথমান্যাসন'—উক্তিটি বৈদিক, প্রথম ধর্ম্ম অনুসারেই দেবতাগণ ক্রিয়া করেন, এই ধর্ম্ম বা ব্রত 'পূর্ব্যাং' বা মৌলিক সুতরাং 'পরম' বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহা পদার্থের অন্তর্নিহিত সত্যের বিধান।

করিতেছে, ইহার সম্বন্ধে আমরা সচেতন নই, তাই ইহাকে অবচেতন বা অচেতন মনে করি কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা নিজের নিকট নিশ্চেতন নয় পরন্তু গভীর ও সার্ব্বভৌমরূপে সচেতন, এই জন্য বুদ্ধিযুক্ত না হইলেও প্রতি পদার্থে আমরা যেন বুদ্ধির খেলা দেখিতে পাই, কেননা সকল পদার্থই অন্তরস্থ দিব্য অতিমানসের সদ্ভূতবিজ্ঞান (real idea) মানিয়া চলিতে বাধ্য, পশু ও উদ্ভিদ ইহাকে অবচেতন ভাবে এবং মানুষ অর্দ্ধচেতন ভাবে মানে, এই মাত্র তফাৎ। সর্ব্বত্র অনুস্যূত থাকিয়া এই যে প্রশাসন ইহা মনোময়ী বুদ্ধির নহে, যেখানে আত্মসত্তার সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে আত্মজ্ঞান রহিয়াছে ইহা সেই সত্তার আত্ম-সচেতন সত্য। ইহাই ঋতচিৎ বা সত্য চৈতন্য, যাহাকে ভাবনা বা মনন ক্রিয়ার দ্বারা কোন কিছু জানিতে বা করিতে হয় না। এক অখণ্ড আত্মসম্পূর্ণ সত্তার শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ আত্মদৃষ্টি অখণ্ড এবং অপ্রতিহত শক্তির প্রভাবে সজ্ঞানে সব কিছু ফুটাইয়া তোলে। মনোময়ী বুদ্ধিকে ভাবনা বা মনন করিতে হয়, কারণ ইহা চৈতন্যের প্রতিফলিত শক্তি বা একটা আভাস মাত্র, ইহার প্রকৃত জ্ঞান নাই, কিন্তু তাহা লাভ করিতে চায়। নিজের চেয়ে উচ্চতর এক প্রজ্ঞাশক্তিকে কালের পরম্পরায় ধাপে ধাপে সে অনুসরণ করিয়া চলে—যে প্রজ্ঞা এক, পূর্ণ ও শাশ্বত, কালকে যাহা ধারণ করিয়া রহিয়াছে, এক দৃষ্টিতে যাহা অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সর্ব্বলই দেখিতে পায়।

তাহা হইলে ইহাই দিব্য অতিমানসের কার্য্যকরী বা সক্রিয় তত্ত্ব ; ইহা এমন এক বিশ্বদৃষ্টি যাহার মধ্যে সকল পদার্থ ও ভাব আছে এবং যাহা আবার সে সকলের মধ্যে অনুস্যূত হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। যেহেতু তাহার সত্তাব মধ্যে তাহার নিশ্চল আত্মবোধে দেশ কালাতীতরূপে অন্তর্গূঢ় ভাবে সব কিছুই বর্ত্তমান সুতরাং দেশে ও কালে বিষয়রূপে সৃষ্ট ও পরিচালিত হইয়া যাহা কিছু প্রকাশিত হইতেছে তাহাও সক্রিয় জ্ঞানরূপে তাহার মধ্যে রহিয়াছে।

এই চৈতন্যের নিকট জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় পৃথক পৃথক সত্তা নয় কিন্তু মূলতঃ এক। আমাদের মন এ তিনকে পৃথক করিয়া দেখে, নতুবা মনন ক্রিয়া চলে না ; স্বতন্ত্র না করিলে মনের ক্রিয়ার মৌলিক বিধান লোপ পায়, ক্রিয়ার কোন উপযুক্ত উপায় সে খুঁজিয়া পায় না, সুতরাং সে নিশ্চল ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। এই জন্য মনের দিক দিয়া আমি নিজেকে দেখিতে গেলেও আমাকে এই

ভেদ বজায় রাখিতে হয়। তথায় মনের দেখায় প্রথমতঃ আমি আছি জ্ঞাতারূপে, দ্বিতীয়তঃ আমার মাঝে আমি যাহা দেখিতেছি, যাহা আমি আমার জ্ঞানের বিষয় বা জ্ঞেয় রূপে মনে করিতেছি, যাহা আমি বটে তথাপি যেন আমি নয়; তৃতীয়তঃ জ্ঞানক্রিয়া বা জ্ঞানের বৃত্তি দ্বারা এই জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়কে জুড়িয়া দিতেছি। কিন্তু মননের জন্য ভেদের এই কৃত্রিম ধারা ব্যবহারিক প্রয়োজনে অনুসরণ করা হয়, মূল সত্য ইহা প্রকাশ করে না স্পষ্টই। প্রকৃত পক্ষে জ্ঞাতারূপী আমিই সেই চৈতন্য যাহা জানিতেছে, অর্থাৎ জ্ঞাতা ও জ্ঞান একই পদার্থ; জ্ঞান আমিই বৃত্তিরূপে, আবার যাহা জ্ঞেয় তাহাও ত আমি, একই চৈতন্যের একটী গতি বা ক্রিয়া, স্পষ্টতঃ তিনটী একই সত্তা, একই ক্রিয়া; বিভক্ত মনে হইলেও অবিভক্ত, নিজের বিভিন্নরূপে ব্যবস্থিত বা খণ্ডিত মনে হইলেও অখণ্ডিত। অহং এর ক্ষেত্রে এই অখণ্ড জ্ঞানে মন পৌছিতে পারে, যুক্তি দিয়া ধরিতে পারে, বোধ করিতেও পারে কিন্তু ইহাকে ভিত্তি করিয়া সহজে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সচেতন ভাবে সে মননক্রিয়া চালাইতে পারে না। যে চৈতন্যকে "আমি" বলি তাহার বাহিরে যে সমস্ত বস্তুনিচয় আছে সেখানে মনের পক্ষে এ তিনকে এক করিয়া দেখা একরূপ অসম্ভব। সে ক্ষেত্রে একত্ব অনুভব করাই মনের পক্ষে বিষম ব্যাপার, একত্ব বোধকে রক্ষা করিয়া সতত তদনুসারে কাজকরা তার পক্ষে বিজাতীয় এমন এক নূতন ব্যাপার যাহা তাহার পক্ষে সম্ভবই নয়। মন বড় জোর ইহাকে একটা বৈজ্ঞানিক সত্য হিসাবে মানিতে পারে; ভেদ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার সাধারণ এবং স্বাভাবিক ক্রিয়া চালিতে থাকিবে, এ সত্য দিয়া তাহার শোধন বা মার্জ্জন শুধু চলিতে পারে; মনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে এ সত্যের সম্বন্ধ বুঝিতে হইলে একটা দৃষ্টান্ত আমরা লইতে পারি। পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে এই বৈজ্ঞানিক সত্য আমরা জানিয়াছি, কিন্তু আমাদের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের নিকট এই বোধ রহিয়া গিয়াছে যে সূর্য্যই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, সে বোধ কৃত্রিম এবং ভ্রমপূর্ণ হইলেও পরিহার করিতে পারি না কিন্তু প্রকৃত সত্যকে এই ব্যবহারিক জ্ঞানের শোধন কার্য্যে লাগাইতে পারি মাত্র।

কিন্তু এই অভেদ জ্ঞান বা একত্বের সত্য অতিমানসে সদা বর্ত্তমান, এই সত্য অনুসারেই সেখানে সতত ক্রিয়া চলে, মনের কাছে এ জ্ঞান গৌণ কখনও

কখনও সাধন বলে এ সত্য সে লাভ করিলেও, তাহার দৃষ্টিশক্তির মূল বা স্বরূপ সত্য ইহা নহে। বিশ্ব এবং বিশ্বের মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহার সমস্তই অতিমানস আত্মস্বরূপে দেখে, জ্ঞানের এক অখণ্ড এবং অবিভাজ্য ক্রিয়াতে ; এই অখণ্ড ভাবই তাহার প্রাণ, অখণ্ড ভাবের ক্রিয়াতেই তাহার আত্মপ্রকাশ ; অতএব সর্ব্বাধার এই দিব্য চেতনা নিজের সঙ্কল্প বা ইচ্ছাশক্তি নামক বিভাবের বলে বিশ্বজীবনের পরিণতিকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিতেছে বলিলে পূর্ণ ভাবে বলা হয় না, ইহাই বলিতে হয় যে বিশ্বজীবনকে ইহা নিজের মধ্যে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে, এমন এক শক্তির ক্রিয়া দ্বারা, যাহা তাহার জ্ঞান অথবা তাহার আত্মসত্তার ক্রিয়া বা গতি হইতে অভিন্ন, অর্থাৎ যাহার মধ্যে সত্তা, জ্ঞান ও শক্তির ক্রিয়া এক এবং অখণ্ড। কারণ আমরা দেখিয়াছি যে বিশ্বচিৎ এবং বিশ্বশক্তি এক, বিশ্বচেতনাই ক্রিয়াতে বিশ্বশক্তি রূপে প্রকাশ পায়। তেমনি দিব্য জ্ঞান এবং দিব্য ইচ্ছা বা সঙ্কল্পও এক ; সত্তার একই ক্রিয়া বা একই স্পন্দে এ উভয়ই প্রকাশিত হয়।

যদি আমাদিগকে বিশ্বের সম্বন্ধে সত্যধারণা করিতে হয়, যদি বিশ্লেষণ ও বিভেদকারী মনের প্রাথমিক ভ্রান্তি হইতে মুক্ত হইতে হয়, তবে যাহার মধ্যে নিজের একত্ব হইতে বিচ্যুত না হইয়াও সকল বহুত্ব রহিয়াছে সেই অতিমানসের এই অখণ্ডতাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। বীজ হইতে তাহার মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকিয়া যে গাছ পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান ছিল তাহা বাহির হইয়া আসে, আবার গাছ হইতে বীজ পাওয়া যায়। যে স্থায়ীরূপের প্রকাশকে আমরা বৃক্ষ বলি তাহাতে একটা অলঙ্ঘ্য নিয়ম, একটী অপরিবর্ত্তনীয় ধারা বা পদ্ধতি দেখা যায়। মন বৃক্ষরূপ এই ব্যাপারকে, ইহার জন্ম, জীবন ও বংশ বিস্তারকে একটা স্বতঃসিদ্ধ ঘটনারূপে দেখে এবং সেই ভিত্তিতে গভীর মনোযোগের সহিত ইহাকে পর্য্যবেক্ষণ, ইহার শ্রেণী বিভাগ এবং ব্যাখ্যা করে। গাছকে সে বুঝায় বীজ দিয়া এবং বীজকে গাছ দিয়া, বলে যে ইহা প্রকৃতির একটা নিয়ম বা বিধান। কিন্তু ইহাতে তত্ত্বের ব্যাখ্যা কিছু হয় না, ইহাতে একটা রহস্যের বিশ্লেষণ ও বিকাশধারা পাই মাত্র। এমন কি মন যদি আত্মারূপী অন্তর্গূঢ় এক সচেতন শক্তির অনুভবও লাভ করে এবং তাহাকে এইরূপের প্রকৃত সত্তা এবং অবশিষ্ট সমস্তকে সেই শক্তির স্থিরবদ্ধ প্রকাশধারা বলিয়া

বুঝিতে পারে তথাপি রূপকে সে পৃথক সত্তা বলিয়া মনে করিতে চায়, তাহার প্রকৃতির বিধান এবং পরিণতির প্রণালীও পৃথক মনে করে। পশুতে এবং সচেতন মননশক্তিসম্পন্ন মানুষে ভেদ-দর্শনের এই প্রবণতাবশে মন নিজেকে একটা পৃথক পদার্থ বলিয়া কল্পনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, নিজেকে সে সচেতন বিষয়ী এবং অন্য সবরূপকে তাহার বিষয়রূপে তাহা হইতে পৃথক বলিয়া দেখে। প্রাকৃত জীবনে এ ব্যবস্থা প্রয়োজন, ইহাই ব্যবহারিক জীবনের প্রথম ভিত্তি কিন্তু মন ইহাকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করে এবং তথা হইতে অহমিকার সকল ভ্রান্তি আসিয়া পড়ে।

কিন্তু অতিমানস অন্য ভাবে কাজ করে। যদি তাহার সত্তা একান্ত পৃথক, স্বতন্ত্র হইত তবে বৃক্ষ এবং তাহার জীবনপ্রণালী যেরূপ আছে সেরূপ হইতে পারিত না, এমন কি তাহার অস্তিত্বই সম্ভব হইত না। বিশ্বসত্তার শক্তিতেই রূপরাজি যে ভাবে আছে সেই ভাবে থাকা সম্ভব হইয়াছে; সেই সত্তার সহিত এবং তাহারই অন্য সকল প্রকাশের সহিত সম্বন্ধের ফলেই প্রতিপদার্থের উন্নতি ও পরিণতি সম্ভব হইয়াছে। বিশ্ববিধান এবং সমগ্রপ্রকৃতির সত্যের প্রয়োগেই প্রতিপদার্থের বিশেষ বা বিধান দেখা দিয়াছে। সাধারণ বা সার্ব্বজনীন পরিণতির ক্ষেত্রে তাহার যে স্থান আছে তাহার উপরেই তাহার বিশেষ পরিণতি নির্ভর করে। বীজ দিয়া গাছের তত্ত্ব বা গাছ দিয়া বীজের তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয় না, বিশ্বতত্ত্ব হইতে উভয়ের ব্যাখ্যা মিলে, আর ঈশ্বরকে দিয়া বিশ্বতত্ত্ব বুঝা যায়। যে অতিমানস যুগপৎ বীজ গাছ এবং সর্ব্বপদার্থে পরিব্যাপ্ত এবং অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে তাহা এই অবিভাজ্য একত্ব জ্ঞানের মধ্যে বাস করে—যদিও সে একত্বের মধ্যে বহুত্বও রহিয়াছে। এই সর্ব্বগ্রাহী (comprehensive) জ্ঞানে সত্তার কোন স্বতন্ত্র কেন্দ্র নাই; আমাদের মধ্যে অন্য সকল হইতে পৃথক যেমন এক বিশিষ্ট অহং আছে অতিমানসে তেমন কিছু নাই। ইহার আত্মজ্ঞানে সমগ্র সত্তাই সমানরূপে সম্প্রসারিত—একত্বে অদ্বয়, বহুত্বেও অদ্বয়, সর্ব্বত্র সকল দশায় অদ্বয়। এখানে সর্ব্ব এবং এক একই সত্তা। সর্ব্বের সত্তা এবং একের সত্তার সহিত একত্ব জ্ঞানের চেতনা, ব্যক্তিসত্তা কখনো হারায় না, হারাইতে পারে না; কারণ এই একত্ব জ্ঞান অতিমানসের মর্ম্মসত্য, অতিমানস-আত্মপ্রত্যয়ের অংশ।

সেই বিশাল একত্বের সমতায় সত্তা বিভক্ত বা বিকীর্ণ হইয়া যায় নাই, সমভাবের আত্মব্যাপ্তিতে ইহার সমগ্র প্রসারতাতে ব্যাপ্ত হইয়া একই অবস্থিত, বহুর অনন্তরূপের মধ্যেও বাস করিতেছে এই একই অন্বয়তত্ত্ব, সর্ব্বত্র যুগপৎ বর্ত্তমান এই এক "সমংব্রহ্ম"। কারণ দেশে ও কালে সত্তার এই ব্যাপ্তি ও অধিষ্ঠান পরম এবং চরম একত্ব হইতেই আসিয়াছে, তাহার সহিত অন্তরঙ্গ ভাবে সম্বদ্ধ আছে। সেই পরম একত্বের মধ্যে কেন্দ্রও নাই পরিধিও নাই, তাহা কেবল দেশকালাতীত 'একমেবাদ্বিতীয়ং'। ব্যাপ্তিহীন ব্রহ্মে যে পরম ঘনীভূত একত্ব রহিয়াছে ব্যাপ্তির মধ্যে তাহা স্বভাবতঃ এইরূপ সমভাবে ব্যাপ্ত প্রত্যয়রূপে দেখা দেয়; সর্ব্বগ্রাহী জ্ঞানরূপে প্রকাশ পায় যাহার মধ্যে সর্ব্বজ্ঞান অনুস্যূত থাকে; এমন একত্ব জ্ঞানে ফুটিয়া উঠে, বহুত্বের কোন খেলাই যাহার হানি বা ন্যূনতা ঘটায় না। "ব্রহ্ম সর্ব্বভূতে", "সর্ব্বভূত ব্রহ্মে" "সর্ব্বভূতই ব্রহ্ম" ইহা সর্ব্বজ্ঞ অতিমানসের তিনটী সূত্র! আত্মপ্রকাশের একই সত্য এই তিনরূপ বিভাবকে একই সঙ্গে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে, যে আত্মদৃষ্টি লইয়া ইহা বিশ্বলীলায় অগ্রসর হয়, তাহার মধ্যে মূলগত ভাবে এ ত্রিধারা অভিন্নভাবে বর্ত্তমান আছে।

কিন্তু মানসিক প্রকৃতির অথবা যাহার মধ্যে দেহ, মন ও প্রাণ এই তিন রহিয়াছে এবং যাহাকে আমরা বিশ্ব বলি সেই নিম্নতর চেতনার উৎপত্তি কোথা হইতে হইল? যাহা কিছু বর্ত্তমান আছে তাহার প্রতি পদার্থ, সমস্তের মূলস্বরূপ সৎ, চিৎশক্তি ও আনন্দকে অবলম্বন করিয়া সর্ব্বকার্য্যক্ষম অতিমানসের ক্রিয়া হইতে গেলে সৃজনশীল এই অতিমানসের মধ্যে এমন কোন বৃত্তি থাকা চাই যাহার ক্রিয়ার ফলে দেহ প্রাণ মনরূপী এই তিন নূতন নিম্নতর ভূমির উদ্ভব হইতে পারে। সৃষ্টিশীল ঋতচিতের এক গৌণ শক্তির মধ্যে আমরা এই বৃত্তির সাক্ষাৎ পাই। ইহা অতিমানসের প্রজ্ঞানশক্তি, ইহা তাহার নিজের মধ্য হইতে কিছু বাহির করিয়া নিজের সম্মুখে স্থাপিত করিবার এবং সেই স্থাপিত পদার্থকে বিষয়রূপে দেখিবার শক্তি, ইহা সেই শক্তি যাহাতে সংবিৎ বা আত্মজ্ঞান নিজেকে কেন্দ্রীভূত করে দ্রষ্টা বা জ্ঞাতারূপে এবং নিজেরই সেই ক্রিয়া হইতে যেন সে সরিয়া যায় এবং সেই ক্রিয়াকে দৃশ্য বা জ্ঞেয়রূপে স্থাপিত করিয়া জানিতে ও দেখিতে চায়। ইতিপূর্ব্বে আমরা সমভাবে ব্যাপ্ত সংবিতের কথা বলিয়াছি কিন্তু এখন এই যে কেন্দ্রীভূত হওয়ার কথা বলিতেছি, ইহাতে সেই সমব্যাপ্তির স্থানে এক বি-সমব্যাপ্তি

দেখা দেয় এবং তথা হইতে আত্মবিভাজনের অথবা প্রতীয়মান প্রতিভাসের আরম্ভ হয়।

প্রথম জ্ঞাতা বিষয়ীরূপে নিজেকে জ্ঞানে সমাহৃত করিয়া তাহার চৈতন্যের শক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করে—দেখে যেন সে চৈতন্য তাহারই মূর্ত্তিতে তাহা হইতে বাহির হইতেছে, রূপায়ণে ব্যাপৃত থাকিয়া যেন সতত তাহাতেই ফিরিয়া আসিতেছে, আবার সতত যেন বাহির হইয়া যাইতেছে। আত্ম বিপরিণামের এই একটী ক্রিয়া হইতেই বিশ্বের আপেক্ষিক দৃষ্টি এবং ক্রিয়ার ভিত্তিস্বরূপ সমস্ত ব্যবহারিক ভেদ আসিয়া পড়ে। এইভাবে জ্ঞাতা, জ্ঞান এবং জ্ঞেয়; ঈশ্বর, তাহার শক্তি এবং শক্তিজাত পদার্থ; ভোক্তা, ভোগ এবং ভোগ্য; ব্রহ্ম, মায়া এবং সম্ভূতি প্রভৃতি সকল ত্রিধা বিকল্পনার ব্যবহারিক ভেদ সৃষ্টি হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ জ্ঞানে সমাহিত এই চিন্ময় পুরুষ তাহার নিজের মধ্য হইতে যে প্রকৃতি বা শক্তি বাহির হইয়াছে তাহার দ্রষ্টা এবং পরিচালক হইয়া নিজেরই প্রতিরূপে নিজেকে ফুটাইয়া তোলেন, যেন তিনি তাহার চিৎশক্তির সঙ্গে তাহার ক্রিয়ার মধ্যে নামিয়া আসেন, সেখানে তাহার আত্ম-বিভজন ক্রিয়ার যেন পুনরাবৃত্তি করিতে থাকেন, এইভাবে অতিমানসের এই প্রজ্ঞানচৈতন্য জাত হয়। প্রত্যেক রূপে এই পুরুষ তাহার প্রকৃতির সঙ্গে বাস করেন এবং চৈতন্যের সেই ব্যবহারিক কেন্দ্র হইতে অন্য সকল রূপের মধ্যে যে তিনিই অবস্থিত আছেন, ইহা দেখেন। সর্ব্বত্র একই আত্মা একই দিব্য পুরুষ অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। বহু কেন্দ্র শুধু জ্ঞানের ব্যবহারিক ক্রিয়ার জন্য, ভেদের একটা খেলার জন্য, অন্যোন্য জ্ঞানের, অন্যোন্য মিলনের, অন্যোন্য সম্ভোগের, শক্তির অন্যোন্য সংঘাতের জন্য স্বরূপগত একত্বের উপরই এখানে ভেদের প্রতিষ্ঠা, ভেদের ব্যবহারিক ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া একত্বের বা অভেদের অনুভূতি।

যে অব্যভিচারী একত্ব বিশ্বসত্তার মূলভিত্তি তাহার একত্ব মূলক সত্য এবং অবিভাজ্য চৈতন্য হইতে চ্যুত হইয়া সর্ব্বগত অতিমানসের এই নূতন বিভাব যেন কতকটা দূরে সরিয়া গিয়াছে ইহা বলিতে পারি। আর কিছু দূর অগ্রসর হইলেই ইহা অবিদ্যাতে পরিণত হইবে—যে অবিদ্যা বহুত্বকেই মূল সত্য মনে করে এবং প্রকৃত একত্বে পৌছিবার জন্য অহংরূপী এক মিথ্যা একত্ব লইয়া যাত্রারম্ভ করে। তখন আমরা বেশ বুঝিতে পারি একবার যদি ব্যষ্টিব্যক্তিকে

জ্ঞাতা বলিয়া, দৃষ্টিভঙ্গীনিয়ামক অধিষ্ঠানকেন্দ্র বলিয়া গ্রহণ করি তবে মনের যত বিচিত্রধারা, মনোময় ইন্দ্রিয় বোধ, মনোময় বুদ্ধি, মনোময় ক্রিয়া এবং সঙ্কল্প তাহাদের সকল পরিণামের সহিত অবশ্য আসিয়া পড়িবে। কিন্তু ইহাও আমরা বুঝিতে পারি যে যতক্ষণ পুরুষের লীলা বা ক্রিয়া অতিমানস্ ভূমিতে আছে ততক্ষণ অবিদ্যার উৎপত্তি হয় নাই, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জ্ঞান ও ক্রিয়ার ক্ষেত্র ঋতচিৎ, ততক্ষণ একত্বই সকলের ভিত্তি।

কারণ তখনও ব্রহ্ম নিজেকে দেখিতেছেন সকলের ভিতরে একরূপে, সকলকে বোধ করিতেছেন নিজের মধ্যস্থিত সম্ভূতি (becoming) রূপে এবং নিজেই সে সম্ভূতিরূপ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া। ঈশ্বর তখনও নিজেই ক্রিয়ার মধ্যে শক্তিরূপ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জানেন এবং প্রত্যেক সত্তায়, তাহার আত্মাতে এবং রূপে যে তিনিই, এ বোধ রহিযাছে। সেই ভোক্তা বহুত্বের মধ্যেও নিজেরই আত্মসত্তাকে ভোগ করেন এ জ্ঞান তখনও বর্ত্তমান। কেবল একটা প্রকৃত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এখন আর চৈতন্য সর্ব্বদা সমান ভাবে ঘনীভূত নয়, এখন সেখানে বি-সমতা দেখা দিয়াছে, শক্তিও নানাভাবে বহুত্বে বিস্তৃত হইয়াছে। চৈতন্যে একটা ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়াছে, কিন্তু চৈতন্যের স্বরূপে বা আত্মদৃষ্টিতে কোন প্রকৃত ভেদ বা বিভাগ দেখা দেয় নাই। সত্য-চৈতন্য বা ঋত-চিৎ এমন একটা অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যাহা আমাদের মননকে গড়িয়া তুলিবে কিন্তু তাহা এখনও আমাদের প্রাকৃত মননে পরিণত হয় নাই। উৎপত্তিস্থানে গিয়া মনকে ধরিবার জন্য ইহা আমাদিগকে ভালভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে, কারণ ইহা সেই বিন্দু যেখান হইতে ঋতচিতের সমুচ্চ বিশাল উদারতা ও বিস্তৃতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মন বিভাগ, খণ্ডতা এবং অজ্ঞানের নিম্ন ভূমিতে পতিত হইয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে এতক্ষণ আমাদের বুদ্ধির অপ্রচুর ও অস্পষ্ট ভাষা দিয়া যাহার পরিচয় দিবার অসম্পূর্ণ চেষ্টা করিয়াছি অতিমানসের সেই দূরবর্ত্তী বিভাবের অনুভব পাওয়া অপেক্ষা তাহার প্রজ্ঞানরূপী এই বিভাবকে ধরা ও বোঝা আমাদের পক্ষে সহজতর, কেননা ইহা আমাদের নিকটে আছে এবং আমাদের মনের ক্রিয়ার একটা পূর্ব্বাভাস তাহাতে আছে। যে বাধা আমাদিগকে অতিক্রম করিতে হইবে তাহা তত দারুণ নয়।

ষোড়শ অধ্যায়

অতিমানসের ত্রিধারা

আমার আত্মা ভূতধারক এবং ভূতসকলের উদ্ভবের নিমিত্ত কারণ।......আমিই সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত আত্মা।

(গীতা ৯।৫, ১০।২০)

জ্যোতির তিনটী শক্তি জ্যোতির্ম্ময় তিনটী দিব্যলোক ধারণ করিয়া আছে। ঋগ্বেদ (৫।২৯।১)

প্রাকৃত মনের সীমা হইতে যখন জীব মুক্ত এবং দিব্য অতিমানসের ক্রিয়ায় যোগদান করিতে সমর্থ হয়, তখন ঋতচিতের প্রজ্ঞান দৃষ্টি দিয়া যে জগতে আমরা বাস করি তাহা বুঝা সহজতর হয়। প্রজ্ঞানের সাহচর্য্যে এই রকমে বুঝিবার চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে ঈশ্বর বা জগৎপ্রভুর চৈতন্যের কথা যাহা আমরা জানিয়াছি অথবা এখনও জানিতে পারি তাহার একটা সংক্ষেপ বিবৃতি দিতে চাই—বলিতে চাই কি করিয়া তিনি তাহার নিজ সত্তার ঘনীভূত আদিম একত্ব হইতে নিজ মায়া দ্বারা এ বিশ্বকে ফুটাইয়া তুলিলেন।

আমরা এই বলিয়া আরম্ভ করি যে যাহা কিছু আছে তাহা এক অখণ্ড সৎস্বরূপ, তাহার মূল প্রকৃতিই চৈতন্য, সেই অখণ্ডচৈতন্যের স্বধর্ম্ম বা ক্রিয়াশীল প্রকৃতিই শক্তি বা ইচ্ছা; এই সত্তা আনন্দরূপ, এই চৈতন্য আনন্দরূপ, এই শক্তি বা সঙ্কল্পও আনন্দরূপ, সত্তা চৈতন্য এবং শক্তি বা সঙ্কল্পের শাশ্বত এবং অবিচ্ছেদ্য আনন্দ নিজের মধ্যে আত্মসমাহিত হইয়া নিশ্চল অথবা ক্রিয়াশীল এবং সৃষ্টিশীল হইয়া নিত্য বর্ত্তমান আছে। ইহাকে আমরা ঈশ্বর বলি, প্রাতিভাসিক বা ব্যবহারিক সত্তার পিছনে আমাদের যে স্বরূপ সত্তা আছে তাহাতে আমরাও ইহাই। তাহার আত্মসংহৃত অবস্থায় এই মূল শাশ্বত এবং অব্যাভিচরিত আনন্দ তাহাতে বর্ত্তমান আছে অথবা বরং তিনি নিজেই সেই আনন্দ। আবার সৃষ্টির জন্য যখন তিনি ক্রিয়াশীল হন তখন তাহাতে থাকে—অথবা

তিনি নিজেই হন—সত্তা, চৈতন্য এবং শক্তি বা ইচ্ছার লীলাচঞ্চল আনন্দ। সেই লীলা বা খেলাই এই জগৎ এবং সেই আনন্দই তাহার একমাত্র কারণ, প্রেরক এবং লক্ষ্য। ভাগবতী চেতনায় এ লীলা, এ আনন্দ শাশ্বত এবং অবিচ্ছেদ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত; যাহা মনোময় অহংরূপী ভ্রান্ত সত্তা দ্বারা ঢাকা পড়িয়াছে আমাদের সেই স্বরূপসত্তায় আমরা এই লীলা এবং আনন্দ, শাশ্বত এবং অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্ভোগ করি—তাহার অন্যথা হইতে পারে না। কারণ আমাদের এ স্বরূপ সত্তা ঐশীচেতনার সহিত এক। অতএব দিব্য জীবনের অভীপ্সা যদি আমাদের মধ্যে জাগে, তবে আমাদের মধ্যে আবৃত সেই স্বরূপের আবরণ উন্মোচন করিয়া, বর্ত্তমানে যে মনোময় অহং এর ভ্রান্ত সত্তাতে আমরা রহিয়াছি তাহা হইতে আমাদের স্বরূপ সত্তার, খাঁটি আত্মার উচ্চতর অবস্থায় উত্তীর্ণ হইয়া ঐশীচেতনার সহিত একত্বে মিলিত হইয়া তাহা লাভ করিতে পারি, অন্য কোন উপায়ে নহে। আমাদের মধ্যেই অতিচেতন এমন কিছু আছে যাহা সর্ব্বদা সেই ভাগবতী চেতনার অনুভবে ভরপুর হইয়া আছে, নৈলে আমাদের অস্তিত্বের সম্ভাবনাই থাকিত না। কিন্তু আমাদের মনোময়ী চেতনা সে অনুভবের আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু যখন আমরা একদিকে এই অখণ্ড সচ্চিদানন্দের, অন্য দিকে এই বিভক্ত মনের কথা বলি তখন আমরা এমন দুইটা বিরুদ্ধ সত্তাকে স্থাপিত করি যাহার একটা সত্য বলিয়া ধরিলে অপরটা মিথ্যা হইবে, একটাকে সম্ভোগ করিতে গেলে অপরটাকে অবলুপ্ত হইতে হইবে। অথচ মনে, দেহ ও প্রাণের আধারে রহিয়াছে আমাদের জাগতিক অস্তিত্ব; সচ্চিদানন্দে পৌঁছিতে গিয়া যদি আমাদের মন প্রাণ ও দেহের চেতনাকে অবলুপ্ত করিতে হয়, তবে ত এ জগতে দিব্য জীবন প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হইয়া পড়ে। জগদতীত ভাবে যিনি বর্ত্তমান তাহাকে সম্ভোগ করিতে বা সেই সত্তায় ফিরিয়া গিয়া তাহার সহিত এক হইতে গেলে আমাদের জাগতিক সত্তাকে অবশ্য ছাড়িতে হইবে—এই সিদ্ধান্ত না মানিয়া কোন উপায় থাকে না, যদি এই দুই এর মধ্যে সংযোগ সেতু স্বরূপ এমন কোন মধ্যবর্ত্তী অবস্থা না থাকে যাহা এই দুইকে পরস্পরের নিকট সার্থক করিতে পারে এবং এমন এক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে, যাহার ফলে দেহ প্রাণ ও মনের আধারে সচ্চিদানন্দের অনুভব আমাদের পক্ষে সম্ভব করিয়া তুলিতে পারে।

.·. মিলনের সেতু একটা আছে। আমরা তাহাকেই অতিমানস বা ঋতচিৎ বলিতেছি। ইহা মনের অপেক্ষা উর্দ্ধতর তত্ত্ব এবং বস্তুর অখণ্ড স্বরূপ সত্যে ও একত্বে ইহার অবস্থিতি, গতি ও প্রবৃত্তি, মনের মত প্রাতিভাসিক খণ্ডজ্ঞানে নহে। যে সিদ্ধান্ত হইতে আমরা আরম্ভ করিয়াছি তাহাতে অতিমানসের অস্তিত্বের একটা যুক্তিযুক্ত প্রয়োজন আছে। কারণ সচ্চিদানন্দ স্বরূপতঃ যে দেশ কালাতীত চৈতন্যময় চরম এক সত্তা ইহা মানিতে হইবে বটে; পক্ষান্তরে জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া আছে দেশে ও কালে, ইহা দেশে ও কালে কার্য্যকারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সম্বন্ধ ও সম্ভাবনা সমূহের একটা গতি একটা স্ফুরণ একটা রূপায়ণ—অন্ততঃ আমাদের তাহাই মনে হয়; এই কার্য্যকারণের খাঁটি নাম দিব্য বিধান (divine law), আবার এ দিব্য বিধানের মূল হইতেছে সৎ বস্তুর অবশ্যম্ভাবী আত্মরূপায়ণ, বস্তুর মূলগত এক বিজ্ঞানময় সত্যই এই ভাবে আত্মপরিণতি লাভ করিতেছে, ইহাতে অনন্ত সম্ভাবনার মধ্য হইতে একটা নির্দ্দিষ্ট বা বিশিষ্ট গতি বা ক্রিয়ার ধারা পূর্ব্ব হইতে স্থিরীকৃত হইয়া রহিয়াছে। সর্ব্ব পদার্থকে যাহা এইরূপে পরিণতির দিকে লইয়া যায় তাহা জ্ঞানময়ী ইচ্ছা বা চিতিশক্তি। কারণ চিৎশক্তিই সত্তার স্বরূপ, স্বভাব, আবার জগতের সকল প্রকাশ স্বরূপতঃ এই চিৎশক্তির খেলা ভিন্ন অন্য কিছু নহে; কিন্তু এই জ্ঞানময়ী ইচ্ছাশক্তি মনোময়ী শক্তি নহে; কেন না মন ত এ দিব্য বিধানকে জানে না, অথবা তাহার উপর মনের কোন শাসন বা অধিকার নাই, মনকেই তাহার শাসন মানিয়া চলিতে হয়। মন ইহার ক্রিয়ার একটা পরিণাম, আত্ম-পরিণামের প্রতিভাসেই মনের খেলা চলে, মূলের খবর সে রাখে না। পরিণতির ফলকে মন খণ্ড খণ্ড বস্তুরূপে দেখে এবং ইহার মূলে বা মর্ম্মগত সত্যে পৌঁছিবার বৃথা চেষ্টা করে। তাহা ছাড়া যাহা সকলকে ফুটাইয়া তুলিতেছে সেই জ্ঞানময়ী ইচ্ছাতে একটা একত্ব থাকিবে যাহা হইতে সে বহুত্বের প্রকাশ করিবে কিন্তু এ একত্ব মনের নাই, বহুর একাংশে মাত্র অসম্পূর্ণ প্রবেশাধিকার তাহার আছে।

সুতরাং মন যাহাতে অক্ষম সেই কার্য্যসাধনসমর্থ একটা উচ্চতর তত্ত্ব চাই। ইহা নিঃসন্দেহ যে সচ্চিদানন্দ নিজেই সেই তত্ত্ব কিন্তু শুদ্ধ অনন্ত নিশ্চল অক্ষর চৈতন্যের পরমস্থিতিরূপে যখন সচ্চিদানন্দ অবস্থিত এ তত্ত্ব সে অবস্থা নহে, কিন্তু তাহার এই আদি স্থিতির অবস্থা হইতে তাহারই মধ্যে তাহাকেই ভিত্তি করিয়া

তাহার শক্তিরূপে যে গতি ও প্রবৃত্তি উত্থিত হয়—যাহা বিশ্বসৃষ্টির যন্ত্র—ইহা তাহাই। শুদ্ধ সত্তার মধ্যে চৈতন্য এবং শক্তি এই দুইটী যমজ মূল বিভাব আছে। দেশ ও কালের ভূমিতে বিশ্বকে রূপায়িত করিয়া তুলিবার জন্য সৎকে প্রজ্ঞা এবং ইচ্ছাশক্তির আকার গ্রহণ করিতে হইবে। এই জ্ঞান ও ইচ্ছা এক, অনন্ত, সর্ব্বগ্রাহী, সর্ব্বাধার এবং সর্ব্বরূপায়ণক্ষম হইবেই, গতি এবং রূপের মধ্যে যাহা ফুটাইয়া তুলিবে তাহাকে শাশ্বত কাল ধরিয়া নিজের মধ্যে ধারণ করিয়া রাখিবে। অতএব সৎস্বরূপ যখন বিশিষ্ট বা নির্দ্দিষ্ট আত্মজ্ঞানে নিজের কোন সত্য অনুভব করেন, তখন দেশে ও কালে নিজের দেশকালাতীত সত্তার সম্প্রসারণ করিয়া সেই বিশিষ্ট জ্ঞান ফুটাইয়া তুলিতে ইচ্ছুক হন, তখনই তাহাকে অতিমানস বলা যায়। যাহা তাহার আত্মসত্তায় আছে তাহা তাহার আত্মজ্ঞানে রূপায়িত হয় ঋতচিৎ বা সদ্ভূতবিজ্ঞান রূপে এবং তাহার আত্মজ্ঞান এবং আত্মশক্তি অভিন্ন বলিয়া অপরিহার্য্যরূপে দেশে ও কালে তাহাই আত্মপ্রকাশ করে।

অতএব নিজের চিৎশক্তির ক্রিয়া দ্বারা নিজের মধ্যে যিনি সর্ব্বভূত সৃষ্টি করেন এবং আত্মপরিণামের ধারায় নিজ সত্তার সত্য বা সদ্ভূতবিজ্ঞানে অনুস্যূত জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তির দ্বারা বিসৃষ্টির যিনি পরিণতি ঘটান সেই ঐশীচেতনার প্রকৃতি এইরূপ। এইভাবে নিত্য চেতন সত্তাকে আমরা ঈশ্বর বলি। স্পষ্টতঃ এবং অবশ্যই তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান। তিনি সর্ব্বব্যাপী কারণ তাহার আত্মসম্প্রসারণে যে দেশ ও কাল দেখা দিয়াছে তন্মধ্যে সৃষ্ট সকল রূপ তাহারই সচেতন সত্তার আত্মরূপ। তিনি সর্ব্বজ্ঞ কেন না সর্ব্বভূত তাহার চিন্ময় সত্তার মধ্যে অবস্থিত, তাহা দ্বারাই রূপায়িত ও অধিকৃত; তিনি সর্ব্বশক্তিমান যেহেতু সর্ব্বগ্রাহী এই চৈতন্য সর্ব্বগ্রাহী শক্তি এবং সর্ব্বকৃৎ ইচ্ছাও বটে। তাহার মধ্যে ইচ্ছা ও জ্ঞানের কোন বিরোধ নাই, যেমন থাকিতে পারে আমাদের প্রাকৃত চেতনায়, কারণ তাহারা অভিন্ন, উভয়ই একই সত্তার একই ক্রিয়া বা গতি ভিন্ন অন্য কিছু নহে। ভিতর বা বাহির হইতে অন্য কোন ইচ্ছা, শক্তি বা চৈতন্য আসিয়াও তাহার জ্ঞান ও ইচ্ছার সঙ্গে কোন বিরোধ ঘটাইতে পারে না, কারণ সেই অদ্বয় তত্ত্বের বাহিরে কোন শক্তি বা চৈতন্য নাই, তাহার মধ্যে যে সমস্ত শক্তি ও জ্ঞানের রূপ আছে তাহাও তিনি ছাড়া কিছু নয়। তাহারা একেরই সর্ব্ব নিয়ামক ইচ্ছার এবং একেরই সর্ব্ব-সামঞ্জস্য বিধায়ক জ্ঞানের খেলা মাত্র।

আমরা বিশেষ ও বিভেদের রাজ্যে বাস করি এবং সমগ্রকে দেখিতে পাই না বলিয়া নানা ইচ্ছা ও জ্ঞানের মধ্যে যেখানে আমরা সংঘর্ষ ও সংঘাত বলিয়া অনুভব করি, সেখানে অতিমানস তাহাদিগকে, যাহা সে কখনও হারায় না এমন এক পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ছন্দ সুষমার অভিমুখী ও পরস্পরের সাহায্যকারী শক্তি বা উপাদানরূপে দেখে, কেন না তাহার দৃষ্টির সম্মুখে সর্ব্বপদার্থের সমগ্ররূপ নিত্য বর্ত্তমান।

অতিমানস বা ঐশীচেতনা যে কোন প্রতিষ্ঠা বা অবস্থিতিতে থাকুক না কেন, যে কোন রূপ ক্রিয়া বা প্রবৃত্তি তাহাতে দেখা দিক না কেন ইহাই তাহার নিত্য-প্রকৃতি। কিন্তু তাহার সত্তা স্বয়ংসিদ্ধ, আপনাতে আপনি অবস্থিত, ইহার শক্তিও তাহার আত্মব্যাপ্তিতে অব্যাহত ; কোন বিশেষ ভাবের অবস্থিতি বা কোন বিশিষ্ট ক্রিয়ার রূপে তাহা সীমিত নহে। মানুষ তাহার প্রাতিভাসিক বা ব্যবহারিক সত্তায় দেশ কালের অধীন এক বিশিষ্ট চৈতন্যের রূপ মাত্র, এবং যে বহিশ্চর বা প্রাকৃত চেতনাকে আমরা 'আমি' বলিয়া জানি তাহা এক সময় একটী বিশেষরূপে, একটী বিশেষ ভাবের প্রতিষ্ঠায়, অনুভবের এক বিশেষ সমবায়ে মাত্র থাকিতে পারে, এই বিশিষ্ট অবস্থাকেই আমরা আমাদের সত্য বলিয়া স্বীকার করি, বাকী সমস্ত আমাদের নিকট সত্য নয় কিম্বা এখন আর সত্য নয়, যে হেতু তাহা অতীতের গর্ভে লীন হইয়াছে এবং আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গিয়াছে অথবা এখনও তাহা সত্য হইয়া উঠে নাই, কারণ তাহা ভবিষ্যতের অঙ্কে রহিয়াছে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু ঐশীচেতনাতে এ ভাবের বৈশিষ্ট্য নাই এবং এ ভাবে তাহা সীমাবদ্ধ নয়। ইহা যুগপৎ বহুরূপ হইতে পারে অথবা নিত্যকাল ব্যাপিয়া একাধিক প্রতিষ্ঠায় অবস্থিত থাকিতে পারে। আমরা দেখিতে পাই বিশ্বপ্রসূ অতিমানস তত্ত্বে তিনটী পাদ বা অবস্থিতি (poise) সাধারণভাবে বিদ্যমান আছে। প্রথম পাদে আছে সর্ব্বসৃষ্টির অবিচ্ছেদ্য একত্বের প্রতিষ্ঠা, দ্বিতীয় পাদে এই একত্বকে এমনভাবে বিভাবিত করে যাহাতে একের মধ্যে বহু এবং বহুর মধ্যে এক দেখা দেয়, তৃতীয় পাদে ইহা আরও পরিবর্ত্তিত হয় যাহাতে তাহা বহু বিচিত্র ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ও পরিণতির আশ্রয় হইয়া উঠে এবং ইহা আমাদের চেতনার নিম্নতর ক্ষেত্রে নামিয়া আসিলে অবিদ্যার ক্রিয়া ফলে ভেদ ভাবের অহংরূপ ভ্রান্তিতে পরিণত হয়।

"সর্ব্বভূতের অবিচ্ছেদ্য একত্ববিধায়ক অতিমানসের এই প্রথম ও মুখ্য ভূমির

প্রকৃতি কি তাহা আমরা দেখিয়াছি। ইহা শুদ্ধ বা নিরুপাধিক অদ্বয়চেতনা নহে, কারণ তাহা সচ্চিদানন্দের দেশ কালাতীত আত্মসমাহিত অবস্থা, সেখানে চিৎশক্তির কোন প্রসারণের খেলা নাই, বিশ্ব সেখানে থাকিলেও শাশ্বত সম্ভাবনা বা ভব্য ("হইবে") রূপে মাত্র আছে, কালের ক্ষেত্রে বাস্তবতা বা ভূত ("হইয়াছে") রূপে নয়। কিন্তু এখানে সচ্চিদানন্দের সমব্যাপ্ত আত্মপ্রসারণ দেখা দিয়াছে ইহা সর্ব্বকে অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া, সর্ব্বকে অধিকার করিয়া, সর্ব্বকে প্রতিষ্ঠা করিয়া বর্তমান আছে কিন্তু সর্ব্ব এখানে এক, বহু নয়, ব্যষ্টিভাব এখনও তাহাতে দেখা দেয় নাই। নিশ্চল এবং শুদ্ধচিত্তে যখন অতিমানসের এই বিভাবের আলোক প্রতিফলিত হয় তখন আমাদের ব্যক্তিত্বের সকল অনুভূতি লোপ পায়, কারণ ব্যক্তিত্ব, রূপ, পরিণাম যাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে চৈতন্যের এমন কোন কেন্দ্রীকরণ সেখানে নাই। একত্বের মধ্যে এক রূপেই সর্ব্ব সেখানে প্রকাশিত, এই ঐশীচেতনাতে সর্ব্ব নিজ সত্তার রূপ বা ভাবরূপে ধৃত আছে, ভেদগত সত্তার কোন আভাসও দেখা দেয় নাই। যেমন আমাদের মনে চিন্তা কিম্বা কল্পনা জাগে—আমাদের হইতে কোন পৃথক সত্তারূপে নয় পরন্তু আমাদেরই চৈতন্য ঐ সমস্ত আকার ধারণ করে, এই আদি অতিমানসে সর্ব্বের সকল নাম ও রূপ কতকটা তদ্রূপ। ইহা অনন্তের মধ্যে শুদ্ধ দিব্য চেতনার বিজ্ঞান বা রূপায়ণ; সচেতন সত্তার সত্যলীলা বা খেলারূপে শুধু এ বিজ্ঞান বা রূপায়ণ দেখা দিয়াছে, আমাদের মনের চিন্তার মত বস্তুশূন্য কোন মিথ্যা খেলা নহে। এই ভূমিতে দিব্যপুরুষের চিন্ময় আত্মা এবং শক্তিময় আত্মাতে কোন ভেদ নাই কারণ এখানে সকল শক্তি চৈতন্যেরই ক্রিয়া, তেমনই সকল আধারই চৈতন্যের রূপ বলিয়া জড় ও চিতের মধ্যে ও এখানে কোন ভেদ নাই।

অতিমানসের দ্বিতীয় পাদে দিব্যচেতনা তাহার অন্তরস্থিত ক্রিয়া বা গতি হইতে বিজ্ঞানের মধ্যে সরিয়া দাঁড়াইয়া যাহা নিজের মধ্য হইতে কিছুকে (নিজেকে) বাহির করিয়া সম্মুখে স্থাপিত করে ও বিষয়রূপে দেখে, প্রজ্ঞানের সেই দৃষ্টি দ্বারা ইহা উপলব্ধি করে; ইহার অনুসরণ করে বা ইহার সহিত যুক্ত থাকে, ইহার সকল ক্রিয়াকে অধিকার করে, সকল ক্রিয়ার মধ্যে বাস করে, বোধ হয় যেন সে নিজেরই প্রতিরূপে নিজেকে ছড়াইয়া দিয়াছে। প্রতি নামরূপে একই স্থির সচেতন আত্মারূপে সে নিজেকে উপলব্ধি করে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে

এমন এক কেন্দ্রীভূত সচেতন আত্মারূপে দেখে যাহা ব্যষ্টিগত ক্রিয়ার খেলার সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া তাহাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে এবং সে খেলাকে অন্য খেলা হইতে পৃথক রাখিয়াছে, এইজন্য মূল আত্মচৈতন্যে এক হইয়াও আত্মার রূপে রূপে ভেদ দেখা দেয়। ব্যষ্টিচেতনার আশ্রয় স্বরূপ এই কেন্দ্রীভূত চেতনা ব্যষ্টিব্রহ্ম বা জীবাত্মাকে সমষ্টিরূপে সর্ব্ব-সংগঠনকারী চেতনা বা বিশ্বাত্মা হইতে যেন কিছু পৃথকরূপে দেখা যায়; এ উভয়ের মধ্যে মূলতঃ কোন ভেদ নাই, খেলার বা লীলার জন্য যে ব্যবহারিক ভেদ রহিয়াছে তাহাতে সত্য একত্ব বোধ কখনও লুপ্ত হয় না। বিশ্বাত্মা প্রত্যেক আত্মার রূপ বা প্রত্যেক ব্যষ্টিকে নিজের স্বরূপ বলিয়া জানেন অথচ প্রত্যেকের সঙ্গে পৃথক সম্বন্ধ স্থাপন করেন এবং প্রত্যেককে অপরের সহিত পৃথকরূপে যুক্ত করেন; দিব্য জীবাত্মা নিজের সত্তাকে সেই পরম একের আত্মরূপ এবং আত্মক্রিয়া বলিয়া অনুভব করে—অতিমানসের সংজ্ঞান বিভাবের অথবা সর্ব্বগ্রাহী চৈতন্যের প্রভাবে যেমন সে এক দিকে বিশ্বাত্মার এবং অপর সকল ব্যষ্টিরূপী আত্মরূপের সহিত একত্ব অনুভব করে—তেমনি অন্যদিকে অতিমানসের প্রজ্ঞানশক্তির বলে নিজের ব্যষ্টিক্রিয়ার আশ্রয় ও ভোক্তা হয়; অদ্বয় তত্ত্বের এবং অপর সকল ব্যষ্টিচেতনার সহিত থাকে তাহার এক স্বচ্ছন্দ ভেদাভেদের সম্পর্ক। আমাদের পরিশুদ্ধ চিত্তে অতিমানসের এই মধ্য স্থিতির আলোক প্রতিফলিত হইলে আমাদের আত্মা একদিকে আমাদের ব্যষ্টিগত সত্তার যেমন আশ্রয় ও অধিষ্ঠান হইতে পারে—তেমনি অন্যদিকে এই আধারের মধ্যে থাকিয়াও যিনি সর্ব্ব হইয়াছেন, সর্ব্বের মধ্যে বাস করিতেছেন, সর্ব্ব যাহার অন্তর্ভুক্ত সেই পরম এক বলিয়া নিজেকে উপলব্ধি করিতে পারিবে, এমন কি বিশিষ্ট ব্যষ্টিলীলার মধ্যেও ব্রহ্ম এবং অন্য জীবাত্মার সহিত একত্বের পরমানন্দ ভোগ করিতে পারিবে। অতিমানস সত্তার অন্য কোন অবস্থার কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিবে না, একমাত্র পরিবর্ত্তন হইবে, যে এক নিজের বহুত্ব প্রকাশ করিয়াছেন এবং যে বহু তথাপি এক রহিয়াছে তাহাদের লীলা বা খেলায় এবং তাহার সঙ্গে থাকিবে এই খেলা বজায় রাখিতে এবং পরিচালিত করিতে, যাহা কিছু আয়োজনের প্রয়োজন।

যে ঘনীভূত চৈতন্য অতিমানসের মধ্যস্থিতিতে আশ্রয়রূপে গতি বা ক্রিয়ার পশ্চাতে অবস্থিত ছিল অথচ যেন তাহা উপরে থাকিয়াও তাহার মধ্যে বাস,

তাহাকে অনুসরণ ও ভোগ করিতেছিল তাহা যখন সেখান হইতে সরিয়া যায় এবং গতির মধ্যে নিজেকে প্রসর্পিত করিয়া দিয়া যেন একভাবে তাহার মধ্যে সংবৃত হইয়া পড়ে, তখন অতিমানসের তৃতীয় অবস্থিতি দেখা দেয়। এখানে খেলার প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়া যায়, দিব্য জীবাত্মা তাহার সচেতন অভিজ্ঞতার ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিশ্বাত্মা এবং তাহার নিজের অনুরূপ বা অন্য জীবাত্মার সহিত ব্যবহারিক সম্বন্ধের উপর এরূপ জোর দেয়, যে পরম একত্ব জ্ঞান কেবল জীবাত্মার পরম আনুষঙ্গিক বা সহচারী ভাবনারূপে বর্তমান থাকে (ভিত্তিরূপে যেন নহে) অথবা সকল অভিজ্ঞতার পর্য্যবসানরূপে মাত্র সতত দেখা দেয়। কিন্তু ইহার উচ্চতর অবস্থায় অর্থাৎ অতিমানসের মধ্যস্থিতিতে একত্ব বোধই প্রধান এবং মৌলিক অভিজ্ঞতা এবং বৈচিত্র্য বা বহুত্ব একত্বেরই খেলা এই জ্ঞান সদা বর্তমান। সুতরাং অতিমানসের এই তৃতীয় অবস্থিতিতে একত্বের পটভূমিকায় বা একত্বের মধ্যে থাকিয়াই দিব্যজীবাত্মা এবং তাহার মূল স্বরূপ বিশ্বাত্মার মধ্যে এক প্রকার মৌলিক আনন্দময় দ্বৈতভাব দেখা দেয় এবং সেই দ্বৈতভাবের রক্ষা ও ক্রিয়ার জন্য আনুষঙ্গিক যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা আসিয়া পড়ে। মধ্যস্থিতিতে একত্বই প্রধান বহুত্ব, গৌণ এবং একত্বের অনুগত, অন্ত্যস্থিতিতে বহুত্ব স্পষ্ট হইয়া উঠে এবং একত্ব যেন একটু গৌণ ভাবে পশ্চাতে অবস্থান করে।

তবে কি বলা যাইবে যে এ অবস্থার প্রথম ফল হইবে অবিদ্যাতে পতন, যে অবিদ্যা বহুত্বকে সত্য এবং একত্বকে বহু ব্যক্তির বিরাট সমাহার বা যোগফল মাত্র মনে করে? কিন্তু এরূপ পতনের আশঙ্কার কোন কারণ নাই। কারণ এ অবস্থায় দিব্য জীবাত্মা নিজেকে একত্ব এবং তাহার সচেতন আত্মবিসৃষ্টির শক্তি হইতে জাত বলিয়া মনে করিবে। দেশ ও কালের মধ্যে নিজের বহু সত্তাকে বহুভাবে পরিচালিত ও আস্বাদন করিবার জন্য সেই এক নিজেকে বহু কেন্দ্রে যে কেন্দ্রীভূত করিয়াছেন, জীবাত্মা নিজে অনুভব করিবে যে সে তাহার এক কেন্দ্র। খাঁটি অধ্যাত্ম ক্ষেত্রের এই ব্যষ্টি পুরুষ তাহার যে স্বতন্ত্র নিঃসঙ্গ এবং বিবিক্ত সত্তা আছে এরূপ অনুচিত দাবি কখনও করিবে না। নিশ্চল একের সত্যের সঙ্গে যে গতি ও ক্রিয়া, বৈচিত্র্য এবং বহুত্ব সৃষ্টি করিতেছে তাহার সত্যকে দৃঢ়রূপে স্থাপিত করিতে চাহিবে মাত্র। এ উভয়কে একই সত্যের উচ্চতর ও নিম্নতর

মেরু অথবা একই দিব্যলীলার মূল ও পরিণতিরূপে দেখিবে। একত্বের আনন্দের পূর্ণতার জন্য বহুত্বের বা বৈচিত্র্যের আনন্দ প্রয়োজন ইহাই বলিবে।

স্পষ্টতঃ অতিমানসের এই তিনটি অবস্থিতি একই সত্যকে তিনটি ভিন্নভাবে দেখা মাত্র। সত্তার যে সত্যের আস্বাদন পাওয়া যায় তাহা তিনের মধ্যেই এক, আস্বাদনের ধারা অথবা আস্বাদনকারী আত্মার বিভঙ্গ বা দৃষ্টিভঙ্গী কেবল পৃথক হইবে। আনন্দের রূপে বৈচিত্র্য থাকিবে কিন্তু সকল অবস্থাই থাকিবে ঋত-চিতের ভূমিতে, মিথ্যা বা অবিদ্যার মধ্যে স্খলন বা পতন হইবে না। প্রথম অবস্থিতিতে অতিমানস দিব্য একত্বের মধ্যে যে দিব্যভাবসমূহ ধারণ করিয়া রাখিয়াছে অন্য দুইটী অবস্থিতিতে দিব্য বহুত্বের ভাষায় তাহাই শুধু ফুটিয়া উঠিবে। এই তিন ভাবের কোনটিতে আমরা মিথ্যা বা ভ্রমের ছাপ দিতে পারি না। এই সমস্ত উচ্চতর অভিজ্ঞতার সত্য সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক প্রাচীন উপনিষদের ভাষায় দেখিতে পাই যে তাহারা যেখানে সেই দিব্য পুরুষের আত্মপ্রকাশ লীলা বর্ণনা করিয়াছেন তথায় তাহারা এই সকল অভিজ্ঞতাই সিদ্ধ এবং প্রামাণিক বলিয়াছেন। আমরা কেবলমাত্র এই বলিতে পারি যে একত্ব বহুত্বের পূর্ব্ববর্ত্তী কিন্তু এ পূর্ব্ব-বর্ত্তিতা কালে নহে চৈতন্যের সম্বন্ধে, আধ্যাত্মিক কোন পরম অভিজ্ঞতা অথবা বেদান্ত দর্শনের কোন ধারাই এ পূর্ব্ববর্ত্তিতাকে অথবা বহু যে একের উপর চির প্রতিষ্ঠিত একথা অস্বীকার করে না। কালের মধ্যে বহুকে নিত্য মনে হয় না, এক হইতে বহুত্ব প্রকাশ হয় এবং বহু আবার মূলস্বরূপ সেই একত্বে ফিরিয়া যায় তাই বহু ভাব যে সত্য ইহা স্বীকার করা হয় না। কিন্তু সমানভাবে এ যুক্তি দিয়া দেখান যাইতে পারে যে বিশ্বাতীত পরম পুরুষের দিব্য একত্ব যতটা শাশ্বত তাহার দিব্য বহুত্বও তাহাপেক্ষা কম শাশ্বত নহে, ইহার প্রমাণ বহুত্বের নিত্যস্থিতি অথবা যদি ইচ্ছা হয় তবে বলিতে পার, কালের মধ্যে তাহাদের প্রকাশের নিত্য আবৃত্তি। এ দিব্য বহুত্ব যদি শাশ্বত না হইত কালের ক্ষেত্রে অপরিহার্য্যরূপে এই যে নিত্য আবৃত্তি বা পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া আসারূপ যে বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে তাহা থাকিত না।

বস্তুতঃ যখন মানুষের মন আধ্যাত্মিক অনুভবের অন্য সকল দিক বর্জ্জন করিয়া একদিক মাত্র দেখে এবং তাহার উপর বিশেষ জোর দেয়, তাহাকেই একমাত্র নিত্য ও ধ্রুব সত্য বলিয়া মনে করে এবং বিভেদকারী মানসিক যুক্তি বিচারের

ভাষায় তাহা প্রকাশ করে তখন পরস্পর বিবাদশীল এবং ধ্বংসকর দার্শনিক মত সমূহের প্রয়োজন ও জন্ম হয়। এইভাবে যখন একমাত্র অদ্বৈতচেতনার উপর জোর দিয়া, আমরা নিত্য একত্বের বহুভাবে খেলার দিকে দৃষ্টিপাত করি তখন ভুল করিয়া আমাদের মন উভয় অবস্থার মধ্যে খাঁটি বিভেদ দর্শন করে; সে সময় উচ্চতর তত্ত্বের সত্য দিয়া মনের ভুল না ভাঙ্গিয়া বহুত্বের' খেলাকে আমরা ভ্রম বলিয়া নির্দ্দেশ করি। অথবা বহুত্বের মধ্যে একত্বের খেলার উপর জোর দিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ খাড়া করি, জীবাত্মাকে পরমাত্মার এক বিশেষ আত্মরূপ মনে করি, এই বিশিষ্ট সত্তাকে নিত্য শাশ্বতরূপে দেখি, সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বিশেষ একত্বের শুদ্ধ চেতনার অভিজ্ঞতাকে একেবারেই অস্বীকার করিয়া বসি। আবার বহুত্বের খেলার উপর জোর দিয়া আমরা বলি, জীবাত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে ভেদ শাশ্বত এবং যে অভিজ্ঞতা ভেদকে অতিক্রম করে অথবা যাহা ভেদকে মুছিয়া ফেলে বলিয়া মনে হয় তাহার প্রামাণ্য অস্বীকার করি, কিন্তু দৃঢ়ভাবে যে মত আমরা গ্রহণ করিয়াছি তাহাতে এইরূপ কোন কিছু বাদ দেওয়া বা অস্বীকার করিবার প্রয়োজন হইতে আমরা মুক্ত হইয়াছি। আমরা দেখি এ সমস্ত উক্তির প্রত্যেকটীর পশ্চাতে একটা সত্য আছে কিন্তু প্রত্যেকের মধ্যেই একটা সঙ্গতসীমালঙ্ঘন বা বাহুল্য আছে যাহার ফলে একটা ভিত্তিহীন নেতিবাদ আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি যে আমাদের একত্ব বোধ এবং আমাদের বহুত্ব বোধের দ্বারা যিনি বদ্ধ নন সেই সর্বাতীত চরমতত্ত্বকে আমরা স্বীকার করি; যেমন একদিকে বহুত্ব একত্বের ভিত্তিতেই প্রকাশ হয়, তেমনি অন্যদিকে বহুত্বকে আশ্রয় করিয়াই একত্বে ফিরিতে হয়, এবং দিব্য-প্রকাশের মধ্যে একত্বের আনন্দ উপভোগ করা যায়—ইহাও মানি। অতএব এই সমস্ত তর্ক লইয়া আমরা আমাদের বর্ত্তমান বিবৃতিকে আর ভারাক্রান্ত করিতে অথবা অনন্তব্রহ্মের পরম স্বাধীনতাকে আমাদের প্রাকৃত মনের দেওয়া সংজ্ঞা বিশেষণ বা বিভেদের দ্বারা সীমিত করিবার বৃথা চেষ্টা করিতে চাই না।

সপ্তদশ অধ্যায়

দিব্য জীব

যাহার আত্মা সর্ব্বভূত হইয়াছে, যে হেতু তাহার জ্ঞান আছে, কোথা হইতে আসিবে তাহার মোহ, কোথা হইতে আসিবে তাহার শোক, যিনি সর্ব্বত্র একত্ব দেখিতেছেন?

ঈশোপনিষদ (৭)

অতিমানসের ধারণা আমরা কিছু লাভ করিয়াছি, আমাদের মানবসত্তা যে মননশক্তিরূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত. অতিমানস কিভাবে সেই মননশক্তির অপর কোটিতে অবস্থিত তাহাও কিছু জানিয়াছি, ইহার ফলে 'ভগবদ্‌ভাব' এবং 'দিব্যজীবন' সম্বন্ধে আমাদের অস্পষ্ট ধারণা অনেকটা সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিয়াছে। এই সুস্পষ্ট ধারণার অভাবে এ দুই শব্দ আমরা খানিকটা অনিশ্চিত অর্থে ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছি এবং ইহাদের সাহায্যে যাহা বৃহৎ অথচ যাহা ধরা ছোয়া যায় না এরূপ এক অভীপ্সার অস্পষ্টরূপ দিতে চাহিয়াছি; তাহা ছাড়া অতিমানসের সাহায্যে এই সমস্ত ধারণাকে দার্শনিক বিচারে একটা দৃঢ়-ভিত্তির উপর স্থাপিত করিতে পারিয়াছি। আমরা বর্ত্তমানে যে মানবতা এবং মানবজীবনের মধ্যে মাত্র রহিয়াছি তাহার সঙ্গে দিব্যভাব এবং দিব্যজীবনের একটা স্পষ্ট সম্বন্ধ দেখিতে পাইয়াছি। জগতের প্রকৃতি এবং আমাদের জগৎ-জীবনের পূর্ব্বতর অবস্থার জ্ঞান হইতে আমাদের আশা ও অভীপ্সার সমর্থন লাভ করিয়াছি এবং পরিণতির ফলে যেখানে আমরা নিশ্চয়ই পৌছিব তাহা বুঝিয়াছি। ঈশ্বর বা শাশ্বত সত্য কি, কি করিয়া তাহা হইতে জগৎসৃষ্টি হইয়াছে তাহা আমাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা ইহাও অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছি যে যাহা ঈশ্বর হইতে আসিয়াছে তাহা নিশ্চিতই ঈশ্বরে ফিরিয়া যাইবে। কিরূপে আমরা আমাদের রূপান্তর সাধন করিব এবং ভগবানে পৌছিবার জন্য—কেবলমাত্র একাকী আমাদের সত্তার গভীরে ডুবিয়া পরমানন্দের অনুভবলাভ জন্য নয় পরন্তু—আমাদের প্রকৃতিতে, আমাদের জীবনে এবং অপর সকলের সম্বন্ধে আমাদিগকে কি হইয়া উঠিতে হইবে, স্পষ্টভাবে এ প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়ার এবং তদ্বারা লাভবান হওয়ার সময় এখন আসিয়াছে।

ইহা অবশ্য নিশ্চিত যে যে সমস্ত হেতুবাক্য বা হেত্ববয়বের (premises) উপর আমাদের সিদ্ধান্ত নির্ভর করে তাহা পূর্ণভাবে এখনও দেখা হয় নাই; কারণ আমরা সীমিত প্রকৃতির মধ্যে ভগবানের অবতরণের দিকটাই এতক্ষণ দেখিয়াছি, কিন্তু সসীম প্রকৃতি হইতে নিজের মূল দিব্য সত্তায় পুনরায় উত্তরণের পথে যিনি চলিয়াছেন আমরা বস্তুতঃ সেই ব্যক্তিরূপী ভগবান। গতির এই বিভেদ হইতে দেবতা এবং মানুষের জীবনে তারতম্য আসিয়াছে, দেবতাকে পতন ও স্খলনের দুঃখ কখনই পাইতে হয় নাই। কিন্তু মানুষকে মুক্তি অর্জ্জন করিতে হয় তপস্যার মূল্য দিয়া; তাহার হারাইয়া যাওয়া দেবত্বের অধিকার তাহাকে লাভ করিতে হয় বীর্য্য ক্রিয়া এবং নিজের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া; হয়ত অতিপতন স্বীকার করিয়াই তাহার নূতন সম্পদ সংগ্রহের শক্তি ও সুযোগ আসে। তথাপি এ দুএর মধ্যে আকার ও বর্ণে শুধু ভেদ আছে কিন্তু স্বরূপ সত্যে কোন ভেদ নাই। যে সমস্ত সিদ্ধান্তে আমরা এতাবৎ পৌছিয়াছি তাহা হইতেই আমাদের অভিপ্সিত দিব্যজীবনের মূল প্রকৃতি নির্ণয় করিতে পারিব।

প্রথমে দেখা যাউক যখন জড়ের মধ্যে চিতের পতন হয় নাই, জড় প্রকৃতির দ্বারা জীবাত্মা ঢাকা পড়ে নাই সুতরাং অবিদ্যার মধ্যে নামিয়া আসে নাই তখন সে দিব্যাত্মার স্বরূপ কি হইবে? যখন সে দিব্য আত্মা ব্রহ্মসত্তারই ন্যায় তাহার স্বরূপ সত্যে অবিচ্ছেদ্য একত্বে, তাহার অনন্ত শাশ্বত নিজধামে অবস্থিত অথচ দিব্যমায়ার খেলায় ঋতচিতের সংজ্ঞান এবং প্রজ্ঞান শক্তিবৈচিত্র্যের প্রভাবে, ভগবানের তদ্রূপ সেই অদ্বয় তত্ত্বের বহুধা আত্মরূপায়ণরূপী অন্য সমস্ত দিব্য আত্মার সহিত যুগপৎ ভেদ ও অভেদ লীলারস আস্বাদনে সমর্থ—তখন তাহার চেতনা কিরূপ হইবে?

স্পষ্টতঃ সেরূপ আত্মার সত্তা সচ্চিদানন্দের চিন্ময় খেলার মধ্যে অবস্থিত থাকিবে, তাহার সত্তা হইবে শুদ্ধ অনন্ত সৎস্বরূপ; সম্ভূতিতে তাহার স্বাধীন অমর জীবনের খেলায় জন্মমৃত্যুর বা দেহ পরিবর্ত্তনের কোন আক্রমণ থাকিবে না, কারণ এখনও সে আত্মা অবিদ্যার মোহে আবৃত অথবা প্রাকৃত জড় সত্তার অন্ধকারে সংবৃত হইয়া পড়ে নাই। শক্তিরূপে এ চৈতন্য শুদ্ধ এবং অসীম, জ্যোতির্ময় প্রশান্তিতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত অথচ জ্ঞানের এবং সচেতন শক্তির অন্য সমস্ত রূপের সঙ্গে স্বাধীনভাবে খেলায় সমর্থ; মানসিক ভ্রান্তি বশে মানুষের

মধ্যে যেরূপ স্খলন বা পতন আছে, আমাদের সচেষ্ট ইচ্ছা বা সঙ্কল্পের যেমন ত্রুটি বা অনবধানতা আছে তেমন কিছু তাহাতে নাই, কারণ তাহা সত্য এবং একত্ব হইতে বিচ্যুত হয় না। দিব্যসত্তার প্রকৃতিসিদ্ধ আলোক এবং সহজ ও স্বাভাবিক ছন্দ সুষমার অভাব কখনও তাহাতে নাই। অবশেষে বলা যায় আপন শাশ্বত আত্ম-অভিজ্ঞতা বা আত্ম-প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সে শুদ্ধ অবিচ্ছেদ্য আনন্দ স্বরূপ; কালের ক্ষেত্রে তাহাতে থাকিবে—ঘৃণা-বিদ্বেষ-অতৃপ্তি বা দুঃখ-যন্ত্রণা দ্বারা অপরামৃষ্ট আনন্দের স্বাচ্ছন্দ্য এবং বিচিত্র প্রবাহ, কেন না সে আত্মা সত্তাতে অবিভক্ত, ভ্রান্ত সঙ্কল্প দ্বারা পরাজিত বা অন্ধ বাসনার তাড়নাদ্বারা বিপথচালিত নহে।

অনন্ত সত্যের কোন অংশ বা বিভাব ইহার চেতনার অনধিগম্য থাকিবে না; অপরের সঙ্গে সম্বন্ধের জন্য কোন স্থিতি বা অবস্থা গ্রহণ করিলেও তাহাতে তাহার নিজের মধ্যে কোন সীমার সঙ্কোচ আসিবে না; এমন কি প্রাতিভাসিক ব্যক্তিত্ব এবং ব্যবহারিক ভেদ স্বীকার করিয়া লইলেও তাহার আত্মজ্ঞানের কোন ন্যূনতা ঘটিবে না। নিজের আত্মসংবিতে সে সতত পরমতত্ত্বের সংস্পর্শে অবস্থিত থাকিবে। পরমতত্ত্ব আমাদের প্রাকৃত বুদ্ধির ধারণায় বা কল্পনায় অজ্ঞেয় অবর্ণনীয় সত্তা মাত্র। বুদ্ধি আমাদিগকে কেবল এই বলিতে পারে যে তাহা উচ্চ হইতেও উচ্চতম বা পরাৎপর এমন এক অবিজ্ঞেয় তত্ত্ব, আমাদের জ্ঞান হইতে পৃথক অন্য একভাবে যাহার আত্মজ্ঞান হয়। কিন্তু বুদ্ধি আমাদিগকে তাহার সান্নিধ্যে লইয়া যাইতে পারে না। পক্ষান্তরে বস্তুর স্বরূপসত্যে সদা অধিষ্ঠিত দিব্য আত্মা নিজেকে সেই পরমতত্ত্বের প্রকাশরূপে নিত্য অনুভব করে। তাহার অক্ষর সত্তায় নিজেকে স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দের মূল বিশ্বাতীত সত্তা বলিয়াই জানে, তাহার সচেতন সত্তার লীলায় সে সৎ চিৎ ও আনন্দের আকারে সেই তত্ত্বের প্রকাশ বলিয়া অনুভব করে। তাহার জ্ঞানের প্রত্যেক অবস্থা বা ক্রিয়ায় যিনি অবিজ্ঞেয় তিনিই বিচিত্র আত্মজ্ঞানে নিজেই নিজেকে জানিতেছেন ইহাই সে বোধ করে, শক্তির প্রত্যেক অবস্থায় বা খেলায় সে দেখে যে বিশ্বাতীত সত্তাই সচেতন শক্তি এবং জ্ঞানরূপে বিভাবিত হইতেছেন; তাহার আনন্দের প্রতি অবস্থা বা প্রকাশে সে অনুভব করে যে সচেতন ভাবে আত্মসম্ভোগের রূপে সে নিজেই নিজেকে আলিঙ্গন করিতেছে। পরমতত্ত্বের সহিত সাজুয্যের এই অনুভূতির

সাক্ষাৎ, সাময়িক বিদ্যুৎচমকের মত যে সে লাভ করে তাহা নহে, অথবা বহু আয়াসে এক চরম অবস্থায় ইহাতে পৌঁছিবে এবং অতিকষ্টে সে অনুভবকে স্থায়ী করিবে এরূপ নহে, কিম্বা পূর্ব্বে ছিল না পরে লাভ করিয়াছে এমন কোন সিদ্ধিরূপে যে ইহা আসিবে তাহাও নহে অথবা তাহার সত্তার উপর কোন চরমপরিণতিরূপে ইহা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে এমনও নহে; ভেদ এবং অভেদের উভয় অবস্থায়ই এ অনুভব তাহার সত্তা ও জীবনের ভিত্তি; তাহার জ্ঞানে, সঙ্কল্পে, কর্ম্মে ও ভোগে সর্ব্বসময় ইহা বর্ত্তমান থাকে। তাহার কালাতীত আত্মায় অথবা কালের কোন ক্ষণে, দেশাতীত তাহার সত্তায় অথবা দেশের মধ্যে বিস্তৃত তাহার কোন প্রকাশ বা বিভূতিতে, কার্য্যকারণ এবং ঘটনার অতীত তাহার শুদ্ধ নির্ব্বিশেষ অবস্থায় অথবা কার্য্যকারণের মধ্যে তাহার সবিশেষ এবং ব্যবহারিক স্থিতিতে কোন সময় অথবা কোথাও এ অনুভব বিলুপ্ত বা স্তিমিত হয় না। পরমতত্ত্বের এই নিত্য সাজুয্য তাহার অনন্ত আনন্দ ও স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তি, ইহা তাহার লীলা বা খেলাতে করে তাহাকে স্বপ্রতিষ্ঠ; তাহার দিব্য সত্তার ইহাই মূল, রস ও স্বরূপ।

তাহা ছাড়া পরমতত্ত্বের আত্মবিকাশে উৎপন্ন হইয়াছে যে দুইটী অবিচ্ছেদ্য প্রান্ত বা কোটি যাহাকে আমরা এক এবং বহু বলি, সচ্চিদানন্দের শাশ্বত সত্তার সেই দুইটী বিভাবের মধ্যে দিব্য আত্মা যুগপৎ বাস করে। সর্ব্বসত্তাই এইভাবে দুএর মধ্যে বাস করে; কিন্তু আমাদের খণ্ডিত আত্মজ্ঞান এ দুইয়ের মধ্যে একটা অসামঞ্জস্য একটা অনপনেয় বিরোধ একটা সমুদ্র ব্যবধান দেখিতে পায়, তাই এ উভয় হইতে একটা বাছিয়া লওয়ার দিকে সে চালিত হয়; হয় সে একত্বের পূর্ণ ও অপরোক্ষ চেতনা হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া বহুত্বের মধ্যে বাস করে, না হয় বহুত্বের চেতনাকে দূর করিয়া দিয়া একত্বে ডুবিয়া যাইতে চায়। কিন্তু দিব্য আত্মার এইরূপ ভেদ জ্ঞান নাই অথবা ইহাদের একতরকে বর্জ্জন করে না। সে জানে যে সময় সে অনন্তভাবে আত্মসমাহিত ঠিক সেই সময় অনন্ত ভাবে আত্মবিস্তৃত বা আত্মবিকীরিত হইয়া বর্ত্তমান আছে। তাহার অখণ্ড অদ্বৈত চেতনাতে বহুত্ব যেন সম্ভাবনারূপে রহিয়াছে; প্রকাশ না থাকাতে তাহা আমাদের মানসিক চেতনায় মনে হয় যেন অস্তিত্বহীনতার, শূন্যের বা অসতের অবস্থা; আবার সেই একের আত্মপ্রসারিত চৈতন্যে নিজের চেতনসত্তা, ইচ্ছা

বা আনন্দের খেলারূপে নিজের মধ্য হইতে ক্রিয়াশীল বহুত্ব বাহির করিয়া তাহা ধারণ করিয়া নিত্য বর্ত্তমান আছে। এ উভয় চেতনা এ উভয় ভাবের আত্ম-সংবিৎ দিব্য আত্মাতে যুগপৎ বর্ত্তমান আছে। সে যেমন জানে বহু তাহাদের সত্তার মূল ও শাশ্বত সত্যরূপী একত্বকে নিজেদের মধ্যে টানিয়া লইতেছে বা এক বহুরূপে প্রকাশ পাইতেছে; তেমনি ভাবে জানে যে যাহা তাহাদের শাশ্বত পর্য্যবসান এবং তাহাদের সকল খেলার আনন্দময় সমর্থন ও সার্থকতা, সেই একের দিকে আকৃষ্ট হইয়া বহু সতত তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে, বা বহু একত্বে ফিরিয়া যাইতেছে। এই ভাবের বিশাল দৃষ্টিই সত্য-চেতনার মূলগত ভাব ও ভিত্তি; বৈদিক ঋষিরা 'সত্যং ঋতং বৃহৎ' নামে ইহারই স্তবগান করিয়াছেন; যাহাতে এই সমস্ত বিরোধের পরম সমন্বয় ও মিলন আছে তাহাই যথার্থ 'অদ্বৈত' 'অদ্বৈত' সেই সর্ব্বগ্রাহী পরমশব্দ যাহার মধ্যে অবিজ্ঞেয় তত্ত্বের জ্ঞানের গভীর ব্যঞ্জনা পাওয়া যায়।

দিব্য আত্মা সত্তা, চৈতন্য, ইচ্ছা এবং আনন্দের বহু বৈচিত্র্যকে, যিনি আত্মসমাহিত পরমএকরূপে বর্ত্তমান আছেন তাহার আত্মপ্রসারণ বা আত্ম-বিকীরণ বলিয়া জানে, এই যে তাহার নিজেকে নিজে ফুটাইয়া তোলা ইহা নিজেকে ভেদ দ্বারা খণ্ডিত করা নয়, তাহার অনন্ত একত্বেরই এক ভাবের বিস্তার। দিব্যাত্মা নিজে তাহার মূল অদ্বৈত স্বরূপে যেরূপ নিত্য সমাহিত তদ্রূপ তাহার সত্তার আত্মবিস্তারের বিচিত্র প্রকাশের মধ্যেও নিত্য বর্ত্তমান। তাহার মধ্যে যাহা কিছু রূপায়িত হইয়া উঠিতেছে তাহা একের মধ্যস্থিত বহু সম্ভাবনার প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়ঃ—নামহীন নৈঃশব্দ্য হইতে বাক বা নামের জাগরণ, অরূপের স্বরূপ হইতে রূপের উদ্ভব, সমাহিত এবং স্থির শক্তি হইতে ক্রিয়াশীল ইচ্ছা বা শক্তির প্রকাশ, কালাতীত আত্মসংবিৎ সূর্য্য হইতে আত্মপ্রত্যয় বা আত্মজ্ঞানের রশ্মির অভ্যুদয়, যাহাকে অসম্ভূতি বলা হয় সেই আত্ম-সচেতন সত্তা সমুদ্রের বুকে আত্মসচেতন সম্ভূতি-তরঙ্গের খেলা, নিত্য শুদ্ধ আনন্দ হইতে প্রেম ও হর্ষের উৎসারণ। পরমতত্ত্ব নিজের আত্মপ্রকাশে এই দুই ভাব গ্রহণ করেন, ইহার মধ্যে প্রত্যেক বিশেষ নিজেকে নির্ব্বিশেষ আত্মপ্রকাশ বলিয়া জানে সুতরাং সে বিশেষ হইয়াও নিজের কাছে নির্ব্বিশেষ, অথচ যে অবিদ্যা অন্য বিশেষকে তাহার নিজ সত্তা হইতে পৃথক, অনাত্মীয়

অথবা নিজ হইতে অপূর্ণ এই বোধ জাগায়, সে অবিদ্যার সংস্পর্শ ইহার মধ্যে নাই।

ব্যাপ্তিতে অতিমানসের তিনটী স্থিতিই দিব্য আত্মার চৈতন্যে থাকিবে, আমাদের মন যে ভাবে পৃথক শ্রেণী বা পর্ব্বরূপে দেখে তেমনভাবে নয় পরন্তু সচ্চিদানন্দের আত্মপ্রকাশে ত্রিধারা বা ত্রৈকভাবনারূপে। তাহার একই ব্যাপক আত্মোপলব্ধির মধ্যে এ তিন ভাব একসঙ্গে বর্ত্তমান থাকিবে, কেননা সর্ব্বগ্রাহী বৃহৎ পরিব্যাপ্তিই অতিমানস বা ঋতচিত্তের স্বধর্ম্ম বা স্বভাব। অতি-মানসের দিব্যদৃষ্টিতে অনুভবে বা বোধে সর্ব্বভূতই দেখা দিবে আত্মরূপে, সে-আত্মা তাহার নিজের আত্মা, সকলেরই এক আত্মা, একই আত্মসত্তা, একই আত্মসম্ভূতি (self-being and self-becoming)। সম্ভূতিতে বা প্রকাশেও সে আত্মা অবিভক্তই থাকিবে, কারণ তাহার আত্মচৈতন্যের বাহিরে বা তাহা হইতে পৃথক ভাবের কোন কিছু সম্ভূতি বা প্রকাশের মধ্যে থাকিতে পারে না। সেই দিব্যদৃষ্টি, অনুভব বা বোধে সর্ব্বভূত বা সর্ব্ব সত্তা দেখা দিবে একেরই চিন্ময়-বিগ্রহরূপে, প্রতি বিগ্রহের সত্তা থাকিবে একেরই মধ্যে, তাহার বৈশিষ্ট্য থাকিবে সেই একের মধ্যে, অনন্ত একত্বের মধ্যে অন্য যে সমস্ত সত্তা আছে তাহাদের সহিত সম্বন্ধ থাকিবে সেই একের মধ্যে কিন্তু সমস্ত সত্তা হইবে একের অনুগত, কেননা তাহার অন্তহীন সচেতন আত্মরূপায়ণে প্রত্যেক সত্তাই তাহার একরূপ। আবার এ দিব্যদৃষ্টিতে অনুভবে এবং বোধে এই সর্ব্ব সত্তাই তাহাদের দিব্য-ব্যক্তিত্ব তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী বা বৈশিষ্ট্য লইয়া দেখা দিবে, অথচ প্রত্যেক সত্তা একের সহিত বাস করিবে, সেই পরমএক তাহাদের মধ্যে বাস করিবেন সুতরাং ইহাদের কেহই ছায়ামূর্ত্তির মত সর্ব্বতোভাবে অলীক অথবা অখণ্ড সত্যের একটা মায়াময় বা মিথ্যা অংশ কিম্বা অচঞ্চল সমুদ্রের কেবলমাত্র ফেনোচ্ছল তরঙ্গ মাত্র নয়। সব দিক দিয়া ভালভাবে দেখিলে আমরা বুঝিব এ সমস্ত আমাদের মনের দেওয়া অপূর্ণ উপমা মাত্র, যখন আমরা রূপের পিছনে গিয়া ইহাকে পূর্ণরূপে দেখি, তখন ইহাদের প্রত্যেকেই পূর্ণের মধ্যে পূর্ণ, প্রত্যেকে এক সত্য যাহা অনন্ত সত্যের পুনরাবৃত্তি, প্রত্যেকে একটা তরঙ্গ যাহা পূর্ণ সমুদ্র, প্রত্যেকে একটা বিশেষ যাহা নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব।

কারণ মানুষী ব্রহ্মানুভূতিতে আত্মবিজ্ঞানের এই যে তিনটী রূপ তাহা

অখণ্ড সৎ-স্বরূপের তিনটী বিশিষ্ট বিভাব। উপনিষদের তিনটী সূত্রে ইহাদের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম সূত্র 'সর্ব্বভূতানি আত্মৈবাভূৎ' আমাদের আত্মাই সর্ব্বভূত বা সর্ব্বসত্তা; দ্বিতীয় সূত্র 'সর্ব্বানি-ভূতানি আত্মন্যেবা' সর্ব্বভূত আত্মার মধ্যেই অবস্থিত, তৃতীয় সূত্র 'সর্ব্বভূতেষু আত্মানম্' সর্ব্বভূতের মধ্যে আত্মা অবস্থিত। আত্মাই সর্ব্বভূত হইয়াছে, ইহাই আমাদের সকলের মধ্যে একত্বদর্শনের বা সর্ব্বাত্মভাবের অনুভূতির ভিত্তি; আত্মাতেই রহিয়াছে সর্ব্বভূত এই অনুভবই আমাদের ভেদের মধ্যেও অভেদ দর্শনের ভিত্তি; আর সর্ব্বভূতেই আত্মা আছে এই অনুভব সার্ব্বভৌম সত্তার মধ্যে আমাদের জীবব্যক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠার ভিত্তি। আমাদের মন আত্মজ্ঞানের এই তিন বিভাবের মধ্যে অন্য দুইটীকে বাদ দিয়া কোন একটীতে একান্ত ভাবে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়ে, এই ভাবের অপূর্ণ এবং ব্যতিরেকী অনুভবের ফলে মানুষ সত্যের অনুভবের মধ্যেও মিথ্যার উপাদান আনিয়া ফেলে; সর্ব্বগ্রাহী একত্ব জ্ঞানের মধ্যেও বিরোধ এবং পরস্পর খণ্ডনের চেষ্টা আসিয়া পড়ে, কিন্তু অতিমানসের মূল-স্বভাবই হইতেছে সর্ব্বগ্রাহী একত্ব এবং অখণ্ড পূর্ণতাকে দর্শন করা, তাই দিব্য অতিমানস সত্তার নিকট এই তিন অনুভব ত্রিধারাযুক্ত একই অনুভব বলিয়া বোধ হইবে।

যখন দিব্য জীব ব্যষ্টিরূপী ভাগবত চৈতন্যে সুস্থিত বা কেন্দ্রীভূত হইয়া তথাকথিত "অপরাপর" জীবের সহিত জীবনে কর্ম্মে বিশিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপন করে, তখনও সর্ব্বভূতের উৎস সেই অখণ্ড অদ্বৈত চেতনাই তাহার মর্ম্মমূলে বর্ত্তমান, আবার সেই সঙ্গে সেই চেতনার প্রসারতা স্বরূপ বিশিষ্টাদ্বৈত চেতনা তাহার চৈতন্যের পটভূমিকায় অবস্থিত; এবং যে কোন সময় এ সব ভাবের কোন ভাবে সে চেতনা ফিরিয়া গিয়া তথা হইতে জীবলীলার আস্বাদন করিতে পারে, বেদে দেবতার সম্বন্ধে এই তিন ভাবের অবস্থিতির কথা বলা হইয়াছে। স্বরূপতঃ দেবতারা এক, কেবল ঋষিরা তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন নামে আবাহন করেন—'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'। 'সত্যং ঋতং বৃহৎ' বা অতিমানসে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এবং তথা হইতে ক্রিয়ার মধ্যে যখন প্রকাশিত হন, তখন যে কোন দেবতাকে, যথা অগ্নিকে অন্য সকল দেবতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি সেই এক যিনি বহু হইয়াছেন, আবার সেই সময়ই চক্রনাভিতে অবস্থিত অর বা পাখা-

সমূহের মত সর্বদেবতা তাহারই অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে অর্থাৎ তিনি সেই এক যাহার মধ্যে অন্য সকল আছে, এবং তথাপি অগ্নিকে পৃথক দেবতারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, তিনি অন্য সকল দেবতাকে সাহায্য করেন এবং জ্ঞানে ও শক্তিতে সকলকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছেন, তবু আবার বিশ্বে তাহার স্থান অন্য দেবতার নীচে, যাহাকে তাহার দূত, পুরোহিত বা কর্ম্মীরূপে নিযুক্ত করেন, তিনি বিশ্বস্রষ্টা এবং বিশ্বপিতা, তথাপি তিনি পুত্র আমাদের কর্ম্ম হইতে জাত হন, অর্থাৎ তিনি অনাদি, প্রকাশে তিনি অন্তর্যামী আত্মা বা ভগবান, তিনি সেই এক সর্ব্বের মধ্যে যাহার বাস।

ভগবানের সঙ্গে বা তাহার নিজেরই যে পরম আত্মা তাহার সঙ্গে এবং অন্যান্য রূপের মধ্যে তাহার অন্যান্য যে আপন আত্মা তাহাদের সঙ্গে অতিমানস বা দিব্য জীব তাহার যাবতীয় সম্বন্ধকে, এই সর্ব্বব্যাপী আত্মজ্ঞান দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করিবে। এই সম্বন্ধ হইবে সত্তা, চৈতন্য, জ্ঞান, সঙ্কল্প, ইচ্ছা, প্রেম ও আনন্দের সম্বন্ধ। বৈচিত্র্যের অনন্ত সম্ভাবনা তাহাতে আছে, তাই ভেদের, প্রতিভাসের মধ্যেও যাহা অবিচ্ছেদ্য একত্ববোধের সহিত সঙ্গতিবিশিষ্ট, জীবের সঙ্গে জীবের তেমন কোন সম্ভাবিত সম্বন্ধই বাদ দিবার প্রয়োজন সেখানে হইবে না। এইভাবে একদিকে তাহার ভোগে থাকিবে আত্মারামের নিজেতে নিজের অভিজ্ঞতা-সম্ভোগের আনন্দ, অন্যদিকে থাকিবে জগতে লীলাবৈচিত্র্যের জন্য সৃষ্ট অন্য আত্মা বা অন্যরূপের সহিত যুক্ত হইয়া নানা সম্বন্ধের নানা ভাবের অভিজ্ঞতা বা অনুভবলাভের আনন্দ। আবার বস্তুতঃ যাহারা তাহার নিজেরই আত্মা অন্য সেই সকল আত্মাতে যে সমস্ত অনুভব হইবে তাহাও নিজের অনুভব বলিয়া ভোগ করিবার আনন্দ তাহাতে বর্ত্তমান থাকিবে। এই বিচিত্র এবং বিপুল সম্ভাবনা তাহাতে আছে, কেন না সে জানে যে তাহার নিজের অনুভব, অপরের সহিত তাহার সম্বন্ধ, অপরের অভিজ্ঞতা বা অনুভব এবং তাহাদের সহিত তাহার নিজের সম্বন্ধ এ সমস্তই একের, পরমাত্মার, তাহারই আত্মার আনন্দ এবং রসোল্লাস। তাহার সর্ব্বব্যাপী সত্তার মধ্যে নানারূপ ভেদ সৃষ্ট হইয়াছে কিন্তু প্রতি রূপ তাহারই বাসস্থান, তাই ভেদের মধ্যেও একত্ব নিত্য বর্ত্তমান। এই একত্ব ইহার সকল অনুভবের ভিত্তি বলিয়া অবিদ্যা এবং বিভেদকারী অহং-এর দ্বারা যে ভেদজ্ঞান ও বিরোধ আমাদের বিবিক্ত চেতনায় আসিয়াছে

তাহাদের স্থান দিব্য আত্মার চেতনায় নাই। এই সমস্ত দিব্যাত্মা এবং তাহাদের সম্বন্ধ নির্ব্বিরোধে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইবে; একটা শাশ্বত সুরসঙ্গতির মধ্যে স্থিত অগণ্য সুররূপে তাহারা পরস্পর হইতে পৃথক হইবে আবার পরস্পরের মধ্যে মিলাইয়া যাইবে।

দিব্য জীবের সত্তা, জ্ঞান ও ইচ্ছার সহিত অপর জীবের সত্তা, জ্ঞান ও ইচ্ছার যে সম্বন্ধ আছে তাহাতেও এই একই বিধান খাটিবে। তাহার সকল অনুভব ও আনন্দ সচ্চিদানন্দশক্তির খেলা বলিয়া একত্বের সত্যের প্রভাবে তাহার জ্ঞান, ইচ্ছা বা আনন্দের, কাহারও সঙ্গে কাহারও যেমন বিরোধ বা অসঙ্গতি থাকিতে পারে না তেমনি আবার এক দিব্য আত্মার জ্ঞান, ইচ্ছা ও আনন্দের সহিত অন্য আত্মার জ্ঞান, ইচ্ছা ও আনন্দের কোন সংঘর্ষ বা অসঙ্গতি থাকিতে পারে না। কারণ আমাদের খণ্ড চেতনায় আমরা যাহা সংঘর্ষ বা বিরোধ বলিয়া অনুভব করি, তাহাদের একত্ববোধযুক্ত চেতনায় তাহা অনন্ত সুরসঙ্গতির নানা সুরলীলারূপে সাক্ষাৎ করিবে, অন্যান্যের উপর ক্রিয়া করিবে এবং পরস্পর মিলিত হইবে।

পরমাত্মা বা ঈশ্বরের সহিত এই দিব্য জীবের সম্বন্ধও হইবে পরম একত্বের সম্বন্ধ। তাহার নিজ সত্তার সহিত বিশ্বাতীত পুরুষ ও বিশ্বপুরুষ একীভূত, এ বোধ তাহাতে থাকিবে। তাহার নিজের ব্যষ্টিসত্তা ঈশ্বরের সহিত একীভূত এ অনুভূতি যেমন তাহার হইবে, তেমনি সার্ব্বভৌমভাবে অন্য সমস্ত আত্মার সহিত নিজের একাত্মতার অনুভবও তাহাতে বর্ত্তমান থাকিবে। তাহার জ্ঞানের সকল সম্বন্ধ, সকল ক্ষেত্র হইবে দিব্য সর্ব্বজ্ঞের লীলা, কারণ ব্রহ্ম জ্ঞান স্বরূপ, আমাদের কাছে যাহা অজ্ঞান তাহা তাহার আত্মসংবিতের মধ্যে বিশ্রামের জন্য জ্ঞানের সংহরণ মাত্র, যাহার ফলে আত্মবোধের কোন বিশিষ্ট আকারকে পুরোভাগে আনিয়া সক্রিয় ভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে। তাহার ইচ্ছার সকল সম্বন্ধ, সকল ক্ষেত্র হইবে দিব্য সর্ব্বশক্তিমত্তার লীলা, কারণ ব্রহ্মই ইচ্ছা শক্তি ও বীর্য্য স্বরূপ, আমাদের মধ্যে যাহা দুর্ব্বলতা বা অসামর্থ্য তাহা তাহার স্থির আত্মসমাহিত শক্তির মধ্যে তাহার ইচ্ছার সংহরণ মাত্র, যাহার ফলে দিব্য সচেতন শক্তির কোন বিশিষ্ট ভাব শক্তিরূপে সম্মুখে আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। তাহার প্রেম ও আনন্দের সকল সম্বন্ধ সকল ক্ষেত্র হইবে দিব্য পর-

মানন্দের লীলা, কারণ ব্রহ্ম প্রেম ও আনন্দ স্বরূপ, আমাদের কাছে যাহা অপ্রেম বা নিরানন্দ তাহা তাহার স্থির পরমানন্দসাগরে আনন্দের সংহরণ মাত্র, যাহাতে বিশেষ ভাবের দিব্য মিলন এবং সম্ভোগের আনন্দতরঙ্গ সম্মুখে আসিয়া সক্রিয়ভাবে উৎসারিত হইয়া পড়িতে পারে। এইভাবে এই সমস্ত ক্রিয়ার সাড়ায় সকল সম্ভূতি সদভাবেরই রূপায়ণরূপে ফুটিয়া উঠে এবং যাহা আমাদের কাছে বিরতি, মৃত্যু বা বিনাশ তাহা সচ্চিদানন্দের শাশ্বত সত্তার আনন্দময়ী সৃষ্টিশীলা প্রকৃতির বিশ্রাম, রূপান্তর বা আত্মসংহরণ মাত্র। এই একত্ববোধের সহিত, একত্বকে অন্যভাবে অনুভব ও সম্ভোগ করিবার জন্য একত্ব হইতে নিজেকে পৃথক করিয়া দেখা এবং সেই ভেদের আনন্দের উপর স্থাপিত ঈশ্বর বা পরমাত্মার সহিত নানা সম্বন্ধ রক্ষারও কোন বাধা হইবে না। ভগবানের আলিঙ্গনে আবদ্ধ ভগবদ্‌প্রেমিকের নানাভাবে ভগবদনুভবজনিত পরমানন্দের যে সমস্ত বিচিত্র অতিরম্য রসোল্লাস সম্ভব হইতে পারে তাহার কিছুই নষ্ট হইবে না।

কিন্তু কোন্ পরিবেশে কোন্ অবস্থায় এবং কিসের সহায়ে দিব্য বা অতিমানস জীবের জীবনের এই প্রকৃতি আত্মপ্রকাশ বা আত্মানুভব করিবে? সম্বন্ধের বা ব্যবহারিক জগতের সকল অভিজ্ঞতা বা অনুভব সম্ভব হয় সত্তার কতকগুলি বিশেষ বিশেষ শক্তির মধ্যস্থতায়, যাহাদিগকে আমরা ধর্ম্ম, গুণ, ক্রিয়া বা বৃত্তিরূপে অভিহিত করি। একটা উদাহরণ লওয়া যাউক, যেমন মন ব্যবহারিক জগতের অভিজ্ঞতার জন্য স্বাভাবিক মানসিকসত্তা জাত নানা শক্তি যথা বিচার, পর্য্যবেক্ষণ স্মৃতি, সমবেদনা প্রকৃতি ব্যবহার করে, তদ্রূপ অতিমানসকেও জীবে জীবে সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য অতিমানসসত্তা জাত কতকগুলি শক্তি, বৃত্তি ও ক্রিয়া ব্যবহার করিতে হয়, তাহা না হইলে বৈচিত্র্যের খেলা চলিতে পারে না; যখন আমরা দিব্যজীবনের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার কথা বিবেচনা করিব তখন এই সমস্ত শক্তি বা ক্রিয়া কিরূপ হইবে তাহা দেখিব। বর্ত্তমানে আমরা ইহার দার্শনিক বা তাত্ত্বিক ভিত্তি বা মূলপ্রকৃতির কথাই আলোচনা করিতেছি। এখন এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে দিব্যজীবনলাভের মূল মন্ত্র বা মূল সর্ত্ত হইতেছে, ভেদদর্শী অহংবোধ এবং ব্যবহারিক চেতনার খণ্ডজ্ঞানের অভাব বা উচ্ছেদ। কারণ এই দুইএর মধ্যে রহিয়াছে বলিয়াই মানুষ মরণধর্ম্মী, ব্রাহ্মীস্থিতি হইতে

বিচ্যুত। ইহুদীশাস্ত্রে ইহাকে মানুষের 'আদি পাপ' (original sin) বলিয়াছে, অথবা আরও দার্শনিক ভাষায় আমরা বলিতে পারি আত্মার সত্য এবং ঋত হইতে আমরা ভ্রষ্ট হইয়াছি; তাহার একত্ব, পূর্ণত্ব এবং সুষমা হইতে চ্যুত হইয়াছি; জগতে আত্মার যে বিপদসঙ্কুল অভিযান তাহার জন্য অজ্ঞানের মধ্যে এইরূপ প্রবলভাবে ঝাঁপাইয়া পড়িবার প্রয়োজন ছিল। ইহা হইতেই আমাদের দুঃখ আসিয়াছে এবং মানুষের হৃদয়ে অভীপ্সার বহ্নিশিখা জ্বলিয়াছে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

মন এবং অতিমানস

তিনি মনকেও ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারিলেন।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ (৩।৪)

অবিভক্ত হইয়াও, সর্ব্বভূতে যেন তিনি বিভক্ত হইয়া আছেন। গীতা (১৩।১৬)

সচ্চিদানন্দের সত্তাতে দৃঢ়ভাবে অবস্থিত দিব্য পুরুষের অতিমানসজীবন স্বরূপতঃ কি তাহার একটা ধারণা করিতে এতক্ষণ চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু সচ্চিদানন্দের মানবদেহে, মনোময় জড় জীবনেও সেই দিব্যজীবন ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু অতিমানস সত্তার যেটুকু আমরা জানিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাতে দেহ ও মনরূপী এই দুই নভোমণ্ডলের মধ্যে স্থিত আমাদের প্রাকৃত বা স্বাভাবিক যে জীবনকে আমরা জানি, তাহার সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক বা ঐক্য আছে বলিয়া মনে হয় না। বরং মনে হয় ইহা শুদ্ধ সত্তা, চৈতন্য এবং আনন্দের একটা প্রকাশাবস্থা; যে লোকে আত্মা দেহকারাগারে বদ্ধ হয় নাই, যেখানে আত্মার বৈচিত্র্য দেখা দিয়াছে কিন্তু দেহের ভেদ এখনও স্থান পায় নাই, যেখানে সক্রিয় চেতনা অনন্তের আনন্দোল্লাসে উচ্ছ্বসিত, জড় আকার শূন্য যে লোক শুধু বিদেহ আত্মার সক্রিয় সম্বন্ধ বা পরস্পর সম্ভোগস্থান, ইহা যেন মনে হয় অতিমানস জীবন তেমন লোকেই সম্ভব। সুতরাং বিচার বুদ্ধিতে সন্দেহ আসে, যে জীবনকে আমরা জানি যেখানে দেহ সীমার মধ্যে সঙ্কুচিত, মন রূপের কারাগারে বন্দী, শক্তি রূপের জালে বদ্ধ, সেখানে সেরূপ দিব্যজীবন কি সম্ভব?

বস্তুতঃ আমাদের জগৎ যাহা হইতে সৃষ্ট এবং আমাদের মনশ্চেতনা যাহার বিকৃতরূপ, সেই অনন্ত পরমসত্তা চিৎশক্তি এবং আনন্দস্বরূপের কিছু কিছু ধারণা করিতে আমরা চেষ্টা করিয়াছি। এই ভাগবতী মায়া, এই ঋতচিৎ, এই সম্ভূত-

বিজ্ঞান যাহা দ্বারা বিশ্বাতীত এবং বিশ্বপুরুষ নিজ সত্তার আনন্দোচ্ছ্বাসের প্রকাশরূপে জগৎ এবং তাহার ছন্দের ধারণা বা কল্পনা করেন, গড়িয়া তোলেন, এবং পরিচালিত করেন তাহারও কিছু পরিচয় পাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। কিন্তু সৎ, চিৎ, আনন্দ ও অতিমানস এই দিব্য মহান চতুষ্টয়ীর সঙ্গে মানুষরূপী আমাদের নিকট কেবল যাহা পরিচিত সেই মন প্রাণ ও দেহরূপী ত্রয়ীর সহিত কি সম্পর্ক তাহা আলোচনা করি নাই। আমাদের সকল চেষ্টা ও সকল দুঃখের মূল অপরা এবং আপাতদৃশ্যে অদৈবী এই মায়াকে ভালরূপে পরীক্ষা করি নাই, ঠিক কিভাবে দিব্য সত্য বা ভাগবতী মায়া হইতে ইহার উদ্ভব হইল তাহাও দেখি নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা না করিতেছি, যতক্ষণ পর্য্যন্ত এ দুইএর হারানো যোগসূত্র খুঁজিয়া না পাইতেছি ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিশ্বরহস্যের কোন মীমাংসা বা উচ্চতর সত্তার সহিত নিম্নতর জীবনের মিলন কখনও সম্ভব হইবে কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহভঞ্জন হইতেছে না। আমরা জানি যে আমাদের জগৎ সচ্চিদানন্দ হইতে আসিয়াছে এবং তাহার সত্তাতেই অবস্থিত রহিয়াছে; এ ধারণাও আমাদের আছে যে তিনি জগন্নিবাস, বিশ্বের ভোক্তা এবং জ্ঞাতা, প্রভু এবং আত্মা। ইহাও বুঝিতেছি যে দ্বৈত ভাবে বিভাবিত হইলেও আমাদের ইন্দ্রিয়বোধ মন, শক্তি এবং সত্তা তাহারই আনন্দ, তাহারই চিৎশক্তি, তাহারই দিব্য সত্তার প্রতিরূপ বা প্রতিভূ ভিন্ন অন্য কিছু নয়। কিন্তু তবু মনে হয় ইহারা বস্তুতঃ তাহার লোকোত্তর সত্যের এত বেশী বিপরীত যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই বৈপরিত্যের মধ্যে বাস করিতেছি বা আমরা সত্তার এই নিম্নতর ত্রয়ীর মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছি ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা দিব্যজীবন লাভ করিতে পরিব না। তজ্জন্য হয় আমাদের এই নিম্নতর সত্তাকে উচ্চতর অবস্থায় উন্নীত করিতে হইবে, অথবা দেহের বিনিময়ে সেই শুদ্ধ সত্তা, প্রাণের বিনিময়ে চিৎশক্তির শুদ্ধাবস্থা, ইন্দ্রিয়বোধ এবং মনের বিনিময়ে অবিমিশ্র আনন্দ ও জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। ইহার অর্থ কি এই হইবে না যে আমাদের এই পার্থিব এবং সীমিত মানসিক সত্তা ত্যাগ করিয়া ইহার ঠিক বিপরীত অবস্থায় উত্তীর্ণ হওয়া—হয় আত্মার কোন শুদ্ধ নির্ব্বিশেষ ভূমি বা সত্যের কোন লোক যদি থাকে সেই ভূমিতে বা লোকে, দিব্য আনন্দ কিম্বা দিব্য শক্তি এবং দিব্য সত্তার কোন অন্য জগৎ যদি থাকে তবে সেই জগতে? তাহা

হইলে বুঝিতে হইবে যে মানবজীবনের পূর্ণ সিদ্ধি মানবতার ক্ষেত্রে নাই, অন্য কোথাও আছে। তাহা হইলে পার্থিব পরিণতির চূড়া হইবে এমন সূক্ষ্ম, যেখানে মন লয় পাইবে এবং যেখান হইতে জীবকে এক বিরাট লম্ফ দিয়া, হয় অরূপ সত্তায় অথবা দেহগত মনের নাগালের বাহিরে অবস্থিত কোন জগতে পৌঁছিতে হইবে।

কিন্তু বস্তুতঃ আমরা যাহাকে অদিব্য বলিতেছি তাহাও ত দিব্য তত্ত্ব-চতুষ্টয়ের ক্রিয়ার পরিণাম ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না, রূপের জগৎ গড়িয়া তুলিতে এরূপ ক্রিয়ার প্রয়োজন ছিল। এই রূপরাজি দিব্য সত্তা, চিৎশক্তি এবং আনন্দের মধ্যেই সৃষ্ট হইয়াছে, বাহিরে নয়; দিব্য সম্ভূতবিজ্ঞানের ক্রিয়ার অংশই ইহারা। সুতরাং রূপের জগতে, উচ্চ দিব্য চৈতন্যের খেলা হইতে পারে না, অথবা যে রূপরাজি এবং মনশ্চেতনা প্রাণ ও জড় বস্তুর উপর অব্যবহিত ভাবে নির্ভর করিয়া রূপজগৎ বর্ত্তমান, তাহারা যে উচ্চতর তত্ত্বের প্রতিরূপ তাহাকে তাহারা বিকৃত করিয়াই দেখাইবে, এরূপ মনে করার কোন কারণ নাই। সম্ভবতঃ সত্য এই হইবে যে দিব্য সত্যের মধ্যেই মন-প্রাণ-দেহের শুদ্ধ রূপ দেখা যাইবে, বস্তুতঃ সেই পরাচেতনার গৌণ বৃত্তিরূপে ইহারা বর্ত্তমান আছে, যে পূর্ণ যন্ত্র বা সাধন সাহায্যে এই পরাশক্তি নিত্য ক্রিয়া করে ইহারা তাহার অংশ বা অঙ্গ মাত্র। তাহা হইলে মনপ্রাণদেহেরও দিব্য ভাবে বিভাবিত হইবার সামর্থ্য আছে। জীবদেহে এই ত্রিতত্ত্বের রূপ ও ক্রিয়া সম্বন্ধে বিজ্ঞান আমাদের নিকট যাহা প্রকাশ করিয়াছে এবং যাহা হয়ত পার্থিবপরিণামের একটী মাত্র যুগরূপ অতি অল্পকালের মধ্যে বিজ্ঞান পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছে, তাহাতেই তাহার মধ্যের সকল সম্ভাবনা ফুরাইয়া গিয়াছে ইহা কে বলিল? তাহারা এখন যে ভাবে ক্রিয়া করিতেছে তাহার কারণ যে দিব্যসত্য হইতে তাহাদের উদ্ভব, কোন কারণে তাহারা তাহা হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। মানুষের মধ্যে যে ভগবদ্‌শক্তি আছে তাহার প্রসারে এবং প্রকাশে একবার যদি এই পার্থক্য দূর হয়, তবে ঋতচিতের মধ্যে তাহাদের যে শুদ্ধবৃত্তি ও ক্রিয়া আছে, তাহাতে তাহাদের বর্ত্তমান বৃত্তি ও ক্রিয়া রূপান্তরিত হইতে নিশ্চয়ই পারে, বস্তুতঃ এক চরম পরিণতি ও উর্দ্ধগতির প্রভাবে স্বভাবতঃ তাহাই হইবে।

তাহা হইলে মানুষের দেহ এবং মনে দিব্য চেতনার প্রকাশ ও অবস্থিতি যে সম্ভব কেবলমাত্র তাহা নহে, পরিণামে ভাগবতী চেতনা মানুষের দেহ প্রাণমনকে জয় করিয়া ইহাদিগকে শাশ্বত সত্যের আরও পূর্ণ প্রতিরূপে রূপান্তরিত করিয়া তুলিবে এবং এই পৃথিবীতে—কেবল ভিতরে ও আত্মাতে নয় পরন্তু বাহির ও বস্তুতে—স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবে। এই দিব্য জয়ের প্রথমটী বা অন্তর্জ্জগতেরটী নিশ্চয়ই পৃথিবীর কেহ কেহ অল্পাধিক পরিমাণে লাভ করিয়াছে, হয়ত যাহারা এরূপ করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা কম নয়, কিন্তু অন্যটী বা বর্হির্জ্জগতের জয়টী অতীতে তেমন পরিমাণে লব্ধ হয় নাই, যাহাতে ভবিষ্যৎ যুগচক্রসমূহে তাহা আদর্শ বা প্রথমস্থান অধিকার করিতে বা অবচেতন স্মৃতিরূপে পার্থিব প্রকৃতির মধ্যে থাকিতে পারে; তবু মানব জাতির মধ্যে ভবিষ্যতে জয়শ্রীমণ্ডিত সে দিব্যজীবন প্রতিষ্ঠা করা হয়ত ভগবদভিপ্রেত। এই পার্থিব জীবনে আধা হর্ষ আধা দুঃখ পূর্ণ আয়াসের চক্রাবর্ত্ত যে চলিতে থাকিবেই তাহা হয়ত সত্য নহে; চরমে পরমাসিদ্ধি এবং পৃথিবীর বুকে ভগবানের মহিমা ও আনন্দের অবাধ প্রকাশ হয়ত ইহার স্থিরীকৃত পরিণাম।

যে পরম আদিমূল হইতে মন প্রাণ ও দেহ উদ্ভূত হইয়াছে সেখানে তাহারা কি অর্থাৎ তাহাদের স্বরূপ কি? সুতরাং যখন সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত পূর্ণ ভাগবদ্প্রকাশ হইবে, এখন যে ভাবে আমরা ভেদজ্ঞান ও অবিদ্যাবশে তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছি যখন তাহা দূর হইবে, তখন দেহমনপ্রাণ কি আকার ধারণ করিবে? এই সমস্যার বিচার ও সমাধান করা এখন আমাদের প্রয়োজন। কারণ সেখানে তাহাদের একটা পূর্ণ অবস্থা নিশ্চয়ই আছে, জড়প্রকৃতির অন্ধকারময় জড়চেতনার সৃষ্টি করিবার জন্য আত্মা জড়ের মধ্যে সংবৃত হইয়াছিল, সেই দিব্য জ্যোতি নিজের ছায়ার মধ্যে সুপ্ত হইয়াছিল, আবার সেই জড় হইতে মন অভিব্যক্ত হইতেছে, আমরা এখনও তাহার প্রথম ধাপে আছি, আমাদের গতি এখনও শৃঙ্খলিত, এখনও সেই আত্মসংবৃতি এবং সুপ্তির অবস্থা ও পরিণামের প্রভাব হইতে আমরা মুক্ত হই নাই বা ঘুমের ঘোর কাটে নাই—আমরা পূর্ণত দিকে অগ্রসর হইতেছি মাত্র। পূর্ণতার যে আদর্শ বা আমাদের চরম পরিণতিতে আমরা যাহা হইয়া উঠিব

তাহার পূর্ণরূপটী দিব্য সম্ভূতবিজ্ঞানের মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই সচেতন ভাবে আমাদের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে—যাহাতে আমরা সেই পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইয়া তাহাই হইয়া উঠিতে পারি। সেই দিব্যজ্ঞানে পূর্ব্ব হইতে যাহা বর্ত্তমান আছে, তাহাকে মানুষের মনশ্চেতনা সদা খুঁজিতেছে, যাহার নাম দিয়াছে সে আদর্শ। আদর্শ হইতেছে সেই শাশ্বত সত্য যাহাতে আমাদের সত্তার বর্ত্তমান অবস্থায় আজিও আমরা পৌছিতে পারি নাই; তাহা অসৎবস্তু বা আমাদের মনের বস্তুশূন্য কল্পনামাত্র নহে; এমন কিছু নহে শাশ্বত পুরুষ যাহার ধারণা এখনও করিয়া উঠিতে পারেন নাই কেবল মাত্র অপূর্ণজীব আমরা যাহার আভাস পাইয়াছি এবং রূপ দিবার চেষ্টা করিতেছি।

প্রথমে মানব জীবনের শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং কুণ্ঠাগ্রস্ত রাজা এই মনের কথা আলোচনা করি। মন স্বরূপতঃ একটা চৈতন্য যাহা অবিভাজ্য পূর্ণকে পরিমিত করিয়া দেখে, সীমিত করে, নানারূপে খণ্ডিত করিয়া প্রত্যেক খণ্ডকে একটী পৃথক বস্তুরূপে দেখে, স্পষ্টতঃ যাহা ভগ্নাংশ মাত্র, মনের সাধারণ কার্যক্ষেত্রে তাহাকে পূর্ণের কেবলমাত্র একটা অংশরূপে না দেখিয়া, পূর্ণকে বাদ দিয়া পৃথক ভাবে তাহাকে ব্যবহার করা যায়, এ মিথ্যার সে আশ্রয় নেয়। যখন সে জানে যে ইহা অংশমাত্র তখনও অংশ যেন পূর্ণ এরূপ ভাবে সে চলিতে বাধ্য হয়, নহিলে তাঁহার স্বাভাবিক বিশিষ্ট যে ক্রিয়াশক্তি আছে তাহার মধ্যে সে অংশকে ফেলিতে পারে না। মনের সমস্ত কার্য্যকরী শক্তি, ধারণা, অনুভূতি, ইন্দ্রিয়সংবেদন বা ভাবনার সৃষ্টিলীলা সর্ব্বত্রই তাহার এ বিশিষ্ট ধর্ম্মের অনুশাসন রহিয়াছে। তাহার ভাবনা, অনুভব বা ইন্দ্রিয়বোধের জন্য সে যেন একটা বৃহৎ স্তূপ হইতে তাহার কতকটা অংশ কাটিয়া নেয় এবং সেই কর্ত্তিত অংশকে স্থায়ী এককরূপে তাহার সৃষ্টিকার্য্যে এবং ভোগে লাগায়। সকল কর্ম্মে সকল ভোগে সে যে সমস্ত জিনিষ পূর্ণ বা অখণ্ড রূপে দেখে, তাহা বৃহত্তর কোন পূর্ণবস্তুর অংশ, আবার সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পূর্ণবস্তুগুলিকে নানা অংশে ভাগ করা হয় তখন কোন বিশেষ প্রয়োজন সাধনের জন্য সেই ক্ষুদ্রতর খণ্ডগুলিকে অখণ্ড বলিয়া ব্যবহার করে। মন বিষয়কে লইয়া যোগবিয়োগ গুণভাগ করিতে পারে কিন্তু এই খণ্ড গণিতের সীমার বাহিরে যাওয়া মনের সাধ্য নাই। যদি সে বাহিরে গিয়া প্রকৃত অখণ্ডের ধারণা করিতে চেষ্টা করে, তবে বিদেশে দৃগ্‌ভ্রান্ত পথিকের

ন্যায় বিমূঢ় হইয়া পড়ে। তাহার দৃঢ় ভিত্তি ত্যাগ করিয়া অনন্তের অতলে, যাহাকে ধরা ছোঁয়া যায় না সেই অধরের সমুদ্র মধ্যে পড়িলে কি দেখিবে, কি ভাবিবে, কি ধরিবে, তাহার সৃষ্টি এবং ভোগের জন্য কি বিষয় অবলম্বন করিবে তাহা সে খুঁজিয়া পায় না। কখনো যে বোধহয় মন অনন্তের ভাবনা করিতেছে তাহাকে অনুভব করিতেছে, তাহাকে বোধ বা ভোগ করিতেছে, তাহা বহির্দ্দৃশ্যে মাত্র, বস্তুতঃ তখন সে অনন্তের ছায়া লইয়াই রহিয়াছে। তখন যাহা তাহার প্রত্যয়ে ভাসিয়া উঠে তাহা দেশের অতীত অনন্ত নহে, বৃহতের একটা রূপহীন অস্পষ্ট আভাস মাত্র। যে মুহূর্ত্তে সে অনন্তকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে, তাহার বোধ বা ভোগের মধ্যে নামাইয়া আনিতে চায় তখনই মনের সীমিত করিবার অনিবার্য্য প্রবৃত্তি আসিয়া পড়ে, তখন মনের পক্ষে পুনরায় মূর্ত্তি, রূপ, শব্দ বা বাক্য লইয়া খেলা আরম্ভ হইয়া যায়। মন অনন্তকে ধারণা বা ভোগ করিতে পারে না, সে শুধু অনন্তের দ্বারা ভুক্ত বা আবিষ্ট হইতে পারে। তাহার পক্ষে যাহা অগম সেই ভূমি হইতে যখন সত্যের জ্যোতির ছায়া আসিয়া তাহার উপর পড়ে, তখন সেই আনন্দে অবশ হইয়া সে শুধু আত্মহারা হইতে পারে। অতিমানস ভূমিতে না উঠিলে অনন্তকে পাওয়া যায় না, ঋতচিন্ময় সত্যের অবতরণের সময় তাহার নিকট নিষ্ক্রিয় ভাবে আত্মসমর্পণ না করিলে, তাহার জ্ঞানলাভও মনের পক্ষে সম্ভব নয়।

ইহাই মনের মূলবৃত্তি, স্বাভাবিক সীমা; ইহা দ্বারাই তাহার খাঁটি প্রকৃতি এবং ক্রিয়া পরিচালিত হয়, ইহাই তাহার স্বভাব, স্বধর্ম্ম। পরামায়ার পূর্ণলীলায় যে কার্য্যে তাহাকে দিব্য ব্যবস্থানুসারে নিয়োজিত করা হইয়াছে, তাহার চিহ্ন এখানে দেখিতে পাই; স্বয়ম্ভু যিনি তাহার শাশ্বত আত্মভাবনার মধ্যে মন যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তখন হইতে এই পদ বা বৃত্তি তাহাকে দেওয়া হইয়াছে। এ পদের বিশিষ্ট কর্ত্তব্য হইতেছে সর্ব্বদা অনন্তকে সান্তের ভাষায় অনুবাদ করা, পরিমিত করা, সীমিত করা, খণ্ড করা। বস্তুতঃ অনন্তের সমস্ত সত্যবোধকে বিলুপ্ত করিয়া মন আমাদের চৈতন্যে এই কাজ-ই করিতেছে। এই জন্য মন মহা অবিদ্যার প্রথম জটিল গ্রন্থি, কেননা মূল বিভাগ ও বিক্ষেপ ইহা হইতেই জাত হয়। ইহাকে জগতের কারণ এবং ইহাই দৈবী মায়ার সমগ্রতা, ভুল করিয়া অনেক সময় একথা বলা হইয়াছে। কিন্তু দৈবী মায়ার মধ্যে বিদ্যা

এবং অবিদ্যা, জ্ঞান এবং অজ্ঞান এ দুইই আছে। সান্ত অনন্তেরই প্রতিভাস, তাহার ক্রিয়ার ফল, তাহারই চৈতন্যের খেলা; অনন্তের মধ্যে অনন্তের পট-ভূমিকায় অনন্তের উপাদান বা অনন্তের শক্তির ক্রিয়ারূপে ভিন্ন সান্তের কোন অস্তিত্বই যখন সম্ভব হইতে পারে না, তখন ইহা স্পষ্ট যে এমন এক মূল চৈতন্য নিশ্চয়ই আছে যাহা সান্ত ও অনন্ত এ উভয়কে এক সঙ্গে ধারণ করিয়া বর্ত্তমান আছে এবং ইহাদের পরস্পরের সম্বন্ধের সকল তত্ত্বই আছে যাহার পরমজ্ঞানে। সে চৈতন্যে অবিদ্যা নাই, কেন না তাহাতে অনন্তের সকল জ্ঞান আছে, এবং সান্তও সেখানে স্বতন্ত্র সত্তারূপে অনন্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই। কিন্তু তাহাতে এমন একটা গৌণ ক্রিয়া আছে যাহা সীমা বা সঙ্কোচ আনে, নতুবা জগতের অস্তিত্ব সম্ভব হইত না। এই ক্রিয়ার ফলে যাহা কেবল ভাঙ্গে বা জোড়ে এমন এক মনশ্চেতনা, যাহা সর্ব্বদা ছড়াইয়া পড়ে আবার গুটাইয়া আসে এমন এক প্রাণের লীলা, যাহা সর্ব্বদা বহু বিভক্ত হইয়া আবার একত্বে সমাহৃত হয় এমন এক জড় সত্তা, প্রতিভাসের ক্ষেত্রে প্রকাশ পাইয়াছে—এ সমস্তের মূলে আছে ঐ এক তত্ত্ব, এক ক্রিয়া। যিনি পরম মনীষী এবং কবি বা শাশ্বত দ্রষ্টা তাহার এই গৌণ ক্রিয়াকে দিব্যমানস বলা যাইতে পারে, ইহা জ্যোতির্ম্ময়, নিজেকে এবং সকলকে জানে, নিজে কি করিতেছে তাহা পূর্ণরূপে অবগত আছে। অনন্তের মধ্যেই-সে যে সান্তকে সৃষ্টি করিতেছে এ জ্ঞান কখনও সেখানে বিলুপ্ত হয় না। ইহা স্পষ্ট যে এই দিব্যমানস অতিমানসের বা সদ্ভুতবিজ্ঞানের ক্রিয়া হইতে পৃথক কিছু নয় পরন্তু তাহারই ক্রিয়ার একটা গৌণ ধারা। আমরা যাহাকে ঋত-চিতের প্রজ্ঞানবিভাগ বলিয়াছি তাহা হইতে ইহার ক্রিয়ার প্রবর্ত্তনা।

আমরা দেখিয়াছি যে সক্রিয় এবং সৃষ্টিশীল যে তত্ত্ব অবিভাজ্য সর্ব্বরূপে বর্ত্তমান আছে, তাহাই নিজের প্রজ্ঞানচৈতন্যের সাহায্যে সেই সর্ব্বচৈতন্যের বিষয়রূপে নিজেকেই স্থাপিত করিয়া বা নিজেই যেন নিজ হইতে জাত হইয়া, নিজেই নিজের ক্রিয়ার দ্রষ্টা বা অধিকারী হয়। কবি যেমন তাহার আত্মচেতনার মধ্যস্থিত নিজ সৃষ্টি নিজের সম্মুখে স্থাপিত করে, যেন সে সৃষ্টি তাহার স্রষ্টা কবি ও তাহার সৃজনশক্তি হইতে পৃথক কিছু, অথচ তাহা যেমন কবির আত্মসত্তার মধ্যে একটা রূপায়ণের খেলা মাত্র, যে খেলা তাহার স্রষ্টা কবি হইতে কখনও বিভক্ত বা বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না, প্রজ্ঞানের ক্রিয়া কতকটা তদ্রূপ। প্রজ্ঞান পুরুষের মধ্যে

এই যে একটা ভেদ ভাব যেন আনয়ন করা হয়, যাহার ফলে সচেতন দ্রষ্টা এবং জ্ঞাতা নিজের দৃষ্টিশক্তির দ্বারা প্রকৃতি বা শক্তিরূপী আত্মা বা স্বভাবরূপ আত্মাকে, নিজের জ্ঞানের এবং দৃষ্টির বিষয়রূপে স্থাপিত করে, যাহা তাহার সৃষ্টি এবং তাহার সর্ব্ববিধায়িকা শক্তিরূপে দেখা দেয়, ইহাই ভেদের মূল জন্মস্থান যাহা হইতে ভেদাত্মক বিশ্বসৃষ্টি সম্ভব হয়। এই যে পুরুষপ্রকৃতিবিবেক ইহা ভেদ বলিয়া আমাদের মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে ভেদ নহে, ইহারা উভয়ে একই সত্তা, জ্ঞাতারূপী তাহার নিজের সম্মুখে জ্ঞানরূপে অথবা স্রষ্টারূপে তাহার নিজের সম্মুখে শক্তিরূপে এই যে বহুরূপ দেখা দিয়াছে বা সৃষ্ট হইয়াছে, এ সমস্ত তাহার আত্ম-সত্তারই নিজকৃত বহুরূপ। প্রজ্ঞানচৈতন্যের শেষ ক্রিয়া তখনই দেখা দেয়, যখন পুরুষ তাহার সচেতন আত্মবিস্তারের সর্ব্বত্র অনুস্যূত থাকে, নিজের প্রতি বিন্দুতে এবং সমগ্রতায় বর্ত্তমান থাকে, অথচ রূপের মধ্যে বাস করিয়া প্রত্যেক রূপের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্য দিয়া সমগ্র হইতে যেন পৃথক রহিয়াছে মনে করে; যেন সে আত্মার প্রতিরূপে নিহিত তাহারই বিশিষ্ট ইচ্ছা ও দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া আত্মার অন্য সকলরূপকে দেখে এবং তাহাদের সহিত সম্বন্ধ নিরূপিত করে।

এইভাবে বিভাগ বা খণ্ড ভাবের মূল তত্ত্ব আসিয়া পড়িল। প্রথমতঃ অন্তহীন সেই এক, দেশ ও কালরূপে নিজেকে আত্মপ্রসারিত করিল, দ্বিতীয়তঃ আত্ম-সচেতন সেই প্রসারতার মধ্যে বর্ত্তমান একের সর্ব্বব্যাপিত্ব বহু সচেতন আত্মারূপে আত্মপ্রকাশ করিল, ইহা হইতে সাংখ্য দর্শনের বহুপুরুষবাদ আসিয়াছে। তৃতীয়তঃ একের সেই আত্ম প্রসারণে বহু পুরুষের প্রত্যেকে নিজের জন্য পৃথক নিবাসস্থান বা রূপ সৃষ্টি করিল। বহু পুরুষের প্রত্যেকে, যখন নিজের পৃথক জগতে বাস করে না, তাহাদের প্রত্যেকের পৃথক প্রকৃতি নাই এবং প্রত্যেকের জন্য পৃথক বিশ্ব সৃষ্টি হয় নাই; সকল পুরুষ বহুত্বের অধিষ্ঠাতা একই পরমপুরুষের নিজ শক্তি হইতে সৃষ্ট আত্মরূপ বলিয়া, একই প্রকৃতির ভোক্তা সকলকে যখন হইতেই হইবে, অথচ সেই একই প্রকৃতিসৃষ্টজগতে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে, তখন এইভাবে বিভক্ত রূপ সৃষ্টি অপরিহার্য্য। প্রতিরূপে স্থিত পুরুষ সেই রূপের সঙ্গে নিজেকে এক বলিয়া দেখে; সে নিজেকে সেই রূপের মধ্যে সীমিত করিয়া তাহারই অন্য আত্মা যে সমস্ত রূপে রহিয়াছে, সেই সমস্ত রূপ হইতে নিজরূপকে যেন পৃথক মনে করে; এই সমস্ত পুরুষ সত্তায় পরস্পরের

সহিত এক হইলেও একই উপাদান, শক্তি, চৈতন্য এবং আনন্দের মধ্যে যে সম্বন্ধ, যে অধিকার, যে গতি, যে দৃষ্টিভঙ্গী তাহারা কোন বিশিষ্ট কালে বিশিষ্ট ক্ষেত্রে গ্রহণ বা প্রকাশ করে, তাহাতে পরস্পরের মধ্যে বিভিন্নতা দেখা দেয়। কিন্তু আমরা যেমন দেহাত্মবোধের দাস হইয়া পড়িয়াছি, আমাদের সচেতন অহং এর সীমার গণ্ডি আমরা যেমন কাটিয়া উঠিতে পারি না, কালের মধ্যে আমাদের চেতনার যে বিশেষ প্রবাহ চলে, যাহা দ্বারা দেশের মধ্যে আমাদের ক্ষেত্র স্থিরীকৃত হয়, তাহা হইতে যেমন আমরা পলাইতে পারি না, এই দিব্যস্থিতিতে পুরুষের অবস্থা সেরূপ নহে। এখানে আত্মজ্ঞান পূর্ণরূপে জাগ্রত আছে, সত্যিকার কোন সীমার বন্ধন এখানে থাকিতে পারে না, সুতরাং সীমাগ্রহণে বন্ধনের কারণ বা দেহাত্মবোধের অধীন হইয়া পড়া হয় না। প্রতিমুহূর্তে এখানে পুরুষ নিজের রূপের সঙ্গে নিজেকে এক করিয়া দেখে কিন্তু স্বাধীনভাবে, আমরা যেমন কালের পারম্পর্য্যের মধ্যে দুর্ভেদ্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া পড়ি, দিব্যাত্মার অবিচ্ছেদ্য আত্মজ্ঞান আছে বলিয়া তাহার পক্ষে সেরূপ বাঁধা পড়ার কোন ভয় নাই।

এইভাবে এখানে ভেদের সূচনা দেখা দিয়াছে, রূপের সঙ্গে রূপের সম্বন্ধ এমন ভাবে হইতেছে যেন তাহারা বিভিন্ন সত্তা, সত্তার সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্কল্প এমনভাবে যুক্ত হইতেছে যেন তাহারা বিভিন্ন শক্তি, সত্তার জ্ঞানের নিকট জ্ঞান এমনভাবে উপস্থিত হইতেছে যেন তাহারা বিভিন্ন চেতনা। তবু এখনও তাহারা 'যেন' পৃথক মাত্র, কারণ দিব্য আত্মাতে ভ্রান্তি নাই, তাহার সত্তা পরম সতের সত্যে এখনও বিধৃত আছে, তাই সমস্তই সেই সত্তার প্রতিভাস বা প্রকাশ বলিয়া তাহার জ্ঞান আছে, একত্বজ্ঞানকে এখনও হারাইয়া ফেলে নাই; ইহা মনকে অনন্ত জ্ঞানের গৌণ ক্রিয়াশক্তিরূপে ব্যবহার করে; মূল সমগ্রতার জ্ঞানের পটভূমিকায় এবং তাহারই অনুগতভাবে ইহা সমস্ত সীমার নির্দ্দেশ করে; প্রাকৃত মন যেরূপ খণ্ড সকলের যোগফলে বা সমাহারে বহুত্বযুক্ত এক সমগ্রতা গড়িয়া তুলিয়াছে বলিয়া মনে করে, যেখানে সমগ্রতার মধ্যেও খণ্ড বা ভেদজ্ঞান বর্ত্তমান. দিব্য আত্মার অনুভূত সমগ্রতা সেরূপ নহে। সুতরাং দিব্য আত্মার কাছে সীমার খাঁটি বন্ধন নাই, তাহার মধ্যে বিশেষিত করিবার যে সামর্থ্য আছে তাহা দ্বারা খেলার জন্য সুবিবিক্ত রূপ এবং শক্তি সে প্রকাশ করে কিন্তু নিজে সে শক্তির অধীন হয় না।

অতএব যে মন স্বাধীন ভাবে নিজেতে নিজের সীমা আরোপ করে, যে মন গুণের অধীশ্বর, নিজের স্বরূপ দৃষ্টিতে যাহা নিজের সীমা বা খেলা দেখে এবং পরিচালিত করে অর্থাৎ যে মন দিব্য, তাহা হইতে যে মন অসহায়ভাবে সীমার বন্ধনের অধীন, যে মন নিজের খেলার জালে নিজেই আবদ্ধ এবং তাহা দ্বারা প্রতারিত, সেই প্রাকৃত মন সৃষ্টি করিতে গেলে একটা নূতন উপাদান, সচেতন শক্তির একটা নূতন ক্রিয়া চাই। এই যে নূতন উপাদানটী যাহা অতিমানসের ক্রিয়া হইতে মনের ক্রিয়াকে পৃথক করে তাহা হইল অবিদ্যা, যাহা নিজেকে নিজে ভুলিয়া যাওয়া বা রহিত করিবার একটা বৃত্তি, যদিও অতিমানস হইতেই অবিদ্যার অধীন এ মন জাত হইয়াছে এবং এখনও অন্তরালে থাকিয়া অতিমানসই এ মনকে পরিচালিত করিতেছে। তাই অতিমানস হইতে পৃথক হইয়া এ মন শুধু বিশেষকে দেখে সামান্য বা সার্ব্বভৌমকে নয়, অথবা বড় জোর সামান্যের একটা অস্ফুট প্রতীতির মধ্যে বিশেষকে দেখিতে পারে, সামান্য এবং বিশেষ এ উভয়ই যে অনন্তের প্রকাশের দুইটী দিক এ ধারণা এ মনের হয় না। এইভাবে যে সীমিত মন আমরা পাইয়াছি, তাহা প্রতিভাস বা ঘটনাকে একটা স্বরূপ তত্ত্ব বোধ করে, তাহাকে দেখে একটা সমষ্টির একটা বিবিক্ত অংশরূপে যে সমষ্টি আবার পৃথকভাবে একটা বৃহত্তর সমষ্টির অংশ, এবং এইভাবে তাহার ক্রিয়া চলিতে থাকে এবং ক্রমশঃ সমষ্টির পরিধি সে বাড়াইতে থাকে বটে কিন্তু যথার্থ অনন্তের বোধে সে কখনও পৌছাইতে পারে না।

মন অতিমানসের ক্রিয়া হইতে জাত বলিয়া যেমন সে খণ্ড খণ্ড করে, তেমনি সে খণ্ড সকলকে জোড়া দিয়া সমষ্টি গড়িতে চায়—অন্তহীন ভাবে। সত্তাকে সে বহুসমষ্টিতে খণ্ডিত করে আবার তাহাদিগকে ভাঙ্গিয়া ক্ষুদ্রতর সমষ্টিতে পরিণত করে। এই ভাবে ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে সে পরমাণুতে পৌছে, আবার পরমাণুকে ভাঙ্গিয়া করে অতিপরমাণু এবং যদি সে পারিত তবে অতিপরমাণুকে ভাঙ্গিয়া শূন্যে মিলাইয়া দিত। কিন্তু সে তাহা পারেনা, কারণ তাহার ভাঙ্গনক্রিয়ার পশ্চাতে অতিমানসের যে জ্ঞান আছে, তাহা জানে যে প্রত্যেক সমষ্টি, প্রতি অণু পরমাণু, যিনি সর্ব্বশক্তি সর্ব্বচৈতন্য সর্ব্বসত্তা তাহার একটী ঘনীভূতবিগ্রহ, প্রতিভাসের মধ্যে তাহার একটা রূপ—এই জ্ঞান কোন কিছুকে কেবলমাত্র শূন্যে পৌছিতে দেয় না। সমষ্টিকে ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে মনের বোধহয় যেন

এক অনন্ত শূন্যে পৌঁছিয়াছে, কিন্তু অতিমানসের দৃষ্টিতে তাহা বিন্দুরূপে ঘনীভূত সচেতন সত্তার প্রতিভাস হইতে নিজেরই শাশ্বত অনন্ত সত্তায় প্রত্যাবর্ত্তন। 'অণোরণীয়ান' অণু হইতে অণু বা 'মহতো মহীয়ান' মহৎ বা বৃহৎ হইতেও বৃহৎ যে দিকেই মন চলুক না কেন, অবশেষে তাহার নিজ স্বরূপে, নিজের অনন্ত একত্বে, নিজের শাশ্বত সত্তায়, তাহাকে পৌঁছিতে হইবে; মনের ক্রিয়া যখন সচেতন ভাবে এই জ্ঞানের অনুগত হয়, তখন ক্রিয়ার ধারা কি ভাবে চলিতেছে সে জ্ঞানও মন লাভ করে। তখন সে জানে অখণ্ডের মধ্যে সত্যিকার খণ্ডতা কোথাও নাই, কেবল আছে সত্তার বহুরূপের মধ্যে নিজেকে অনন্ত ভাবে কেন্দ্রীকরণ, আত্মরূপের এই বহু বিস্তারের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য এক ভাবের বিন্যাস, যেখানে সমস্ত ক্রিয়ার মধ্যে বিভাগ বা খণ্ডীকরণ দেশ ও কালের মধ্যে লীলার জন্য যাহা অপরিহার্য্য, তেমন একটা গৌণক্রিয়া মাত্র। কারণ ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া অতি সূক্ষ্ম পরমাণুতে অথবা জুড়িয়া জুড়িয়া বিশ্ব জগতের অতি বিপুল সমাহারে পৌঁছিলেও, এ উভয়ের কোন ক্রিয়া দ্বারা বস্তুর স্বরূপে পৌঁছান যায় না। সমস্তই যাহার রূপ তেমন এক মহাশক্তি কেবল স্বরূপতঃ সত্য, অন্য সমস্ত সেই শাশ্বত চিৎশক্তির প্রতিরূপ হিসাবে প্রকাশে তাহার আত্মরূপায়ণ বলিয়া শুধু সত্য।

প্রশ্ন উঠে যাহার ফলে সীমা ও সঙ্কোচ আসিয়া পড়ে, সেই অবিদ্যা অথবা অতিমানস হইতে মনের এই পতন, যাহা হইতে বাস্তব ভেদলীলা দেখা দিয়াছে, মূলতঃ তাহা কোথা হইতে, অতিমানসের কোন বিকৃতি হইতে আসিয়াছে? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে ব্যষ্টিচেতনা যখন অন্য সকলকে বাদ দিয়া শুধু নিজের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখে অর্থাৎ সেই চৈতন্য, যখন যাহা সত্তার খেলার এক অংশ মাত্র, বিশিষ্ট দেশ ও কালের দ্বারা সীমিত তেমন এক বিভাবে নিজেকে পূর্ণরূপে কেন্দ্রীভূত করিয়া অন্য সকল বাদ দিয়া বসে এবং এই বিভাবকেই তাহার পূর্ণ আত্মভাব মনে করে, তখন এই অবিদ্যার খেলা দেখা দেয়। কালের এক বিশেষ মুহূর্ত্তে, দেশের একটী ভূমিকায় যে বিশেষ রূপের মধ্যে সে বর্ত্তমানে অবস্থিত, তাহাকে সে নিজ আত্মা ভাবে, তেমনি অন্য সকল আত্মাও যে তাহারই আত্মা, অন্য সকল ক্রিয়া যে তাহারই ক্রিয়া, সত্তা এবং চৈতন্যের অন্য সকল বিভাব যে তাহারই নিজের বিভাব, একথা

যখন সে ভুলিয়া যায় তখনই অবিদ্যার খেলা আরম্ভ হয়। একটী বিশেষ ক্ষণ, একটী ক্ষেত্র, একটী রূপ, একটী ক্রিয়া বা গতিতে নিজেকে কেন্দ্রীভূত করিয়া সে অপর সকলকে হারাইয়া ফেলে। তার পর ক্ষণের পারম্পর্য্য, দেশ বিন্দুর পারম্পর্য্য, দেশ ও কালের মধ্যে রূপ ও গতির পারম্পর্য্য জুড়িয়া জুড়িয়া তাহার হারানো সমগ্রতাকে ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করিতে বাধ্য হয়। কাল, শক্তি এবং মূলবস্তু যে অবিভাজ্য এ জ্ঞান সে এইভাবে হারাইয়া বসিয়াছে। এমন কি সকল মনই যে এক পরমমনের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী মাত্র, সকল জীবনই যে এক বিশ্বপ্রাণের ক্রিয়ার নানা ধারা, সকল দেহ এবং রূপ যে শক্তি এবং চৈতন্যের একই উপাদানে গড়া বহু কেন্দ্রীভূত আপাতপ্রতীয়মান স্থাণুত্ব (stability), এ সহজ সত্যও সে ভুলিয়া যায়। বস্তুতঃ সকল স্থাণুত্বের মধ্যেই গতি ও স্পন্দনের একটা ঘূর্ণাবর্ত্ত অবিরত চলিতেছে, যাহা হইতে একটা রূপের পুনরাবৃত্তি হইতেছে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে রূপও পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে, ইহা ছাড়া তাহারা আর কিছু নয়। কারণ মন সব জিনিস একটা বিশিষ্ট দৃঢ় আকারে, সমস্ত বহিরঙ্গ উপাদান এক অচল অপরিবর্ত্তনীয় বিধানে বন্দী করিয়া রাখিতে চায়, নতুবা তাহার কাজ চলে না। তার পর সে ভাবে যে সে যাহা চায় তাহা বুঝি পাইয়াছে, কিন্তু বস্তুতঃ পরিবর্ত্তন ও নবায়নের একটা অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ চলিতেছে, কোন স্থির আকার নাই, বাহিরের কোন কিছু অপরিবর্ত্তনীয় নয়। কেবল শাশ্বত সদ্ভূতবিজ্ঞানই আছে অচল প্রতিষ্ঠ হইয়া এবং তাহাই প্রবাহের মধ্যে রূপ এবং সম্বন্ধ সকলকে ঋতের বিধানে অবিচল ভাবে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। এই অবিচলতার ব্যর্থ অনুকরণ করে মন, যাহা নিত্য চঞ্চল তাহাকে অচঞ্চল ভাবিয়া। মনকে এই সমস্ত সত্য পুনরাবিষ্কার করিতে হইবে। এ জ্ঞান তাহার সর্ব্বদা আছে কিন্তু তাহার চৈতন্যের পশ্চাতে, তাহার আত্মসত্তার গোপন জ্ঞানভাণ্ডারে লুক্কায়িত রহিয়াছে। সে আলোক আজ তাহার কাছে অন্ধকারে ঢাকা, কেননা আজ সে রহিয়াছে, নিজের সৃষ্ট অবিদ্যার মধ্যে, কেননা অখণ্ডতার জ্ঞান রক্ষা করিয়া বিভজনের যে মনন শক্তি তাহার ছিল, তাহা আজ এমন মননে পরিণত হইয়াছে যাহা শুধু খণ্ডকেই চিনে, কেননা সে নিজের সৃষ্টির জালে আজ নিজেই বন্দী।

মানুষের দেহাত্মবোধের জন্য এই অবিদ্যা গভীরতর হইয়া উঠে। আমরা

বোধকরি যে দেহই মনকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, কেননা দেহেই মন অভিনিবিষ্ট সুতরাং তাহার দ্বারা যেন অধিকৃত রহিয়াছে। এই স্থূল জগতে দৈহিক ক্রিয়াকে অবলম্বন করিয়া মন বাহ্য বা বহিশ্চর চেতনার খেলা চালায় বলিয়া, সে দেহের উপর এত অনুরক্ত। দেহের মধ্যে নিজেকে বিকাশ করিয়া তুলিতে গিয়া, সে নিজে মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুমণ্ডল গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহা সর্ব্বদা ব্যবহার করিতে গিয়া তথা হইতে সে যাহা পাইতেছে, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে সে এমন ডুবিয়া আছে যে, ইহা হইতে তাহার নিজের শুদ্ধ বৃত্তির খেলায় ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা বা অবসর তাহার নাই, তাই শুদ্ধ মনের খেলার অধিকাংশ এখন অবচেতন ভাবে চলিতেছে। তথাপি আমরা এক প্রাণময় মন বা এক প্রাণময় সত্তার ধারণা করিতে পারি, যাহাকে পরিণতির প্রয়োজনে এরূপ ভাবে ডুবিয়া যাইতে হয় না এবং যাহাকে প্রতি দেহের জন্মের সঙ্গে জন্মিতে বা দেহ নাশের সঙ্গে বিলয় প্রাপ্ত হইতে হয় না, বরং সে বিদেহ সত্তা দেহের পর দেহ ধারণ করিয়া দেখিতে, এমন কি আত্মানুভব করিতে সমর্থ। কারণ বস্তুতঃ সমগ্র মনোময় সত্তার জন্ম হয় না; জড়ের উপর মনের যে স্থূল ছাপ পড়ে যাহাকে দৈহ্যমানস বা দেহগতমন বলিতে পারি, কেবল তাহাই মানুষের জন্মের সঙ্গে জন্মে। এই দৈহ্যমানস আমাদের মনের বহির্ভাগ মাত্র, জড়ের অভিজ্ঞতা লাভের জন্য মন যে অংশকে বাহিরে প্রেরণ করে, ইহা শুধু তাহাই। আমাদের এই মর্ত্ত্যসত্তার মধ্যেও আর একটী মন আছে, যাহা এখন আমাদের বহিঃপ্রকাশিত মনের পশ্চাতে অবচেতন বা অধিচেতন রূপে অবস্থিত রহিয়াছে, যে মন নিজেকে দেহ হইতে অধিক কিছু বলিয়া জানে এবং তাহাকে এমন স্থূল জড়ভাবে ক্রিয়া করিতে হয় না। আমাদের বহিশ্চর মন বৃহত্তর গভীরতর অধিকতর শক্তিশালী ক্রিয়ার সামর্থ্য প্রত্যক্ষভাবে এই মন হইতেই লাভ করে। আমাদের উপর এই গোপন মনের প্রভাব সম্বন্ধে আমরা যখন সচেতন হই, তখন আমরা আমাদের অন্তর পুরুষের প্রথম অনুভব বা প্রথম ধারণা লাভ করি। এই পুরুষের নাম প্রাণময় পুরুষ।

কিন্তু এই প্রাণময় মানস আমাদিগকে দেহের ভ্রান্তি হইতে মুক্তি দিলেও মনের সকল ভ্রান্তি হইতে মুক্তি দেয় না; যাহার জন্য ব্যষ্টি জীব নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া সব কিছু দেখে সেই মৌলিক অবিদ্যার অধীনতা ইহার এখনও আছে;

বাহির হইতে যাহা ইহার নিকট উপস্থিত হয় অথবা দেশ ও কালে অবস্থিত জীবের বিবিক্ত চেতনায় অতীত ও বর্ত্তমান অনুভবের আকার বা সংস্কাররূপে যাহা ফুটিয়া উঠে, কেবল তাহাই সে দেখিতে পায় ও সত্য বলিয়া মনে করে। অন্য আত্মা সকলের ব্যক্ত চিন্তা, বাক্য, ক্রিয়া বা কর্ম্মফলে যাহা ফুটিয়া উঠে অথবা দৈহিক সত্তা যাহা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিতে পারে না, প্রাণের সেই সূক্ষ্ম সংস্পর্শ বা সম্বন্ধের মধ্য দিয়া তাহাদিগের অস্তিত্বের যে সমস্ত লক্ষণ বা চিহ্ন বাহিরে প্রকাশ হয়, প্রাণময়মানস সচেতনভাবে সে সমস্ত গ্রহণ করে, তাহাদের সম্বন্ধে তদতিরিক্ত কিছু অনুভব করিতে পারে না। তেমনি সে নিজেকেও চিনে না; কারণ কালের ক্ষেত্রে নানা জন্মের মধ্য দিয়া বিচিত্রভাবে প্রকাশিত নানা শক্তির ক্রিয়া ও গতির ভিতর যাহা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাকেই সে নিজ আত্মা বলিয়া জানে; করণরূপী আমাদের দৈহমানস (instrumental physical mind) যেমন দেহবুদ্ধিতে বিভ্রান্ত অবচেতনে ক্রিয়াশীল এই মন তেমনি প্রাণ বুদ্ধিতে বিভ্রান্ত। প্রাণের মধ্যে সে আবিষ্ট, কেন্দ্রীভূত, সীমাবদ্ধ, তাহার সহিত তাহার নিজের সত্তা একীভূত; এখানে আসিলেও যেখানে মন এবং অতিমানসের মিলনক্ষেত্র এবং যেখান হইতে তাহারা প্রথম পৃথক হইয়া গিয়াছে সে স্থানে আমরা পৌঁছি না।

ক্রিয়াশীল এই প্রাণময় মানসের পশ্চাতে আরও স্বচ্ছতর এক ভাবময় মানস আছে যাহা প্রাণের অভিনিবেশ হইতে মুক্ত হইতে সক্ষম; সে মন জানে যে তাহার নিজের মধ্যে ভাবনা এবং সঙ্কল্পের যে অনুভূতি জাগে, তাহা সক্রিয়ভাবে নানা সম্বন্ধের মধ্যে মূর্ত্ত করিয়া তুলিবার জন্য, সে প্রাণ এবং দেহকে গ্রহণ করিয়াছে। এই মনই আমাদের মধ্যে যে বিশুদ্ধ মনীষী (pure thinker) আছে তাহার উৎপত্তি স্থান। মননতা স্বরূপতঃ কি তাহা সে জানে, সে দেহ ও মনের ভাষায় জগৎ দেখে না, মনের ভাষায় দেখে। ইহাই মনোময় পুরুষ। যেমন আমরা প্রাণময় পুরুষকে কখন কখন জীবাত্মা বা অন্তরাত্মা বলিয়া ভুল করি তেমনি যখন আমরা এই মনোময় পুরুষকে অনুভব করি তখন তাহাকে শুদ্ধ আত্মা বলিয়া অনেক সময় ভুল করিয়া বসি। এই উচ্চতর মন অন্য জীবকে আপনার শুদ্ধ সত্তার অনুরূপ বলিয়া ধারণা এবং তদনুরূপ ভাবে ব্যবহার করিতে পারে। শুধু মনের সংস্পর্শেই তাহাদের সঙ্গে যোগস্থাপন এবং ভাবের আদান

প্রদান চলিতে পারে, তজ্জন্য প্রাণ বা স্নায়ুমণ্ডলের সংঘাত বা দেহের বাহ্য চিহ্নের উপর নির্ভর করিতে হয় না। একত্বের একটা মনোময় ধারণাও ইহার আছে। তাহার কর্ম্ম ও সঙ্কল্পে প্রত্যক্ষভাবে যেমন নিজের তেমনি অপরের প্রাণে ও মনে কিছু সৃষ্টি করিবার বা কোন ভাবের আবেগ আনিবার সামর্থ্যও ইহার আছে,—প্রাকৃত স্থূল জীবনে যাহার গৌণ এবং কুণ্ঠাগ্রস্ত পরিচয় মাত্র পাওয়া যায়। তথাপি এই শুদ্ধ মনও মনের মূলভ্রান্তি হইতে মুক্ত নয়। তখনও তাহার বিবিক্ত মানসিক সত্তা নিজেকে বিশ্বের বিচারক, সাক্ষী ও কেন্দ্র মনে করে এবং কেবল তাহার মধ্য দিয়াই সে তাহার উচ্চতর সত্তা ও সত্যে পৌঁছিতে চেষ্টা করে। অন্য সকল জীব তাহার চারি পাশে আসিয়া জড় হইলে অন্যই থাকিয়া যায়। সুতরাং যখন সে মুক্ত হইতে চায় তখন তাহাকে প্রকৃত অখণ্ড সত্যে মিলিয়া ও মিশিয়া যাইবার জন্য মন প্রাণ হইতে নিজেকে গুটাইয়া লয়। কারণ এখনও মানস ও অতিমানস ক্রিয়ার মধ্যে অবিদ্যার আবরণ রহিয়াছে, তাই তাহার কাছে যাহা পৌঁছে তাহা সত্যের প্রতিরূপ, স্বরূপ সত্য নয়।

যখন এই আবরণ বিদীর্ণ হয় এবং অতিমানস শক্তি ও ক্রিয়ার কাছে মন নিজেকে সমর্পণ করিয়া নিঃশব্দ, নিষ্ক্রিয় এবং তদনুগত (তদ্‌ভাবী) হইয়া যায় তখনই তাহার সত্যদর্শন হয়। তখন আমরা এক জ্যোতির্ম্ময় মনীষী মনের সন্ধান পাই, যাহা দিব্য সম্ভূতবিজ্ঞানের অনুগত বাহন ও সাধন বা যন্ত্র। তখন আমরা অনুভব করিতে পারি এই জগৎ স্বরূপতঃ কি, তখন আমরা জানি যে অপর সকলের মাঝে অপর সকলরূপে আমরাই আছি এবং তদ্রূপ অপর সকল আছে আমাদেরই রূপে আমাদের মধ্যে, এবং সবাইকে জানি বিশ্বরূপ এক পরমএকের বহুধা আত্মরূপায়ণ রূপে। সমস্ত সীমা এবং ভ্রান্তির মূলস্বরূপ আমাদের ব্যষ্টি-চেতনার ভেদদর্শী এবং ভেদকারক দৃঢ় দৃষ্টিভঙ্গী তখন দূর হইয়া যায়; অথচ তখন আমরা ইহাও বুঝি যে অবিদ্যার মধ্যে থাকিয়া মন যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিল তাহাও প্রকৃত প্রস্তাবে সত্য কিন্তু তাহা বিকৃত, ভুল ধারণা বিজড়িত, এককে অন্য বলিয়া বিবেচিত সত্য। তখনও বিভাগ, ব্যষ্টিভাবনা বা আণবিক সৃষ্টি আছে দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু তাহারা এবং আমরা স্বরূপতঃ কি এবং কি জন্য আছি তাহাও জানা থাকে। তখন ইহাও বুঝি যে মন ঋতচিতের একটা গৌণবৃত্তি তাহার কার্য্য সাধনের একটা যন্ত্র। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐশ চৈতন্যের

পরিবেষ্টনকারী পরিবেশ হইতে পৃথক হইয়া নিজের স্বতন্ত্র গৃহস্থাপনের চেষ্টা না করে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত অতিমানসের নিকট নিজেকে সঁপিয়া দিয়া তাহার যন্ত্ররূপে চলে এবং নিজের স্বার্থ নিজে না খোঁজে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মন তাহার স্বধর্ম্ম সজ্ঞানে পূর্ণরূপেই পালন করে। সে স্বধর্ম্ম যথার্থতঃ এই যে সমস্ত রূপের পিছনে পরিচালকরূপে এক সার্ব্বভৌম সত্তা রহিয়াছে এ বোধ সচেতনভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, প্রতিভাসের ক্ষেত্রে শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে বা বাহিরের রূপে তাহাদের ক্রিয়াকে এমন ভাবে সীমিত করা, যাহাতে একরূপ অন্যরূপ হইতে পৃথক থাকিতে পারে। যিনি সর্ব্বগত বিশ্বতোশ্চক্ষু এবং সত্যসকল্প সেই পরমএকের বোধের অভ্রান্ত বিধানানুসারে সর্ব্ব পদার্থের সত্যকে বরণ করিয়া নেওয়া এবং সেই সত্যকে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দেওয়াই মনের প্রকৃত কাজ। সক্রিয় চৈতন্য, আনন্দ, শক্তি এবং পদার্থের মধ্যে এমন এক ব্যষ্টি ভাবকে ধারণ করিয়া থাকা ইহার কাজ, যে তাহার সমস্ত শক্তি, সমস্ত সত্য, সমস্ত আনন্দ পশ্চাতে অবস্থিত এক সার্ব্বভৌম বিশ্বসত্তা হইতে সর্ব্বদা অবিচ্ছেদ্যভাবে লাভ করিতেছে। একের বহুধা আত্ম-রূপায়ণকে এ মন এমন ভাবে আপাতবিভেদে রূপান্তরিত করে যাহাতে সে সমস্ত রূপ পরস্পর হইতে পৃথক থাকে এবং পরস্পরের বিচিত্র সম্বন্ধ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়; অথচ আবার পরস্পরের সংস্পর্শে আসিয়া মিলিত হইতে পারে। এক শাশ্বত একত্ব এবং বহুত্বের মধ্যে সংযোগ বিয়োগের এক আনন্দলীলা ফুটাইয়া তুলিবার জন্য মনের উদ্ভব হইয়াছে। এই মনের সহায়ে যিনি পরমএক তিনি এমন ভাবে ব্যবহার করেন যেন তিনি একজন ব্যষ্টি সত্তা, অন্য ব্যষ্টিসত্তার সহিত নানা বিচিত্র লীলায় সম্বন্ধ হইতেছেন অথচ এই লীলার মধ্যেও তাহার অখণ্ড ভাবকে অব্যাহত রাখিয়াছেন। খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডের এই লীলা, সসীমের মধ্যে অসীমের এই খেলাই ত প্রকৃত জগৎ। যাহা দ্বারা এ সমস্ত সম্ভব হইয়াছে ঋতচিতের প্রজ্ঞানবিভাগের সেই শেষ ক্রিয়া মন; আমরা যাহাকে অবিদ্যা বলি তাহা নূতন কিছু অথবা আত্যন্তিক এবং ঐকান্তিক মিথ্যা সৃষ্টি করে না, কিন্তু সত্যকে কেবল বিকৃত করিয়া দেখায়। মন জ্ঞানের উৎস হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াই অবিদ্যারূপে প্রকাশ পায় এবং পরমসত্যের সার্ব্বভৌম লীলার সুষমা ও সামঞ্জস্যের মধ্যে আপাতবিরোধ ও সংঘর্ষের একটা ভুল এবং আড়ষ্টবোধ জাগায়।

তাহা হইলে মনের ভ্রান্তির মূল এইখানে—আত্মজ্ঞান হইতে পতনে, যাহার ফলে ব্যষ্টিজীব তাহার নিজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে একেরই একরূপ মনে না করিয়া একটা স্বতন্ত্র সত্য বলিয়া মনে করে; সে ভুলিয়া যায় যে সে বিশ্বপুরুষেরই একটী কেন্দ্রীভূত রূপ, তাই নিজেকেই বিশ্বের কেন্দ্র বলিয়া মনে করে। এই আদিম ভ্রান্তির আনুষঙ্গিক ফলরূপে তাহার মাঝে দেখা দেয়—তাহার সমস্ত বিশিষ্ট অজ্ঞানতা, সীমা ও সঙ্কোচ। বিশ্বের যে প্রবাহ তাহার অন্তর ও বাহির প্লাবিত করিয়া চলিয়াছে তাহাকে মাত্র দেখিয়া সে তাহার সত্তার একটা সীমা নির্দ্দেশ করে এবং তাহা হইতে তাহার চৈতন্যের সুতরাং জ্ঞানের সীমা ও সঙ্কোচ আসিয়া পড়ে; তদ্রূপ তাহার সঙ্কল্প এবং শক্তির সীমানির্দ্দেশ হইতে তাহার নিজ সামর্থ্যের, তথা আত্মসম্ভোগ এবং আত্মানুভূতির সীমানির্দ্দেশ হইতে তাহার আনন্দের সীমা ও সঙ্কোচ উপস্থিত হয়। যাহা তাহার ব্যক্তিচেতনার কাছে আসে তাহাকে শুধু জানে বা তাহাদের সম্বন্ধে শুধু সচেতন হয় বলিয়া, এ সমস্ত ছাড়া অন্য পদার্থের জ্ঞান আর তাহার থাকে না এবং তাহার ফলে যাহা সে জানে বলিয়া মনে করে তাহাতেও ভ্রান্তি থাকিয়া যায়; কারণ বিশ্বের সমস্তই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল বলিয়া অংশকে ঠিকমত জানিতে হইলেও সমগ্রতাব অথবা মূল তত্ত্বের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এইজন্য মানুষের সকল জ্ঞানের মধ্যেই ভ্রান্তির একটা উপাদান থাকিয়া যায়। ঠিক তেমনি আমাদের ইচ্ছা বা সঙ্কল্প সর্ব্ব-সঙ্কল্পের বাকী অংশ জানে না বলিয়া, ক্রিয়ার মধ্যে ভ্রান্তিতে পড়ে এবং অল্প-বিস্তর অসামর্থ্য এবং বীর্য্যহীনতা দেখা দেয়। সর্ব্বানন্দকে ভুলিয়া যাওয়ার এবং সঙ্কল্প ও জ্ঞানের ন্যূনতার জন্য নিজের জগতের উপর প্রভুত্ব হারাইয়া ফেলে বলিয়া, জীবের নিজ এবং অন্য পদার্থ হইতে আনন্দ লাভের ক্ষেত্রেও, আনন্দ-ভাবনা দিয়া সকলকে আত্মসাৎ করিবার অসামর্থ্য এবং তাহার ফলে দুঃখ ও যন্ত্রণা আসিয়া পড়ে। সুতরাং নিজেকে নিজে না জানাই, আমাদের সত্তার সকল বিকৃতির মূল। আত্ম-জ্ঞান আত্মসীমার নির্দ্দেশ করিয়া অহমিকার রূপ ধারণ করে, সেই অহমিকার সীমাদ্বারা বিকৃতি হয় সুরক্ষিত।

তথাপি সকল অবিদ্যা এবং সকল বিকৃতি সত্য এবং ঋতের ভ্রান্তপথে গমনের ফলেই দেখা দিয়াছে; তাহা আত্যন্তিক মিথ্যার খেলা নহে। নিজেকে এবং নিজের বিভাগগুলিকে সাচ্চিদানন্দের সত্য খেলার প্রকাশ বা যন্ত্ররূপে না

দেখিয়া মন নিজকৃত ভেদভাবের দিকে একান্ত দৃষ্টি রাখিয়াছে বা 'অবিদ্যায়মন্তরে' অবিদ্যার ভিতর দিয়া দেখিতেছে বলিয়া এই ফল ফলিয়াছে। যে সত্য হইতে সে ভ্রষ্ট হইয়াছে তাহাতে যদি সে আবার ফিরিয়া যায়, যদি ঋতচিতান্তর্গত প্রজ্ঞানের শেষ ক্রিয়া বলিয়া সে নিজেকে পুনরায় জানিতে পারে তবে সত্য ও আলোকের মধ্যে যে সম্বন্ধ গড়িয়া তুলিতে সে সহায়তা করে, তাহা সত্যেরই সম্বন্ধ হয় বিকৃতির নয়। বৈদিক ঋষিরা এ উভয়ের পার্থক্য যে বাক্য দ্বারা সুস্পষ্ট করিয়াছেন সেই বাক্যে বলা যায় যে জগৎ তখন 'ঋজুনীত্যা' বা সরল পথে চলে, 'ধূর্ত্তিকে' আশ্রয় করিয়া বা কুটিল পথে চলে না, অর্থাৎ জগৎ তখন হয়, ভাগবদ্-সত্তায় আত্মবিধৃত যে চৈতন্য বা সঙ্কল্প বা আনন্দ নিজের মধ্যেই সুষম ছন্দে প্রবাহিত হইতেছে, তাহারই সত্য। বর্ত্তমানে আমাদের মন প্রাণের গতি ভ্রান্ত বা আঁকাবাঁকা পথে চলিতেছে, যে জীব তাহার স্বরূপ সত্তা ভুলিয়া গিয়াছে তাহার নিজ আত্মাকে ফিরিয়া পাইবার জন্য সংগ্রামের ফলে তাহার ভিতর দেখা দিয়াছে অঙ্গবিকৃতি; জীবের এ সংগ্রামের এবং প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য, জাগতিক সত্য এবং ভ্রান্তি, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম যে পরমসত্যকে সীমিত ও বিকৃত করিয়াছে, সমস্ত ভ্রান্তিকে সেই সত্তার দিব্য জ্যোতিতে রূপান্তর, সমস্ত বীর্য্য এবং সমস্ত দুর্ব্বলতা যে পরমাশক্তিকে ধরিবার জন্য প্রবল প্রয়াস, সমস্ত অসামর্থ্যকে সেই শক্তিতে রূপান্তর, সমস্ত সুখ ও সমস্ত দুঃখ যে পরমানন্দকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য বিপুল সংগ্রাম সমস্ত যন্ত্রণাকে সেই আনন্দে রূপান্তর, সমস্ত জীবন এবং সমস্ত মৃত্যু যে পরম অমৃতময় সত্তায় ফিরিয়া যাইবার জন্য আকুল এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা, সমস্ত মৃত্যুকে সেই অমৃতে রূপান্তর।

ঊনবিংশ অধ্যায়

প্রাণ

> প্রাণই সর্ব্বভূতের আয়ু; এইজন্য প্রাণকে সর্ব্বায়ু অথবা
> বিশ্বের জীবনতত্ত্ব বলা হয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদ (২।৩)

তাহা হইলে আমাদের মানবসত্তার নিম্নতর তিন তত্ত্ব বা উপাদানের মধ্যে যাহার স্থান সর্ব্বোচ্চে, সেই মনের দিব্য উৎস বা উৎপত্তিস্থান কি এবং ঋতচিতের সহিত ইহার সম্বন্ধ কি, তাহা বুঝিলাম। মন দিব্য চেতনার একটি বিশেষ ক্রিয়া অথবা তাহার সমস্ত সৃজন ক্রিয়ার শেষ সূত্র। ইহা দ্বারাই পুরুষ নিজের নানারূপ এবং শক্তির নানা বিচিত্র সম্বন্ধ পরস্পর হইতে পৃথক রাখেন। এই মন যে প্রাতিভাসিক ভেদ সৃষ্টি করে ঋতচিৎ হইতে স্খলিত ব্যষ্টিজীব সেই ভেদাভাসকে প্রকৃত মৌলিক ভেদ মনে করে। এই মূল বিকৃতি হইতে ইহার পরিণাম স্বরূপ নানা বিকৃতি আসিয়া পড়ে, যাহা নানা দ্বন্দ্ব এবং বিরোধরূপে অবিদ্যাকবলিত জীবের জীবনের স্বভাবধর্ম বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইহা অতিমানস হইতে বিযুক্ত না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত মন বিশ্বসত্যেরই নানা ক্রিয়াকে ধারণ করিয়া থাকে, বিকৃতি বা মিথ্যাকে নহে।

এভাবে দেখিলে মনকেও সৃষ্টিসাধিকা এক বিশ্বশক্তি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু মনের সম্বন্ধে আমরা সচরাচর এ ধারণা পোষণ করি না, বরং মনকে গ্রহণ বা অনুভূতির শক্তি বলিয়া দেখি। জড়ের মধ্যে শক্তির ক্রিয়ার ফলে যাহা সৃষ্ট হইয়াছে, মন তাহাকে অনুভব মাত্র করিতে পারে, জড়ে শক্তির ক্রিয়ায় যে সমস্ত রূপের উদ্ভব হইয়াছে, তাহাদিগকে নূতন ভাবে সাজাইয়া সমাহারের একটা নূতনত্ব আনিবার শক্তি (যাহাকে গৌণ সৃষ্টি বলা যায়) মাত্র মনের আছে ইহাই আমরা মনে করি। কিন্তু বর্ত্তমানে যে জ্ঞান আমরা পুনরাবিষ্কার করিতেছি তাহার সঙ্গে বিজ্ঞানের আধুনিক আবিষ্কারের সহায়তা গ্রহণ করিয়া

আমরা যাহা জানিতেছি, তাহা আমাদিগকে দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছে, যে এই শক্তিতে এবং জড়ে একটা অবচেতন মনের ক্রিয়া চলিতেছে এবং সেই ক্রিয়ার ফলেই যে মনের উদ্ভব এবং প্রকাশ হইতেছে তাহা একরূপ নিশ্চিত ; এই প্রকাশ প্রথমতঃ প্রাণের নানারূপে, দ্বিতীয়তঃ মনের নিজের বিচিত্র আকারে ; প্রথমে উদ্ভিদ এবং অতি নিম্নেস্থিত আদিম পশু জীবনে স্নায়বিকচৈতন্যরূপে পরে উচ্চতর পশু এবং মানুষের জীবনে মননতার ক্রমিক বিকাশে দেখা যাইতেছে। আমরা ইতিপূর্ব্বেই যেমন আবিষ্কার করিয়াছি যে জড় শক্তিরই বস্তুরূপ মাত্র, তেমনি আমরা দেখিতে পাইব যে জড়-শক্তিও মনের-ই শক্তিরূপ। বস্তুতঃ জড়শক্তি একটা অবচেতন ইচ্ছা বা সঙ্কল্পশক্তির ক্রিয়া মাত্র। যে ইচ্ছাশক্তি আমাদের মধ্যে ক্রিয়া করে, মনে হয় তাহা যেন জ্যোতির্ম্ময়, বস্তুতঃ যদিও তাহা আধা আলোক এবং আধা আঁধারের মিশ্রণ বই আর কিছু নয়। আর জড়শক্তি আমাদের নিকট মনে হয় বুদ্ধি বা চেতনা রহিত একান্ত অন্ধকার মাত্র, তবুও এদুটি জিনিষ স্বরূপতঃ এক, উভয় স্থানে বস্তুতঃ একই ইচ্ছাশক্তি ক্রিয়া করিতেছে। বিশ্বকে তাহার উল্টা বা নিচের দিক হইতে দেখিয়া জড়বিজ্ঞান স্বতঃই উভয়ের একত্ব সর্ব্বদা অনুভব করিয়াছে ; অধ্যাত্মবিজ্ঞান উপর হইতে দেখিয়া বহু পূর্ব্বে ইহা আবিষ্কার করিয়াছে। সুতরাং আমরা বলিতে পারি এক অবচেতন বিরাট মন বা বুদ্ধি চালকশক্তি বা ক্রিয়াসাধিকা প্রকৃতিরূপে প্রকাশ পাইয়া এই জগৎসৃষ্টি করিয়াছে।

কিন্তু আমরা দেখিয়াছি মন স্বতন্ত্র বা মূলতত্ত্ব নয় ; অতিমানস বা ঋতচিতের শেষ ক্রিয়াফলমাত্র, সুতরাং যেখানে মন আছে সেখানে অতিমানস অবশ্যই আছে। অতিমানসই বিশ্বসৃষ্টির সত্য প্রযোজক। এমন কি মন যখন তমসাচ্ছন্ন হইয়া তাহার উৎপত্তিস্থান হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে, তখনও মনের ক্রিয়ার মধ্যে সর্ব্বদা তাহার বৃহত্তর গতি, ক্রিয়া বা সংবেগ প্রচ্ছন্নভাবে আছে। সেই সংবেগই মনের ক্রিয়াতে সত্যসম্বন্ধ বা ঋতের বিধান বজায় রাখিতে বাধ্য করে, তাহাদিগকে অপরিহার্য্য পরিণামের দিকে লইয়া যায়, যথাযথ বীজ হইতে যথাযথ গাছ ফুটাইয়া তোলে, এমন কি অন্ধকারাচ্ছন্ন জড়শক্তির কার্য্যপ্রণালীর মধ্য হইতেও বিধান, শৃঙ্খলা এবং সত্যসম্বন্ধযুক্ত একটা ছন্দ সুষমা উদ্ভূত করে। তাহা না হইলে এ জগৎ হইত পরস্পর বিরোধী যদৃচ্ছা এবং মহাবিশৃঙ্খলার

রাজত্ব। অবশ্য এই শৃঙ্খলা, এই সম্বন্ধ বা এই ছন্দ আপেক্ষিক এবং মন যদি তাহার চেতনায় অতিমানস হইতে পৃথক হইয়া না পড়িত, তাহা হইলে যে পরম শৃঙ্খলা, পরমসত্যসম্বন্ধ বা পরম-সুষম-ছন্দের রাজত্ব জগতে দেখা দিত, তাহা সম্ভব হইতেছে না ; এই বিভাগকারী মনের ক্রিয়ার পক্ষে যাহা স্বাভাবিক এবং যথাযথ এমন ভাবের বিন্যাস, এমন ভাবের শৃঙ্খলামাত্র দেখা দিয়াছে এবং একই সত্যের বিপরীত প্রান্তস্থিত বিরোধাভাস লইয়া মন পরস্পর হইতে পৃথক যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাই শুধু প্রকাশ পাইয়াছে। ভাগবতী চেতনাতে এই দ্বৈত ভাব নিজেকে এইরূপে ভাগ করিয়া পৃথকরূপে দেখিবার কল্পনা, তাহারই সম্ভূত-বিজ্ঞানের মধ্যে জাগিয়াছিল, পশ্চাতে অবস্থিত সমগ্র ঋতচিতের প্রশাসনে ও পরিচালনে সেই কল্পনা কার্য্যতঃ জীবনের উপাদানে. তাহার এই নিম্নতর সত্য অথবা বিচিত্র সম্বন্ধের এই অপরিহার্য্য পরিণাম উদঘাটিত করিয়া দিয়াছে। কারণ বিশ্ব সত্য বা বিধানের ধারা এই যে সত্তার মধ্যে যাহা নিহিত থাকে, বস্তুর স্বরূপ প্রকৃতিতে যাহা গোপনে অনুস্যূত থাকে সত্যের কল্পনারূপে, জ্ঞানময় পুরুষের দিব্যদৃষ্টিতে বস্তুর যাহা স্বভাব এবং স্বধর্ম, তাহাই যথাযথভাবে প্রস্ফুরিত এবং প্রকাশিত হয়। উপনিষদের অপরূপ ভাষায় বলিতে পারি "কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্য সমাভ্যঃ"—এই মন্ত্রে অতি অল্প কথার মধ্যে বিশাল ভাবভাণ্ডার লুক্কায়িত আছে। ইহার অর্থ "সেই স্বয়ম্ভু যিনি কবি বা দ্রষ্টা এবং মনীষী, যেখানে যাহা কিছু আছে সেই সমস্ত হইয়াছেন, শাশ্বত কাল হইতে নিজের মধ্যে সকল অর্থ বা পদার্থ যথাযথ ভাবে বা তাহাদের স্বরূপসত্য অনুসারে, বিধান এবং বিন্যাস করিয়াছেন।"

অতএব দেহ, মন ও প্রাণের যে ত্রিভুবনে আমরা বাস করি, তাহা শুধু তাহাদের যথাভূত বাস্তব পরিণাম অনুসারেই ত্রিধা বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। জড়ের মধ্যে সংবৃত প্রাণ প্রস্ফুটিত হইয়াছে মননশীল চেতনার ধর্ম্ম লইয়া। মনের সঙ্গে মনে এবং সুতরাং প্রাণ ও জড়ে সংবৃত হইয়া আছে অতিমানস, যাহা হইতে অপর তিনের উৎপত্তি এবং যাহা তাহাদের চালক ও প্রভু। এই অতিমানসও অবশ্যই উন্মিষিত হইয়া উঠিবে। আমরা বিশ্বের মূলে এক বুদ্ধি আছে মনে করি এবং তাহাকে খুঁজি, কারণ যে সমস্ত তত্ত্বের কথা আমরা জানি তন্মধ্যে ইহাই উচ্চতম মনে হয়, বুদ্ধি দ্বারাই আমাদের ক্রিয়া এবং সৃষ্টি পরিচালিত হয় এবং

তাহারই আলোকে এ সমস্ত বুঝিতে পারি। সুতরাং আমরা ধরিয়া লই যে বিশ্বের মধ্যে যদি কোন চৈতন্য থাকে তাহা হইবে একপ্রকার বুদ্ধি, একপ্রকার মনোময়ী চেতনা। কিন্তু মন তাহার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কোন তত্ত্ব বা সত্যের ক্রিয়া, যতটা তাহার শক্তিতে কুলায়, সেই পরিমাণে সেই সত্যের অনুভব, প্রতিফলন বা ব্যবহার শুধু করিতে পারে। সুতরাং পশ্চাতে থাকিয়া যাহা কার্য্য করে তাহা সেই উচ্চতর সত্যের উপযোগী কোন শক্তি বা চৈতন্য, তাহা মন হইতে পৃথক ও শ্রেষ্ঠতর। সুতরাং আমাদের ধারণা সংশোধন করিয়া বলিতে হয়, যে অবচেতন মন বা বুদ্ধি এই বিশ্ব সৃষ্টি করে নাই। কিন্তু সংবৃত অতিমানসই শক্তির মধ্যে অবচেতনভাবে অবস্থিত তাহার সচেতন ইচ্ছা বা সঙ্কল্পশক্তির একটী বিশেষ ক্রিয়াশীল বিভূতিকে মনরূপে সাক্ষাৎভাবে পুরোভাগে রাখিয়া এবং জড়সত্তার ভিতর অবচেতন ভাবে অবস্থিত জড়শক্তি ও সঙ্কল্পকে কার্য্য নির্ব্বাহিকা প্রকৃতিরূপে ব্যবহার করিয়া এ বিশ্ব গড়িয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে এখানে যাহাকে আমরা প্রাণ নাম দিয়া থাকি শক্তির সেই বিশিষ্ট আকারের মধ্যেই মন প্রকাশ পায়। তাহা হইলে প্রাণ কি? অতিমানসের সঙ্গে ইহার যোগ কোথায়? সৎ-চিৎ-আনন্দের যে পরম ত্রিতত্ত্ব ঋতচিৎ বা সদ্ভূতবিজ্ঞানের সাহায্যে সৃষ্টিক্রিয়াশীল, তাহার সঙ্গে ইহার সম্পর্ক কি? সে ত্রয়ীর কোন তত্ত্ব হইতে ইহা উদ্ভূত হইয়াছে? দৈবী প্রকৃতি বা অদৈবী মায়া, সত্য বা ভ্রম, কাহার প্রেরণায় কোন প্রয়োজনে প্রাণ আবির্ভূত হইয়াছে? শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এই প্রাচীন বিলাপ, এই অনুযোগ চলিয়াছে যে জীবন একটা অনর্থ, একটা বঞ্চনা, একটা জঞ্জাল, একটা প্রলাপ, একটা পাগলামী; ইহা হইতে পলায়ন করিয়া শাশ্বত সত্তার পরমশান্তির মধ্যে আমাদিগকে চলিয়া যাইতে হইবে। সত্য কি তাই? সত্যই যদি হয় তবে কেন এমন হয়? কোন্ খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া শাশ্বত পুরুষ উদ্দেশ্যবিহীন এই অনর্থ সৃষ্টি করিলেন, এই প্রলাপ, এই বাতুলতা নিজের উপর আরোপ করিলেন অথবা তাহার ছলনাময়ী মায়ার দ্বারা সৃষ্ট জীবের উপর এই দারুণ দুর্য্যোগ এবং দুর্ভোগ চাপাইয়া দিলেন? বরং ইহাই কি সত্য নয় যে কোন দিব্যতত্ত্ব এইভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, শাশ্বত সত্তার আত্মপ্রকাশেচ্ছু কোন আনন্দশক্তি এইভাবে দেশ কালের মধ্যে অফুরন্তভাবে কোটি কোটি প্রাণের আকারে অসংখ্য জগৎকে ভরিয়া তুলিতেছে।

জড়কে ভিত্তি বা আধার করিয়া প্রাণ যখন আত্মপ্রকাশ করে তাহা যদি মনোযোগ দিয়া দেখি, তবে বুঝিতে পারি ইহা মূলতঃ ক্রিয়াশীল বিশ্বশক্তিরই একটী রূপ, যাহাতে জোয়ার ভাঁটার মত বিপরীত মুখী প্রবাহ আছে; ইহা শক্তির একটা অবিরাম খেলা যাহাতে রূপবৈচিত্র্য সৃষ্টি হইতেছে, যাহা নিয়ত প্রবাহিত বীর্য্যধারায় তাহাদিগকে শক্তিবন্ত করিয়া রাখিতেছে, তাহাদের উপাদানে ভাঙ্গিবার এবং গড়িবার সদা বর্ত্তমান এক ক্রিয়াধারার মধ্য দিয়া সে রূপরাজিকে বজায় রাখিতেছে। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে আমরা জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যে যে একটা স্বাভাবিক বিরোধ দেখিতে পাই তাহা আমাদের মনের ভুল, ব্যবহারিক জগতে বাহ্য অনুভবে সত্য বলিয়া বোধ হইলেও অন্তরের সত্যের জ্যোতিতে দেখিলে দেখিব যে সার্ব্বভৌম একত্বের মধ্যে বাহ্যদৃশ্যে ভুলিয়া, মন ভ্রান্তি বশতঃ যে বহু দ্বন্দ্ব ও বিরোধ দেখিতে পায়, এ বিরোধও তাহাদের অন্যতম। মৃত্যু জীবনেরই একটী ক্রিয়া ধারা ভিন্ন অন্য কিছু নয়; উপাদান একবার ভাঙ্গা আবার নূতন করিয়া গড়া, রূপের পরিবর্ত্তন করা এবং তদ্দ্বারাই রূপকে বজায় রাখা—ইহাই ত জীবনের নিত্যক্রিয়ার ধারা। রূপের মধ্য দিয়া যে অভিজ্ঞতা জীবনকে পাইতে হইবে তাহার পরিবর্ত্তন এবং বৈচিত্র্য আনা জীবনেরই প্রয়োজন, মৃত্যু দ্রুত ভাঙ্গিয়া দিয়া সেই প্রয়োজনই সাধন করে মাত্র। দেহের মৃত্যুতে জীবন ত শেষ হয় না, কেবল জীবনের একরূপ ভাঙ্গিয়া তাহারই উপাদানে অন্যান্য রূপ সৃষ্টি হয়। প্রকৃতির সমস্ত এক নিয়মে চলে বলিয়া আমরা নিশ্চিত হইতে পারি যে দেহের আধারে যদি মন বা চেতনার কোন শক্তি থাকে তবে তাহাও দেহ নাশের সঙ্গে নষ্ট হয় না, পরন্তু এক আধার ছাড়িয়া দেহান্তর সংক্রমণে বা আত্মার নূতন দেহধারণের কোন কৌশলে অন্য আধারে প্রবেশ করে। সমস্তই নবায়িত হয় কিছুই নষ্ট হয় না।

অতএব ইহা বলা যায় যে প্রাণ বা ক্রিয়াশীল এক মহাশক্তি সমস্ত বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইয়া অবস্থিত আছে—জড়ের দিকটা তাহার স্থূলতম স্পন্দন মাত্র—যাহা জড় জগতের সমস্ত রূপ সৃষ্টি করিতেছে; এ প্রাণ শাশ্বত অবিনশ্বর, যদি সমস্ত রূপের জগৎ নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় তবু তাহা বর্ত্তমান থাকিবে এবং তৎস্থানে একটা নূতন বিশ্ব গড়িয়া তুলিবার সামর্থ্যও তাহাতে থাকিবে। বস্তুতঃ কোন উচ্চতর শক্তি তাহাকে নিশ্চল ও নিষ্ক্রিয় করিয়া না রাখিলে অব্যাহতভাবে প্রাণ

সৃষ্টি ক্রিয়া করিয়া চলিবে। তাহা হইলে, যাহা বিশ্বে রূপরাজি গড়িয়া তুলিতেছে, তাহা বজায় রাখিতেছে এবং ভাঙ্গিয়া দিতেছে বা রূপজগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সংসাধন করিতেছে, প্রাণ সেই শক্তি ভিন্ন আর কিছু নহে। প্রাণই পৃথিবীরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আবার তেমনি পৃথিবীর উপর যে সমস্ত উদ্ভিদ জাত হইয়াছে এবং যে সমস্ত জীবজন্তু, তরুলতা বা অপর জন্তুদেহ ভক্ষণ দ্বারা তাহাদের আত্মসাৎ করিয়া বাঁচিয়া আছে, তাহারা সকলেই প্রাণের বিচিত্ররূপ। বস্তুতঃ বিশ্বপ্রাণ জড়ের আকার গ্রহণ করিয়া এ জগতের সর্ব্বসত্তায় পরিণত হইয়াছে। সেই প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে ইহা অবচেতন বা মনোময় প্রাণনে ফুটিয়া উঠিবার পূর্ব্বে জড়ক্রিয়ার ধারার মধ্যে প্রাণের ক্রিয়াধারা লুক্কায়িত রাখিতে পারে কিন্তু তথাপি সর্ব্বত্র সর্ব্বসময় এই সৃষ্টিশীল প্রাণতত্ত্ব বর্ত্তমান ছিল ও আছে।

এখানে এই বলা হইবে যে আমরা ত প্রাণ বলিতে ইহা বুঝি না, প্রাণ বলিতে আমরা যাহা বুঝি বা যাহা আমাদের পরিচিত, তাহা বিশ্বশক্তির একটা বিশেষ পরিণাম, যাহা প্রাণী এবং উদ্ভিদে প্রকাশ পায়, ধাতু প্রস্তর বা বায়বীয় পদার্থে নয়, জীবকোষে তাহার ক্রিয়া দেখা যায়, কিন্তু খাঁটি জড় পরমাণুতে নয়। সুতরাং আমাদের যুক্তির ভিত্তি দৃঢ় করিবার জন্য আমাদিগকে দেখিতে হইবে শক্তির যে পরিণামবিশেষকে আমরা প্রাণ বলি, তাহার খাঁটি প্রকৃতি কি এবং শক্তির অন্য যে পরিণামকে অচেতন পদার্থ বলি, যাহার প্রাণ নাই মনে করি, তাহার সহিত প্রাণের পার্থক্য কোথায়। আমরা দেখিতে পাই যে এই পৃথিবীতে শক্তির তিনটী লীলা ভূমি আছে, একটী পুরাতন শ্রেণী বিভাগের প্রাণীজগৎ যাহার মধ্যে আমরা পড়ি; দ্বিতীয় উদ্ভিদ্ জগৎ; তৃতীয় শুদ্ধ জড়জগৎ যাহাকে আমরা প্রাণশূন্য ধরিয়া লইয়াছি। আমাদিগকে দেখিতে হইবে আমাদের মধ্যে যে জীবন রহিয়াছে তাহার সহিত উদ্ভিদজগতের পার্থক্য কি? আবার উদ্ভিদজীবনের সহিত প্রাচীনেরা যাহাকে ধাতুজগৎ বলিতেন এবং আধুনিক বিজ্ঞান যাহাকে রাসায়নিক জগৎ বলিয়া আবিষ্কার করিয়াছে সেই নিষ্প্রাণ জগতের তফাৎ কোথায়?

সাধারণতঃ প্রাণের কথা বলিতে আমরা যাহারা খায় দায়, বেড়ায়, নিঃশ্বাস নেয়, অনুভব করে, বাসনা করে সেই পশুর জীবনের কথাই বুঝি; যখন আমরা উদ্ভিদের প্রাণের কথা বলি তখন তাহা খাঁটি সত্য মনে করি না; অনেকটা রূপকের ভাষায় যেন বলি তাহাদের প্রাণ আছে; কেননা প্রাণনক্রিয়ার দিক

হইতে না দেখিয়া উদ্ভিদের প্রাণকে খাঁটি জড়ক্রিয়াধারার দিক হইতে দেখা হইয়াছে। বিশেষতঃ আমরা শ্বাসক্রিয়াকে প্রাণের সঙ্গে একীভূত করিয়া দেখিয়াছি। প্রাণবায়ু বা শ্বাসই প্রাণ এ কথাটা সব ভাষাতেই আছে; প্রাণবায়ু বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি সে ধারণার পরিবর্ত্তন হইলেও কথাটা সত্য বলিয়াই মনে করি। কিন্তু ইহা স্পষ্ট যে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে চলাফেরা করা, শ্বাস নেওয়া বা আহার করা প্রাণের কার্য্যপ্রণালী বটে কিন্তু প্রাণের স্বরূপ নহে। আমাদের ভিতরে সর্ব্বদা যে শক্তি জীবনীশক্তি (vitality) রূপে উদ্দীপিত হয়, তাহা এই সমস্ত শারীরক্রিয়া অবলম্বন করিয়া জাত বা সঞ্চালিত হয় এবং আমাদের দেহ ধারণের জন্য ভাঙ্গা এবং গড়ার যে সমস্ত ক্রিয়াধারার প্রয়োজন, তাহাও ইহারা পোষণ করে কিন্তু শ্বাসপ্রশ্বাস এবং দেহপোষণের অভ্যস্ত আয়োজন ছাড়া অন্য উপায়েও জীবনাশক্তির এই সমস্ত ক্রিয়া ধারাকে বজায় রাখা যায়। ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যখন শ্বাসপ্রশ্বাস, হৃৎস্পন্দন বা যে সমস্ত অবস্থা প্রাণ-ধারণের পক্ষে অপরিহার্য্য বলিয়া পূর্ব্বে মনে করা হইত, সে সমস্ত সাময়িকভাবে বন্ধ বা স্তম্ভিত রাখিয়াও মানুষ এই দেহে বাঁচিতে, এমন কি সে সময় পূর্ণভাবে সচেতন থাকিতে পারে। আবার সচেতনভাবে সাড়া দেওয়ায় শক্তি উদ্ভিদের আছে ইহা এখন পর্য্যন্ত অস্বীকার করিলেও অন্ততঃ পক্ষে উদ্ভিদের মধ্যে আমাদেরই দৈহিক প্রাণের মত প্রাণ আছে এবং আপাতদৃশ্যে গঠন প্রণালীতে পার্থক্য থাকিলেও মূলতঃ আমাদের প্রাণের মতই গঠিত হইয়া উঠিতেছে—ইহা প্রমাণের জন্য অনেক তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা যদি প্রমাণ হয় তথাপি অনায়াসলব্ধ পুরাতন মিথ্যা ধারণাসমূহকে একেবারে দূর করিবার জন্য আমাদিগকে বহিরঙ্গ লক্ষণ সমূহকে অতিক্রম করিয়া জীবনতত্ত্বের মূলে পৌছিতে হইবে।

যদি তাহাদের সিদ্ধান্ত স্বীকার করা যায় তবে জড় বিজ্ঞানের কয়েকটী আধুনিক আবিষ্কার * জড়ের মধ্যস্থিত প্রাণের সমস্যার উপর খুব উজ্জ্বল আলোক

---

* এখানে জড় প্রাণের প্রকৃতি এবং ক্রিয়াধারা সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা প্রমাণ করিবার জন্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার কথা উল্লেখ করা হয় নাই, উদাহরণ স্বরূপ দেওয়া হইয়াছে। বিজ্ঞান এবং তত্ত্ববিদ্যার (সে তত্ত্ববিদ্যা শুধু বুদ্ধির উপর অথবা ভারতের মত অধ্যাত্মদর্শন এবং অধ্যাত্ম অনুভবের ভিত্তির উপর, এ দুএর যে ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হউক না কেন)

পাত করে। ভারতেরই একজন বৈজ্ঞানিক আমাদের দৃষ্টি গভীর রূপে আকর্ষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, আঘাতে সাড়া দেওয়াই প্রাণের অস্তিত্বের নিশ্চিত লক্ষণ। তিনি যে তথ্য আহরণ করিয়াছেন উদ্ভিদের জীবন রহস্যকেই তাহা বিশেষ ভাবে আলোকিত করিয়াছে, তাহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ক্রিয়া সকলের পরিচয় দিয়াছে। কিন্তু আমরা যেন একথা না ভুলি যে আঘাতে সাড়া দেওয়া প্রাণের মূল লক্ষণ, সাড়া দেওয়ার অবস্থাকে প্রাণ এবং না দেওয়ার অবস্থাকে আমরা মৃত্যু বলি। এই মূল বিষয়টী তিনি ধাতু এবং উদ্ভিদ এ উভয়ের মধ্যেই দেখাইয়াছেন। উদ্ভিদের মত ধাতুর বেলায় এত প্রচুর প্রমাণ দেওয়া সম্ভব হয় নাই। উভয় ক্ষেত্রে যে জীবনের গঠন প্রণালী মূলতঃ এক তাহাও হয়ত প্রমাণিত হয় নাই, এবিষয়ের উপযোগী অতি সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তন প্রদর্শনকারী যন্ত্র আবিষ্কৃত হইলে ধাতু এবং উদ্ভিদের প্রাণ ক্রিয়ায় আরও অনেক মিল, অনেক সাম্য আছে তাহা দেখান যাইতে পারে। যদি তাহা দেখান সম্ভব না হয় তাহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে উদ্ভিদের মত একই প্রকারের অথবা প্রাণশক্তিপ্রকাশের উপযোগী কোন অবয়বসংস্থান ধাতুতে নাই তবুও প্রাণনের প্রথম প্রারম্ভ তাহাতে থাকিতে পারে। তাহার প্রকাশের লক্ষণ যতই অস্পষ্ট হউক ধাতুর মধ্যে প্রাণ থাকে ইহা যদি স্বীকার করা যায়, তবে আমাদিগকে ইহা স্বীকার করিতে আর বেশী বাধা থাকে না যে, ধাতুর সমজাতীয় অন্য জড় পদার্থে অথবা মাটির মধ্যেও, যতই সংবৃত যতই প্রাণনের প্রাথমিক ভাবে হউক না কেন, প্রাণ আছে। আমরা যদি গবেষণায় আরও অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারি, যেখানে আমাদের অনুসন্ধানের উপায় শেষ হইয়া গিয়াছে বলিয়া আপাত বোধ হইতেছে সেখানে

ক্ষেত্র এবং গবেষণার ধারা পৃথক। ইহাদের কেহই একের সিদ্ধান্ত অপরের ঘাড়ে চাপাইতে পারে না। কিন্তু আমরা যদি যুক্তিযুক্ত এই বিশ্বাস স্বীকার করি যে অন্তরে একই সত্য ও সত্তা বর্ত্তমান এবং প্রকৃতির সর্ব্ব অবস্থায়ই একটা মিল বা সামঞ্জস্য আছে, তাহা হইলে যে শক্তি বিশ্বে ক্রিয়াশীল তাহার গতি ও প্রকৃতির উপর জড় জগতের সত্যও কতকটা আলোক পাত করিতে পারে একথা ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে। অবশ্য যে আলোক পড়িবে তাহা পূর্ণ আলোক নয়, কারণ জড় বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ এবং অতীন্দ্রিয় গোপন শক্তির ক্রিয়া বুঝিবার কোন উপায় বিজ্ঞানের নাই।

যদি না থামিয়া থাকি, তবে প্রকৃতির অপরিবর্ত্তনীয় অভিজ্ঞতায় আমরা ইহা নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি যে, আমাদের এই ভাবের অনুসন্ধানে অবশেষে প্রমাণ করিবে প্রকৃতির মধ্যে কোন ছেদ বা ফাঁক নাই, মাটি এবং মাটির বুকে জাত ধাতুর মধ্যে অথবা ধাতু এবং উদ্ভিদের মধ্যে কোন দৃঢ় সীমা রেখা টানা যায় না। সমন্বয়ের এই সূত্র ধরিয়া যদি অগ্রসর হই তবে দেখিব যে, যে মৌলিক পদার্থ এবং পরমাণু দ্বারা জগৎ বা তন্মধ্যস্থ ধাতু গঠিত হইয়াছে তাহাদের পরস্পরের মধ্যেও সেরূপ কোন সীমারেখার সন্ধান পাওয়া যায় না। জগতে পর পর সাজান সত্তার যে সমস্ত স্তর আছে তাহার প্রত্যেকটি পরবর্ত্তী স্তরকে গড়িয়া তোলে, যাহা পরে আসিবে তাহা পূর্ব্বাবস্থার মধ্যে বীজরূপে বর্ত্তমান থাকে। গুপ্ত বা প্রকাশিত, সংবৃত বা বিবৃত, সুগঠিত বা প্রাথমিক যে ভাবেই হউক প্রাণ সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আছে—আছে সার্ব্বভৌমভাবে বিশ্বব্যাপ্ত এবং অবিনশ্বর হইয়া। কেবল তাহার আকৃতি এবং গঠনে ভেদ আছে।

আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ বা চলা ফেরা করিবার শক্তির মত, অভিঘাতে বাহ্য সাড়া দেওয়া প্রাণের একটা বহিরঙ্গ লক্ষণ মাত্র। গবেষক যে জিনিস লইয়া পরীক্ষা করেন তাহাতে সজোরে একটা আঘাত দেন, তাহার ফলে যখন স্পষ্ট সাড়া পাওয়া যায়, তখনই আমরা স্বীকার করি যে প্রাণনের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে, কিন্তু উদ্ভিদ তাহার সমস্ত জীবন ব্যাপিয়াই তাহার পরিবেশ হইতে আঘাত পাইতেছে এবং সর্ব্বদাই সাড়া দিতেছে, অর্থাৎ আঘাত পাইলে সাড়া দেওয়ার এক শক্তি তাহাতে নিত্য বর্ত্তমান আছে। কেহ কেহ ইহাও বলিয়াছেন যে এই সমস্ত পরীক্ষা দ্বারা উদ্ভিদ অথবা অন্যান্য জীবদেহে প্রাণশক্তি বলিয়া কোন বিশেষ শক্তি নাই ইহা প্রমাণিত হইয়াছে, কিন্তু আমরা যখন বলি উদ্ভিদকে আঘাত দেওয়া হইয়াছে তখন ইহাই বুঝি যে তাহার দিকে একটা সক্রিয় শক্তি সবলে প্রযুক্ত হইয়াছে এবং আমরা যখন বলি উদ্ভিদটা সাড়া দিতেছে, তখন এই বুঝি যে আঘাতের উত্তররূপে উদ্ভিদ হইতে অনুভব শক্তি সম্পন্ন একটা সক্রিয় শক্তি প্রকাশ পাইতেছে। উদ্ভিদের মধ্যে সক্রিয়ভাবে বাহির হইতে আগত আঘাত বা স্পন্দন গ্রহণ করিবার এবং তাহাতে সাড়া দিবার শক্তি যেমন আছে, তেমনি তাহার সঙ্গে বাঁচিয়া থাকিবার এবং বর্দ্ধিত হওয়ার একটা ইচ্ছা বা আকূতি আছে। এই আকূতির নির্দ্দেশে

বুঝা যায় চিৎশক্তির অবমানস প্রাণজড়ময় একটা বিভাব রূপময় সত্তায় গোপন ভাবে অবস্থিত আছে। বস্তুতঃ ইহাই যেন বোধ হয় যে জগতে একটা সক্রিয় শক্তির ক্রিয়া সর্ব্বদা চলিতেছে, যাহা অল্পবিস্তর স্থূল বা সূক্ষ্ম জড়রূপ গ্রহণ করিতেছে, ঠিক তেমনি আবার প্রতি দেহে বা প্রতিবস্তুতে—উদ্ভিদ, জীব বা ধাতু যে রূপেই থাকুক না কেন—সেই সক্রিয় সদা বর্ত্তমান শক্তির একটা ভাণ্ডারও বর্ত্তমান আছে। এই দুইএর পরস্পরের বিনিময়ের কোন কোন খেলাকে আমরা প্রাণ নামে অভিহিত করি। সেই ক্রিয়াকে আমরা প্রাণন ক্রিয়া বলি এবং যাহা নিজেকে নিজে এমন ক্রিয়াশীল করিয়া তোলে তাহাকে প্রাণশক্তি নামে অভিহিত করি। মনের ক্রিয়া, প্রাণের ক্রিয়া, জড়ের ক্রিয়া একই বিশ্বশক্তির নানা বিচিত্র ক্রিয়া মাত্র।

এমন কি যখন কোন দেহ মৃত বলিয়া মনে হয়, তখন যদিও আমাদের পরিচিত প্রাণক্রিয়া স্তম্ভিত হইয়া যায় এবং তাহা স্থায়ীরূপে শেষ হইবার সময় আসন্ন হইয়া থাকে, তথাপি সেখানে তখনও প্রাণশক্তি গুপ্তভাবে বর্ত্তমান থাকিতে পারে। এইরূপ কোন কোন ক্ষেত্রে মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করা যায়; অভ্যস্ত-ক্রিয়া ধারা, অভিঘাতে সাড়া দেওয়ার সামর্থ্য, সক্রিয় শক্তি ও ক্রিয়ার প্রবাহ পুনরায় ফিরাইয়া আনা যায়। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে যাহাকে আমরা প্রাণ বলি তাহা তখনও সে দেহে বর্ত্তমান ছিল; অর্থাৎ তখন প্রাণ ছিল গুপ্ত এবং শরীরের বা স্নায়ুর সাধারণ ক্রিয়া, জান্তব-মনশ্চেতনার সাড়া দেওয়া প্রভৃতি যে সমস্ত কর্ম্মে সে দেহ বরাবর অভ্যস্ত ছিল তাহার কোনটার-ই প্রকাশ ছিল না। একথা মানিয়া লওয়া কঠিন যে প্রাণ নামক একটা বিশেষ সত্তা বা বস্তু দেহ হইতে এক্ষেত্রে একেবারেই বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল এবং কেহ যখন তাহার দেহকে উত্তেজিত করিতেছে, তখন তাহার দেহে সে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে, কেননা দেহের একেবারে বাহিরে থাকিলে দেহকে উত্তেজিত করিবার কথা সে জানিল কি করিয়া? কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও দেখা যায় যে কোন লোকের জীবনের বাহ্য লক্ষণ এবং প্রাণক্রিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে যদিও সে সময় তাহার মন সম্পূর্ণ সচেতন আছে অথচ সে মন দেহকে ক্রিয়াশীল করিতে পারিতেছে না। উদাহরণ স্বরূপ নিস্পন্দ বায়ুরোগে (catalepsy) আক্রান্ত ব্যক্তির অবস্থার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এক্ষেত্রে ত নিশ্চয়ই

বলা চলে না যে লোকটার দেহ মৃত হইয়াছে কিন্তু মন বাঁচিয়া আছে অথবা প্রাণ দেহ হইতে চলিয়া গিয়াছে, অথচ মন দেহের মধ্যে বাস করিতেছে, তখন কেবল ইহাই বলা যায় যে সাধারণ দৈহিক ক্রিয়া স্তম্ভিত হইলেও মন সক্রিয় আছে।

কোন কোন বিশেষ সমাধির অবস্থায়ও দেহের এবং বহিশ্চর মনের ক্রিয়া বন্দ হইয়া যায়। পরে আবার তাহাদের ক্রিয়ার আরম্ভ হয়, কখনও বাহিরের উত্তেজনায়, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে ভিতর হইতে স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেরণার বশে। এরূপ ক্ষেত্রে যাহা ঘটে তাহা এই যে, বহিশ্চর মন ও প্রাণ অবচেতনে অবস্থিত মন ও প্রাণে প্রত্যাহৃত হয় এবং হয় সমগ্র মানুষটি অবচেতনভূমিতে ডুবিয়া যায়, না হয় তাহার বহির্জ্জীবন অবচেতনে সংহৃত এবং অন্তরের সত্তা অতিচেতন লোকে উন্নীত হয়। কিন্তু এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের প্রধান দেখিবার বিষয় এই যে, যে শক্তি—তাহার স্বরূপ যাহাই হউক না কেন—দেহের আধারে প্রাণের সক্রিয় সামর্থ্যকে রক্ষা করে তাহা বাহিরের ক্রিয়াকে স্তব্ধ রাখিয়াছে বটে, তথাপি দেহগত জৈবব্যবস্থা অনুপ্রাণিত করিতেছে। কিন্তু অবশেষে একটা সময় আসিয়া পড়ে যখন স্তম্ভিত ক্রিয়াশক্তিকে আর পুনরুজ্জীবিত করা যায় না; ইহা যখন ঘটে তখন দেখা যায় দেহের মধ্যে এমন একটা ছেদ ঘটান হইয়াছে, যাহার ফলে দেহটা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে বা তাহার অভ্যস্ত ক্রিয়া পরিচালনার শক্তি নষ্ট হইয়াছে; অথবা সে রকম ছেদ না ঘটিলেও শরীরের উপাদান সমূহে ভাঙ্গন আরম্ভ হইয়াছে অর্থাৎ যে শক্তি পরিবেশের মধ্যে রহিয়া অন্যান্য সকল শক্তির সহিত সাড়া বিনিময় করিতে অভ্যস্ত ছিল, তাহা সেই সমস্ত শক্তির স্পর্শে এখন সম্পূর্ণ অসাড়, সুতরাং প্রাণক্রিয়াকে নূতন করিয়া সচল করিতে পারিতেছে না। তখনও দেহে প্রাণ আছে কিন্তু যে সমস্ত মূল উপাদান দিয়া দেহ গঠিত হইয়াছে তাহারা বাহির হইয়া গিয়া, যাহাতে নূতন দেহ গড়িবার কাজে লাগিতে পারে, প্রাণ নিযুক্ত আছে সেই উদ্দেশ্যে দেহকে কেবল ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া চলিবার জন্য। বিশ্বশক্তির যে ইচ্ছা দেহকে ধারণ করিয়াছিল বলিয়া দেহ সংহত ছিল তাহা সে কাজ হইতে সরিয়া গিয়া উপাদানগুলির ভাঙ্গনের কাজ সমর্থন করিতেছে। যত দিন তাহা না ঘটে তত দিন দেহের সত্যিকার মৃত্যু হয় না।

তাহা হইলে প্রাণ বিশ্বশক্তিরই একটী সক্রিয় খেলা, সে শক্তির মধ্যে কোন না কোন আকারে অন্ততঃ পক্ষে প্রচ্ছন্নভাবে তত্ত্বরূপে মানসচেতনা এবং স্নায়ুগত প্রাণবৃত্তি সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছে, তাই তাহারা আমাদের এই জগতে জড়ে আকারের মধ্যে দেখা দেয় এবং তাহাদের প্রকাশ ক্ষেত্র গড়িয়া তোলে। এই শক্তি যে বিচিত্ররূপরাজি গড়িয়া তুলিয়াছে এবং তাহাদের প্রত্যেকের ভিতর তাহার নিজেরই সক্রিয় নাড়ীস্পন্দন নিত্য রক্ষা করিতেছে, সেই সমস্ত রূপের মধ্যে যখন অভিঘাত বা উত্তেজনা এবং তাহার সাড়ার অন্যোন্য বিনিময় চলে, তখনই শক্তির প্রাণলীলা প্রকাশ পায়। প্রত্যেক রূপই সর্ব্বদা এই সাধারণ শক্তির নিঃশ্বাস এবং বীর্য্য গ্রহণ এবং ত্যাগ করিতেছে; নানা উপায়ে প্রত্যেক রূপ এ শক্তিকেই তাহার আহার্য্যরূপে গ্রহণ করিতেছে, তাহা দ্বারা নিজের পুষ্টিসাধন করিতেছে, কখনও বা পরোক্ষভাবে—যাহাতে ইহার বীর্য্য বা তেজ সঞ্চিত আছে সেই সমস্ত পদার্থ আহার করিয়া, কখনও বাহিরে বিচ্ছুরিত সক্রিয় শক্তিকে সাক্ষাৎভাবে টানিয়া লইয়া। এ সমস্তই প্রাণের লীলা, কিন্তু যখন তাহার বহিশ্চর এবং জটিলক্রিয়া যথোপযুক্ত পরিমাণে সংহত এবং গঠিত হইয়া উঠে, বিশেষতঃ যে স্নায়ুদ্বারা আমাদের অবয়ব গঠিত এবং যে স্নায়ুর দ্বারা আমরা সকল সংস্পর্শ লাভ করিতে অভ্যস্ত, সেই স্নায়বিক গঠনের মধ্য দিয়া যখন প্রাণশক্তি প্রকাশ পায়, আমরা প্রধানতঃ তখনই তাহার পরিচয় পাই। এইজন্য উদ্ভিদে প্রাণের অস্তিত্ব আমরা সহজে স্বীকার করি, কারণ সেখানে প্রাণের লক্ষণ স্পষ্ট; এ স্বীকার করা আরও সহজ হয় যখন দেখি স্নায়ুক্রিয়ার চিহ্ন যেন উদ্ভিদেও প্রকাশ পায় এবং তাহাদের এবং আমাদের প্রাণের গঠন এবং কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে বিভিন্নতা খুব বেশী নাই। কিন্তু ধাতু, মৃত্তিকা, বা পরমাণুতে প্রাণের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে আমরা অনিচ্ছুক, কারণ এই সমস্ত বাহ্য লক্ষণ সেখানে খুঁজিয়া বাহির করা শক্ত, অথবা আপাতদৃষ্টিতে যেন নাই।

বাহিরের এই প্রভেদ স্বরূপভেদ বলিয়া মনে করিবার কোন সমর্থন আছে কি? আচ্ছা, আমাদের জীবন এবং উদ্ভিদ জীবনের মধ্যে তফাৎ কোথায়? দুই বিষয়ে তফাৎ দেখিতে পাই। প্রথম আমাদের চলা ফেরা করিবার শক্তি আছে উদ্ভিদের নাই, কিন্তু স্পষ্টতঃ এ শক্তি প্রাণক্রিয়ার কোন অবিচ্ছেদ্য মূল লক্ষণ নহে; দ্বিতীয় আমাদের সচেতন বোধশক্তি আছে এবং যতদূর আমরা জানি

উদ্ভিদের মধ্যে সে শক্তির বিকাশ হয় নাই। আমাদের স্নায়ুতে যে সাড়া দেখা দেয় তাহা—সর্ব্বদা এবং পূর্ণমাত্রায় না হইলেও—মনের মধ্যে সচেতন ইন্দ্রিয় বোধের একটা সাড়া অনেক পরিমাণে জাগায়। মনের কাছে, স্নায়ুমণ্ডলীর কাছে এবং স্নায়ুর ক্রিয়া দ্বারা আলোড়িত দেহের কাছে সে সাড়ার একটা মূল্য আছে। মনে হয় উদ্ভিদের মধ্যে স্নায়বিক বোধ যে আছে তাহার অনেক লক্ষণ বা চিহ্ন আমরা দেখিতে পাই; উদ্ভিদের স্নায়বিক বোধের কতকগুলি আমরা আমাদের মধ্যে যাহাদিগকে ইন্দ্রিয়জ সুখ এবং দুঃখ, জাগরণ এবং নিদ্রা, উচ্ছ্বাস, অবসাদ এবং ক্লান্তি নাম দিই, তাহাদেরই যেন অনুরূপ, এই সমস্ত স্নায়বিক ক্রিয়াদ্বারা মানুষের মত উদ্ভিদের দেহও আন্দোলিত হয় কিন্তু মনশ্চেতনায় কোন সচেতন বোধরূপে ফুটিয়া উঠিবার কোন লক্ষণ উদ্ভিদের মধ্যে দেখা যায় না। কিন্তু মনে বা প্রাণে, যেখানেই অনুভূতি বা বোধ জাগুক না কেন, বোধ সকল ক্ষেত্রেই বোধ এবং স্নায়বিক বোধও চেতনার একটা রূপ। স্পর্শকাতর উদ্ভিদ যখন কোন স্পর্শে সঙ্কুচিত হয় তখন বোধ হয় যে তাহার স্নায়ু প্রভাবিত হইতেছে এবং তাহার মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা স্পর্শটা পছন্দ করিতেছে না, এবং তাই সঙ্কুচিত হইতে, সরিয়া আসিতে চেষ্টা করিতেছে; এক কথায়, যেমন আমরা জানি যে আমাদের মধ্যে অবচেতন বোধ ও ক্রিয়া আছে উদ্ভিদের মধ্যে সেই জাতীয় অবচেতন বোধ বা তাহার ক্রিয়া আছে। মানুষেব মধ্যে অবচেতন বোধলাভের বহু পরে যখন স্নায়ুমণ্ডলিতে তাহার কোন প্রভাব বর্ত্তমান নাই, তখনও এই অবচেতন অনুভূতিগুলিকে টানিয়া উপরে চৈতন্যের বহির্ভাগে তোলা সম্পূর্ণ সম্ভব। নিত্য উপচীয়মান স্তূপাকার সাক্ষ্য দ্বারা অকাট্য ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, মানুষের মধ্যে একটা অবচেতন মননের ক্ষেত্র আছে এবং তাহা তাহার সচেতন মনের ক্ষেত্র অপেক্ষা অনেক ব্যাপক। মানুষের মধ্যে যেমন একটা বহিশ্চর জাগ্রত মন আছে, যাহা অবচেতন বোধের মূল্য নির্ণয় করিতে পারে উদ্ভিদের তাহা নাই—কিন্তু তাহাতে উভয় ক্ষেত্রে অনুভূতি বা বোধ যে এক, তাহার কোন পার্থক্য হয় না। অবচেতন বোধ মানুষের এবং উদ্ভিদের মধ্যে যখন এক, তখন যাহাকে তাহারা প্রকাশ করিতেছে তাহাও এক হইবে অর্থাৎ মানুষের মধ্যে অবচেতন মন বলিয়া কিছু থাকিলে উদ্ভিদের মধ্যেও তাহা থাকিবে। অবচেতন মননের আরও প্রাথমিক ক্রিয়া ধাতুর মধ্যে থাকা সম্পূর্ণ সম্ভব, যদিও স্নায়বিক ক্রিয়া দ্বারা

আলোড়িত হইবার মত দেহযন্ত্র তাহার নাই, অথবা স্নায়ুর অনুরূপ কিছু তাহার মধ্যে এখনও প্রকাশ হয় নাই। কিন্তু যেমন দেহের চলৎশক্তি না থাকিলেও উদ্ভিদের মধ্যে প্রাণশক্তি থাকার মূলতঃ কোন বাধা হয় নাই, তদ্রূপ দেহের আন্দোলন না থাকিলেও ধাতুতে প্রাণশক্তি থাকার কোন মূল বাধা নাই।

শরীরে চেতনা যখন অবচেতনায় বা অবচেতনা যখন চেতনায় পরিবর্ত্তিত হয়, তখন কি ঘটে? খাঁটি পার্থক্য এই যে চিৎশক্তি তাহার কর্ম্মের একটি অংশে অভিনিবিষ্ট হয়, তাহাতে অল্পবিস্তর একাগ্র বা তদ্গত হইয়া পড়ে। কোন কোন একাগ্রতায় প্রজ্ঞানের সেই বৃত্তি যাহাকে আমরা মনশ্চেতনা বলি, তাহা সচেতন ভাবে ক্রিয়া করিতে প্রায় বা সম্পূর্ণ বিরত হয়, তথাপি তখনও দেহ, স্নায়ুমণ্ডলি এবং ইন্দ্রিয়বোধ অজ্ঞাতসারে সতত কাজ করে এবং নিখুঁত ভাবেই করে। তখন একটীমাত্র ক্রিয়া বা ক্রিয়ার একটীমাত্র ধারা লইয়া মন সক্রিয় থাকে, বাকী সমস্তটা অবচেতন হইয়া পড়ে। যখন আমি লিখিতেছি তখন লিখিবার জন্য যে দৈহিক ক্রিয়া প্রয়োজন তাহার অধিকাংশ, কখনও সমস্তটা অবচেতন মন দ্বারা কৃত ও পরিচালিত হয়, তখন আমরা বলি শরীরে অচেতন ভাবে কোন কোন স্নায়ুক্রিয়া চলিতেছে, কিন্তু মন যে চিন্তা লইয়া আছে শুধু তাহাতে জাগ্রত বা সচেতন আছে। সমস্ত মানুষটাও অবচেতন অবস্থায় ডুবিয়া যাইতে পারে তথাপি সাধারণতঃ যাহাতে মনের ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় এমন অভ্যস্ত ক্রিয়াও চলিতে পারে, যেমন অনেক প্রকার স্বপ্নে দেখা যায়; অথবা সে অতিচেতনে উঠিয়া যায় তথাপি শরীরস্থ প্রচ্ছন্ন বা মগ্নচৈতন্য ক্রিয়াশীল থাকে, যেমন কোন কোন যোগ সমাধিতে দেখা যায়। ইহা হইতে উদ্ভিদের এবং আমাদের বোধের পার্থক্য এই ভাবে স্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে—উদ্ভিদের মধ্যে যে সচেতন শক্তি বিশ্বে আত্মপ্রকাশ করিতেছে তাহা এখন জড়ত্বের নিদ্রা হইতে পূর্ণরূপে জাগরিত হয় নাই। অথবা ক্রিয়মান শক্তি জড়ে এমন অভিনিবিষ্ট বা জড়ের সঙ্গে এমন তদ্গত চিত্ত হইয়াছিল যে, অতিচেতন জ্ঞানে অবস্থিত তাহার কর্ম্মের মূল উৎস হইতে পূর্ণরূপে পৃথক হইয়া পড়িয়াছিল; উদ্ভিদ জীবনেও তাহার ঘুমঘোর কাটে নাই। সুতরাং যখন সে শক্তি মানুষের মধ্যে জড়ের অভিনিবেশ হইতে মুক্ত হইতে চাহিতেছে এবং—এখনও পরোক্ষভাবে হইলেও—নিজের আত্মজ্ঞানে জাগরিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা সচেতন ভাবে যাহা

করিবে উদ্ভিদের মধ্যে অবচেতন ভাবে তাহাই করিতেছে। এইভাবে এ শক্তির একই খেলা চলিতেছে কিন্তু বিভিন্নভাবে এবং চৈতন্যের ভাষায় তাহাদের মূল্যও বিভিন্ন।

একথা ধারণা করা আমাদের ক্রমেই সম্ভব হইয়া আসিতেছে যে জড়পরমাণুর মধ্যেও এমন একটা কিছু আছে, যাহা আমাদের মধ্যে আসিয়া ইচ্ছা ও বাসনার রূপ নিয়াছে। পরমাণুর আকর্ষণ ও বিকর্ষণ এবং আমাদের অনুরাগ ও বিরাগ দেখিতে ভিন্ন হইলেও মূলতঃ এক—শুধু আমরা বলি পরমাণুর ক্ষেত্রে ইহা নিশ্চেতন বা অবচেতন। ইচ্ছা ও বাসনার মূল বিশ্বের সর্ব্বত্র আছে স্পষ্টভাবে, যদিও আমরা ইহা এখনও স্পষ্টভাবে জানি নাই যে, এ ইচ্ছা ও বাসনা বিশ্বের সর্ব্বত্র অনুস্যূত একটা অবচেতন বোধ বা বুদ্ধির সহিত জড়িত, অথবা বস্তুতঃ ইহারা তাহারই প্রকাশের বিভিন্নরূপ ; ইচ্ছা হইলে ইহাকে নিশ্চেতন অথবা সম্পূর্ণরূপে সংবৃত বলিতে পার। প্রতি পরমাণুতে ইহা আছে বলিয়া প্রত্যেক পদার্থেও ইহা অবশ্য থাকিবে, কারণ পরমাণুপুঞ্জ একত্র সমাহৃত হইয়াই বস্তুতে পরিণত হয়। আবার পরমাণুতে ইহা থাকিবার কারণ, যে শক্তি পরমাণু গড়িয়াছে অথবা পরমাণুতে রূপান্তরিত হইয়াছে সেই শক্তিতে ইহা বর্ত্তমান আছে। বৈদান্তিকের কাছে যাহা চিৎতপস বা চিৎশক্তি বা চিন্ময় সত্তাতে অনুস্যূত চিৎশক্তি, এ শক্তি স্বরূপতঃ তাহাই। এই শক্তিই আত্মপ্রকাশ করিতেছে উদ্ভিদের মধ্যে অবমানস বোধময় স্নায়বীয় শক্তি রূপে, আদিম প্রাণীর মধ্যে বাসনাবোধে এবং বাসনাময় ইচ্ছা রূপে, উর্দ্ধতর জীবের মধ্যে আত্ম সচেতন বোধ এবং শক্তি রূপে এবং প্রাণী শ্রেষ্ঠ মানুষের মধ্যে মানসিক জ্ঞান ও ইচ্ছারূপে। প্রাণ বিশ্ব-শক্তির একটা সোপানাবলি, যাহা আরোহণ করিতে করিতে নিশ্চেতনের ক্রমশঃ পূর্ণ চৈতন্যে রূপান্তর সাধিত হয়। ইহা চৈতন্যেরই একটী মধ্যবর্ত্তী শক্তি। প্রথমে জড়ে ইহা সুপ্ত এবং নিমজ্জিত, পরে নিজের শক্তির প্রবেগে তথা হইতে মুক্ত হইয়া অবমানস সত্তায় এবং অবশেষে তথা হইতে মুক্ত হইয়া, তাহার মধ্যে যে বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে মনঃশক্তির উন্মেষে তাহা ফুটিয়া উঠিতে পারে, এমন অবস্থায় পৌঁছে।

অন্য সমস্ত হেতু বাদ দিলেও, যদি আমরা পরিণামবাদের আলোকে, যাহা শুধু বাহিরে উন্মিষিত হইয়া উঠিতেছে প্রাণের সেই সমস্ত ধারা পর্য্যবেক্ষণ করি,

তাহা হইলে যুক্তি আমাদিগকে এই সিদ্ধান্তেই আনিয়া পৌছাইয়া দিবে। উদ্ভিদে প্রাণের গঠন পশু হইতে পৃথক হইলেও ইহা স্পষ্ট যে উভয়ত্র প্রাণশক্তি এক; উদ্ভিদেও আছে পশুর মত জন্ম, বৃদ্ধি এবং মৃত্যু; বীজ দ্বারা বংশ বিস্তার, ক্ষয়, রোগ বা অত্যাচারে মৃত্যু, বাহির হইতে উপাদান সংগ্রহ ও গ্রহণ করিয়া পুষ্ট হওয়া ও বাঁচিয়া থাকা; আলোক ও তাপের উপর নির্ভরশীলতা, প্রজনন শক্তি অথবা বন্ধ্যাত্ব; এমন কি নিদ্রা এবং জাগরণ, জীবনক্রিয়ার মধ্যে উত্তেজনা এবং অবসাদ, বাল্য যৌবন এবং বার্দ্ধক্যের ক্রমপরিণাম; তাহা ছাড়া উদ্ভিদের মধ্যে জীবনীশক্তির মুখ্য উপাদান থাকাতে তাহাই পশু জগতের স্বাভাবিক খাদ্য। ইহার পর যদি ইহা স্বীকার করি যে তাহার আছে স্নায়ু-মণ্ডলী, আছে আঘাতে সাড়া দেওয়ার সামর্থ্য, অথবা আছে অবমানস বা খাঁটি মনোময় বোধের একটা প্রাথমিক অবস্থা বা অন্তঃপ্রবাহ; তবে পশুর এবং উদ্ভিদের মধ্যে যে একই প্রাণ আছে এ বোধ স্পষ্টতর হয়। তথাপি অচেতন জড় হইতে পশু জীবনের মধ্যে প্রাণের যে পরিণাম হইতেছে উদ্ভিদ স্পষ্টতঃ তাহার মধ্যবর্ত্তী অবস্থা। প্রাণ যদি এমন একটা শক্তি হয় যাহা জড় হইতে উদ্ভূত হইয়া মনোরূপী শেষ পরিণতিতে পৌছিতে চাহিতেছে, তবে জড় ও মনের এই মধ্যবর্ত্তী অবস্থা থাকা ত স্বাভাবিক, এবং যদি তাহাই হয় তবে আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে প্রাণ অবচেতন অথবা অচেতন অবস্থায় জড়ের মধ্যে মগ্ন বা সুপ্ত হইয়াছিল; নতুবা কোথা হইতে তাহার আবির্ভাব হইল? জড়ের মধ্যে প্রাণের উদ্ভব ও পরিণতি হইতেছে স্বীকার করিলে তৎসঙ্গেই স্বীকার করিতে হয়, তৎপূর্ব্বে জড়ে প্রাণ সংবৃত ভাবে বর্ত্তমান ছিল, নতুবা বলিতে হয় এই নূতন সৃষ্টি একটা ইন্দ্রজালের মত ব্যাপার, যাহা প্রকৃতির মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে অথচ তাহার কোন কারণ নাই বা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। নূতন সৃষ্টিই যদি হয়, তবে হয় তাহা হইবে অসৎ বা শূন্য হইতে সৃষ্টি, না হয় কোন জড় প্রক্রিয়ার ফলে প্রাণ আসিয়াছে কিন্তু সে প্রক্রিয়ার মধ্যে এমন কিছু পাওয়া যায় না বা তন্মধ্যে সমজাতীয় এমন কোন উপাদান নাই, যাহাতে ইহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। তৃতীয় আর একটা অনুমান করা যাইতে পারে যে ইহা স্থূলজগতের উর্দ্ধে স্থিত কোন জড়াতীত লোক হইতে আসিয়াছে। খামখেয়ালি কল্পনা বলিয়া প্রথম দুইটী সিদ্ধান্তকে

আমরা ত্যাগ করিতে পারি। কিন্তু শেষ সিদ্ধান্তটী সম্ভব এবং আমাদের যুক্তি ইহাকে স্বীকার করিতে আপত্তি করেনা এবং সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতেও দেখা যায় যে, উপরিস্থিত প্রাণের কোন লোকের আবেশ বা প্রভাব জড়-জগতের প্রাণের উন্মেষে সহায়তা করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে জড় হইতে আত্ম এবং অপরিহার্য্য গতির মধ্য দিয়া প্রাণের উন্মেষ হইয়াছে, এমত খণ্ডিত হয় না। কারণ যদি জড়ের মধ্যে প্রাণলোক সৃষ্টিক্ষম অবস্থায় গুপ্তভাবে না থাকিত, তবে শুধু ঊর্দ্ধে এক প্রাণময় জগৎ বা প্রাণলোক থাকিলেও বা তথা হইতে তাহার প্রভাব নীচে নামিয়া আসিলেও, জড়ের মধ্যে প্রাণের উন্মেষ সম্ভব হইত না। বস্তুতঃ চিৎসত্তা তাহারই নানাস্তর বা শক্তির মধ্য দিয়া অবতরণ করিয়া তাহার সকল শক্তির (যাহার মধ্যে প্রাণশক্তিও আছে) সহিত জড়ের মধ্যে সংবৃত হইয়া পরে উন্মিষিত ও প্রকাশিত হইবার জন্য বর্ত্তমান আছে। জড়ের মধ্যে নিমজ্জিত প্রাণ যখন জৈবপ্রকৃতি বিশিষ্ট (organised) হইয়া উঠে নাই, সেই প্রাথমিক অবস্থায় তাহার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় কিনা, অথবা সংবৃত প্রাণ সম্পূর্ণ নিদ্রাচ্ছন্ন বলিয়া কোন চিহ্ন দেখা যায় না এসমস্ত মুখ্য কথা নহে। জড়ে যে শক্তি সংগ্রহ করে, আকার গড়িয়া তোলে এবং ভাঙ্গিয়া দেয় * সেই শক্তিই অন্য ভূমিতে গিয়া সেই প্রাণশক্তি রূপে দেখা দেয়, যাহা জন্ম, পুষ্টি ও মৃত্যুর মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। যেমন সে শক্তি অবচেতনের স্বপ্নসঞ্চরণের মধ্যে অজ্ঞাত-সারে বুদ্ধির কাজ করে, আবার তাহাই অন্য ভূমিতে গিয়া নিজেকে মনরূপে ফুটাইয়া তোলে। এ জড়শক্তির প্রকৃতি দেখিয়াই মনে হয় যে, মন এবং প্রাণের অনুন্মিষিত বীর্য্য নিজের মধ্যে ইহা ধারণ করিয়া রাখিয়াছে, যদিও তাহাদের বিশিষ্ট আকারে ও প্রকাশ ধারায় তাহারা এখনও প্রকাশ পায় নাই।

* জীবনে জন্ম, পুষ্টি এবং মৃত্যু বহিরঙ্গ ভাবে জড়ে সংগ্রহ, আকার গঠন, এবং বিচূর্ণন ক্রিয়ার সহিত এক হইলেও ভিতরের ক্রিয়া এবং অর্থে আরও গভীর। সূক্ষ্মদর্শীদের দেওয়া বিবরণ যদি সত্য হয় তবে চৈত্যপুরুষের জীবদেহ গ্রহণ ব্যাপারও বাহিরের দিকে একইরূপ; কারণ জন্মগ্রহণেচ্ছু আত্মা জন্মের সময় তাহার চারিদিকে মনময় প্রাণময় ও অন্নময় কোষের উপাদান সমূহ আকর্ষণ ও সমাহরণ করে, জীবনে এই সমস্ত আকারের পুষ্টিসাধন করে এবং চলিয়া যাওয়া বা মৃত্যুর সময় এসমস্ত উপাদান ত্যাগ করে এবং ভাঙ্গিয়া দেয় এবং নিজের অন্তঃশক্তিসমূহ নিজের মধ্যে গুটাইয়া আনে, আবার পুনর্জন্মে এই ক্রিয়াধারার পুনরাবৃত্তি চলে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে পরমাণু হইতে মানুষ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র একই প্রাণের প্রকাশ। সত্তার যে উপাদান এবং ক্রিয়া পরমাণুর মধ্যে অবচেতন ভাবে অবস্থিত, তাহাই পশুর চেতনায় মুক্তি পাইয়াছে, প্রাণ এই পরিণতিতে একটা মধ্যবর্ত্তী অবস্থা। বস্তুতঃ প্রাণ জড়ের মধ্যে অবস্থিত হইয়া জড়ের উপর অবচেতন ভাবে যে ক্রিয়া করিতেছে, তাহা চিৎশক্তিরই বিশ্বব্যাপী খেলা ছাড়া আর কিছু না। প্রাণক্রিয়াই আকার বা দেহ গড়িয়া তোলে, তাহাদিগকে রক্ষা ও পুষ্টি করে এবং ধ্বংস করিয়া আবার গড়িয়া তোলে এবং স্নায়ু শক্তির খেলা অর্থাৎ উত্তেজক বা সঙ্কোচন শক্তির আদান প্রদান দ্বারা, দেহের মধ্যে সচেতন বোধ জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করে। এই ক্রিয়াধারার তিনটী অবস্থা আছে; নিম্নতম অবস্থায় ইহার স্পন্দন জড়ের নিদ্রাতে অভিভূত, একেবারে অবচেতন যেন মনে হয় সম্পূর্ণ যান্ত্রিক; মধ্য অবস্থায় ইহা সাড়া দিতে সমর্থ হইয়াছে কিন্তু তখনও অবমানস ভাবে, আমরা যাহাকে চেতনা বলিয়া জানি তাহার উপকূলে যেন পৌঁছিয়াছে। উচ্চতম অবস্থায় যাহাতে সমস্ত বোধ মননের ভাষায় সে বুঝিতে পারে, প্রাণ এমন ভাবে সচেতন মননশক্তি গড়িয়া তোলে এবং এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধির বিকাশের ভিত্তি হইয়া দাঁড়ায়। এই মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় আমরা জড় ও মন হইতে বিবিক্ত প্রাণের ধারণা লাভ করি, কিন্তু বস্তুতঃ সকল অবস্থার মধ্যেই ইহা এক, প্রাণ সর্ব্বদাই মন ও জড়ের মধ্যে সংযোগ সাধনের জন্য একটী মধ্যাবস্থা, সর্ব্বত্রই প্রাণ জড়ের উপাদানভূত এবং মন দ্বারা পরিপূরিত। ইহা চিৎ-শক্তির একটা ক্রিয়া বটে কিন্তু যাহা কেবলমাত্র দ্রব্যের রূপ গঠন ইহা তাহা নহে, অথবা কেবল দ্রব্য এবং আকার যাহার জ্ঞানের বিষয় সে মনের ক্রিয়াও নহে। বরং বলা যায় যে ইহা চিৎসত্তার তেজোময় ক্রিয়াশীল অবস্থা, যাহা দ্রব্যের রূপ গঠনের কারণ ও আধার এবং মধ্যবর্ত্তী বা অবান্তর শক্তিরূপে সচেতন মানসজ্ঞানের উৎপত্তি ও আশ্রয়স্থান। চিৎ সত্তার ক্রিয়াশীল এই মধ্যবর্ত্তী শক্তিরূপে প্রাণ, বোধের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়াতে, সত্তার সেই সৃষ্টিশক্তিকে মুক্তি দেয়, যাহা নিজসত্তার মধ্যে নিমজ্জিত ছিল এবং অবচেতন বা নিশ্চেতন রূপে ক্রিয়া করিতেছিল। প্রজ্ঞানচৈতন্যের যে ক্রিয়াকে আমরা মন নামে অভিহিত করি, প্রাণ তাহাকে জড়ের বন্ধন হইতে মুক্তি দেয় এবং

ধারণ করিয়া থাকে এবং সেই মনের মধ্যে এমন এক ক্রিয়াশীলতার বেগ সঞ্চার করে, যে জন্য মন নিজের নানা বৃত্তি এবং প্রাণ ও জড়ের নানারূপের উপর ক্রিয়া করিতে পারে; প্রাণ জড় এবং মনের মধ্যে সেতুস্থানীয় হইয়া মধ্যবর্ত্তী শক্তিরূপে উভয়ের মধ্যে ভাব ও ক্রিয়ার বিনিময় বা যোগাযোগকে বজায় রাখে। প্রাণই এই যোগাযোগের উপায় স্বরূপ স্নায়বিক শক্তির স্পন্দময় প্রবাহ সৃষ্টি করে, যে প্রবাহের ফলে জড় বা বাহ্যরূপ হইতে শক্তি গিয়া ইন্দ্রিয় বোধ জাগায় এবং মনের বিপরিণাম ঘটায়, আবার মনের শক্তি ইচ্ছারূপে রূপান্তরিত হইয়া স্নায়ুর সাহায্যেই গিয়া জড়ের পরিবর্ত্তন সাধন করে। এই জন্য যখন আমরা প্রাণের কথা বলি তখন সাধারণতঃ আমরা এই স্নায়বিক শক্তিকেই বুঝি; ভারতীয় দর্শনে ইহাকেই প্রাণ বা প্রাণশক্তি বলিয়াছে। কিন্তু প্রাণ স্নায়বিক শক্তির রূপগ্রহণ করে কেবল প্রাণীর ক্ষেত্রে; একই প্রাণশক্তি পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া সকল রূপে বর্ত্তমান আছে, কেননা সর্ব্বত্র ইহা মূলতঃ এক এবং সর্ব্বত্রই ইহা চিৎশক্তির একই ক্রিয়া হইতে জাত, একই শক্তি নিজের সমস্ত বস্তুরূপকে ধারণ করিয়া আছে এবং তাহাদের বিপরিণাম সাধন করিতেছে কিন্তু প্রথমে সে শক্তিতে বোধ ও মন গোপন ভাবে ক্রিয়াশীল, রূপের মধ্যে সংবৃত, উন্মিষিত হইয়া উঠিবার জন্য প্রস্তুত হয়, অবশেষে সংবৃতি হইতে মুক্তিলাভ করে। সর্ব্বব্যাপী এক মহাপ্রাণ জড়বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছে এবং তাহার মধ্যে বাস করিতেছে—ইহাই তাহার পূর্ণ অর্থ।

বিংশ অধ্যায়

মৃত্যু, বাসনা এবং অসামর্থ্য

প্রথমে সমস্তই মৃত্যুরূপী বুভুক্ষা দ্বারা আবৃত ছিল; সে নিজের জন্য মন সৃষ্টি করিল যাহাতে সে আত্মাকে পাইতে পারে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ (১।২।১)

এই শক্তিকে মর্ত্ত্য সত্তা আবিষ্কার করিল—যাবতীয় পদার্থকে ধারণ করিবে সে, তাই বহু বিচিত্র বাসনা তার মধ্যে; সকল অন্নের স্বাদ গ্রহণ করে সে এবং জীবের জন্য গৃহপ্রস্তুত করে।

ঋগ্বেদ (৫।৭।৬)

পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে জড়সত্তার দিক হইতে আমরা প্রাণকে দেখিয়াছি; কি করিয়া জড়ের মধ্যে প্রাণ তত্ত্বের আবির্ভাব হইল এবং কি ভাবে তাহার ক্রিয়া চলিল তাহা বুঝিতে চাহিয়াছি; সে জন্য পরিণামশীল পার্থিব সত্তা হইতে সংগৃহীত তথ্য লইয়া বিচার করিয়াছি। কিন্তু একথা স্পষ্ট যে ভাবে প্রাণ আবির্ভূত হউক না কেন, যে ভাবে এবং যে কোন পরিবেশে তাহার ক্রিয়া চলুক না কেন, তত্ত্বতঃ সর্ব্বত্র তাহা একই হইবে। প্রাণ বিশ্বব্যাপিনী সেই শক্তি, যাহা বিশ্বের রূপরাজিকে সৃষ্টি, বীর্য্য দ্বারা পুষ্টি ও রক্ষণ, পরিবর্ত্তন ও রূপান্তর সাধন করিতেছে, এমন কি তাহাদিগকে ভাঙ্গিয়া দিতেছে আবার নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতেছে, ব্যক্ত বা অব্যক্ত যে ভাবেই ক্রিয়া করুক ইহার মূলপ্রকৃতিতে ইহা চৈতন্যময়ী শক্তি, ইহার জন্যই রূপের সঙ্গে রূপের খেলা এবং তাহাদের পরস্পর বিনিময় চলিতেছে। যে জড়জগতে আমরা বাস করি সেখানে মন অবচেতন ভাবে প্রাণের মধ্যে সংবৃত হইয়া আছে, ঠিক তেমনি ভাবে অতিমানস সংবৃত হইয়া অবচেতনরূপে আছে মনের মধ্যে, আবার যাহার মধ্যে সংবৃত এবং অবচেতন মন রহিয়াছে সেই প্রাণ নিজে জড়ের মধ্যে সংবৃত হইয়া আছে। সুতরাং জড়ই এখানে ভিত্তিভূমি মনে

হয়, যেখান হইতে সব কিছুর আরম্ভ, উপনিষদের ভাষায় তাই বলা হইয়াছে 'পৃথিবী পাজস্যম' পৃথিবী আমাদের পাদপীঠ বা ভিত্তি। জড়বিশ্ব শক্তিপরিপূরিত যে পরমাণু দ্বারা গঠিত তাহার মধ্যেই বাসনা, ইচ্ছা ও বুদ্ধির উপাদান অগঠিত ও অবচেতন ভাবে অবস্থিত আছে। এই জড় হইতে প্রাণ বাহিরে প্রকাশিত হয় এবং প্রাণ, যে মন তাহার অন্তর্নিহিত ছিল, তাহাকে জীবন্ত দেহের সাহায্যে মুক্তি দেয় বা বাহিরে প্রকাশ করে; আবার মনকে তাহার ক্রিয়ার মধ্যে গুপ্ত-ভাবে অবস্থিত অতিমানসকে মুক্তি দিতে হইবে। এ জগতে প্রথমে যেমন অব-চেতন যেখানে মন তেমন নয়—পরন্তু প্রারম্ভেই পরিস্ফুট এবং যেখানে মন সচেতন ভাবে তাহার অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক শক্তিকে ব্যবহার করিয়া, সকল পদার্থের মূলরূপ ফুটাইতে পারে, এমন এক জগৎ আমরা কল্পনা করিতে পারি। সেরূপ জগতের ক্রিয়াধারা আমাদের এ জগৎ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের হইলেও তথায় মন ও রূপের মধ্যবর্ত্তী রূপে প্রাণই ক্রিয়াশক্তির বাহন হইবে। যদিও ক্রিয়াধারা সম্পূর্ণ অন্যরূপ হইবে তথাপি মূল পদার্থ বা শক্তি একই থাকিবে।

তাহা হইলে ইহা এখনই বুঝা যাইতেছে যে যেমন মন অতিমানসেরই শেষ ক্রিয়াফল বা অন্তিম বিভূতি, তদ্রূপ প্রাণ চিৎশক্তির বা চিৎতপসের শেষ ক্রিয়া ফল, সদ্ভূতবিজ্ঞানই চিৎশক্তির প্রতিভূরূপে সৃষ্টি এবং বিশিষ্টরূপের প্রযোজক। শক্তিস্বরূপ চৈতন্যই যিনি সৎস্বরূপ তাহার নিজপ্রকৃতি, এই চিন্ময় সত্তা নিজেকে যখন প্রকাশ করে সৃষ্টিশীল জ্ঞান-সংকল্প বা সজ্ঞান ইচ্ছাশক্তিরূপে, তখন তাহাকেই সদ্ভূতবিজ্ঞান বা অতিমানস বলা হয়। অর্থাৎ চিৎশক্তি যখন ঋত সুষমার ছন্দে অখণ্ড সত্তার নানারূপ সৃষ্টির জন্য ক্রিয়াশীল, তখন তাহা হয় অতিমানস জ্ঞানসঙ্কল্প, আর সেই ছন্দে যাহা প্রকাশ হয় তাহাকে আমরা জগৎ বা বিশ্ব নামে আখ্যাত করি। তেমনি মন ও প্রাণ সেই চিৎশক্তি ও সেই জ্ঞানসঙ্কল্পের রূপায়ণ—এ রূপায়ণের উদ্দেশ্য এক প্রকার সীমা, বিরোধ ও বিনিময়েব মধ্যেই বিশিষ্ট ব্যষ্টিরূপের সৃষ্টি ও রক্ষণ; এই সীমা, বিরোধ এবং বিনিময়ের মধ্যেই প্রত্যেক ব্যষ্টিজীব নিজের মন ও প্রাণ এমনভাবে ফুটাইয়া তোলে যেন তাহারা অপর সকল মন প্রাণ হইতে ভিন্ন, যদিও বস্তুতঃ তাহারা কখনই বিভিন্ন নয় পরন্তু একই সত্যের বিভিন্ন আকারের মধ্যে স্থিত এক আত্মা, মন বা প্রাণের খেলা। অন্য ভাষায় বলা যায় যে, সর্ব্ব সংজ্ঞান এবং প্রজ্ঞান যাহার স্বরূপ সেই অতিমানসের ব্যষ্টি ভাব প্রকাশের

চরমলীলায় মন দেখা দিয়াছে, মন সেই ক্রিয়াধারা, যাহাকে অবলম্বন করিয়া চৈতন্ত ব্যষ্টি ভাব যুক্ত হইয়া, প্রত্যেক রূপের যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিশ্বের মধ্যে যে সকল সম্বন্ধ জাত হইয়াছে সেই সমস্ত সম্বন্ধ লইয়া ক্রিয়া করে; তেমনি চিন্ময় সত্তার যে শক্তি বিশ্বব্যাপী অতিমানসের সর্ব্বধারক এবং সর্ব্বসৃষ্টিকারক ইচ্ছাশক্তির মধ্যে নিত্য ক্রিয়াশীল তাহার একটা শেষ ক্রিয়াই প্রাণ, যাহাকে অবলম্বন করিয়া সেই শক্তি ব্যষ্টি রূপরাজিকে বীর্য্যবান করিয়া তোলে, তাহাদের রক্ষণ ও পোষণ, গঠন ও পুনর্গঠন করে। এই শক্তির ক্রিয়াকেই ভিত্তি করিয়া এইভাবে রূপায়িত ব্যষ্টিচেতনার সকল ক্রিয়া পরিচালিত হয়। ডাইনামো (dynamo) নামক বিদ্যুতোৎপাদক যন্ত্র হইতে যেমন নিয়ত বিদ্যুৎ-প্রবাহ উৎপাদিত হয়, তেমনি ব্রহ্মের তপোবীর্য্য প্রাণরূপে সদাই রূপের মধ্যে আত্ম-প্রকাশ করে এবং কেবল চতুষ্পার্শস্থিত রূপরাজির উপর বহির্গমনশীল বীর্য্যধারা-রূপে প্রবাহিত হইয়া যে তাহার খেলা শেষ হয় তাহা নহে, পরন্তু চারিদিকের সমস্ত জীবন হইতে বা বিশ্বের সমস্ত পরিবেশ হইতে তাহার দিকে অন্তরাভিমুখী যে বীর্য্যধারা বাহির হইতে তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হয়, তাহাকেও সে গ্রহণ করে।

এইভাবে দেখিলে জড়ের উপর মনের ক্রিয়ার উপযোগী এবং জড় ও মনের মধ্যবর্ত্তী প্রাণকে চিৎশক্তির একটা রূপ মনে হয়; যখন মন শুদ্ধভাবের সঙ্গে সম্বদ্ধ না থাকিয়া সৃষ্টিক্রিয়ার মধ্য দিয়া পদার্থের শক্তি এবং রূপের সহিত যুক্ত হয়, তখন এক হিসাবে প্রাণকে মনের শক্তি বা বীর্য্যের একটা বিভাব বলা যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বলিতে হইবে যে যেমন মন একটা বিচ্ছিন্ন সত্তা নয় পরন্তু বস্তুতঃ সমগ্র অতিমানস তাহার পশ্চাতে অবস্থিত এবং অতিমানসই তাহার ব্যষ্টিভাবের শেষ ক্রিয়াফল রূপে মনে পরিণত হইয়াছে, তদ্রূপ প্রাণ ও কোন পৃথক সত্তা বা শক্তি নহে কিন্তু তাহার প্রত্যেক ক্রিয়ার পশ্চাতে সমগ্র চিৎশক্তি বিদ্যমান, বস্তুতঃ একমাত্র চিৎশক্তিই বর্ত্তমান এবং সমস্ত সৃষ্ট পদার্থে তাহারই ক্রিয়া চলিতেছে, দেহ ও মনের মধ্যস্থানীয় প্রাণ ইহার শেষ ক্রিয়া বা অন্তিম বিভূতি মাত্র। সুতরাং প্রাণের সম্বন্ধে আমরা যাহাই বলি না কেন তাহাতে এই পরতন্ত্রতা হইতে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য জাত হয়, প্রাণ তাহার অধীন থাকিবেই। প্রাণ যাহার বহিরঙ্গ বিভাব এবং সাধনযন্ত্র এবং প্রকৃতপক্ষে যাহা প্রাণের মধ্য দিয়া ক্রিয়া করিতেছে সেই চিৎশক্তির সম্বন্ধে আমরা যতক্ষণ সজাগ এবং সচেতন না হই, ততক্ষণ পর্য্যন্ত

প্রাণের প্রকৃতি এবং ক্রিয়াপদ্ধতি আমরা খাঁটিভাবে জানিতে পারি না। কেবল তখনই আমরা ব্রহ্মের ব্যষ্টিআত্মা এবং তাহার মনোময় ও অন্নময় যন্ত্ররূপে জীবনের মধ্যে ভগবদিচ্ছা অনুভব করিতে এবং সজ্ঞানে সে ইচ্ছা পালন করিতে পারি। কেবল তখনই প্রাণ ও মনের নিকট অজ্ঞানের বক্র বিকৃতি হ্রাস পাইতে থাকে এবং আমাদের অথবা সর্ব্বপদার্থের মধ্যে সত্যের যে সরল পথ ও গতি আছে সেই পথে, সেই গতিতে ক্রমশঃ দ্রুততর অগ্রসর হইতে পারি। অবিদ্যার ক্রিয়া দ্বারা যে মন অতিমানস হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে এবং কেবল প্রাণ ও জড়কে মননশীল করিবার কাজে তদ্গত হইয়া ডুবিয়া আছে, তাহাকে যেমন সচেতন ভাবে অতি-মানসের সঙ্গে পুনরায় যুক্ত হইতে হইবে, তদ্রূপ যে প্রাণ শুধু বাঁচিয়া থাকিবার কাজে অভিনিবিষ্ট হইয়া ডুবিয়া রহিয়াছে, চিৎশক্তি তাহার মধ্যে কি উদ্দেশ্য কোন্ তাৎপর্য্য বহন করিয়া কাজ করিতেছে তাহা যে জানে না, কিন্তু তবু অন্ধকার এবং অজ্ঞানতার মধ্যে অন্ধভাবে সেই উদ্দেশ্য সাধনে রত আছে, সেই প্রাণকে সেই চিৎশক্তি সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন হইতে হইবে; যে জ্ঞান, যে শক্তি ও যে আনন্দ নিজেকে নিজে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে সক্ষম সেই জ্ঞান শক্তি ও আনন্দ পূর্ণ সচেতনভাবে গ্রহণ করিয়া প্রাণকে নিজে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে হইবে; এই অবস্থা, এই মুক্তিলাভ সে একদিন করিবেই।

বস্তুতঃ অন্ধকারময় মনের ভেদকারী ক্রিয়ার অধীন বলিয়া প্রাণ নিজেও বিচ্ছিন্ন এবং তমোগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং বদ্ধ ও সীমিত মন যাহাদের কারণ ও জনক সেই মৃত্যু, সীমাবদ্ধতা, দুর্ব্বলতা, বেদনা এবং অন্ধপ্রকৃতির অধীনতা ও লাঞ্ছনা প্রাণকে ভোগ করিতে হইতেছে। আমরা দেখিয়াছি এই বিকৃতির মূলকারণ নিজের অজ্ঞানতায় বদ্ধ ব্যষ্টি জীবের নিজেকে সীমার মধ্যে আবদ্ধ করা, কারণ সে একান্তভাবে কেন্দ্রীভূত হইয়া নিজেকে অন্য সকল হইতে পৃথক, আপনাতে আপনি অবস্থিত এক ব্যষ্টিআত্মা বলিয়া মনে করে এবং তাহার ব্যষ্টি-চেতনায় তাহার ব্যক্তিগত জ্ঞান, ইচ্ছা, শক্তি ও সম্ভোগে তাহার সীমিত সত্তায় সমগ্র বিশ্বলীলা যে ভাবে দেখা দেয় তাহাই মাত্র সে জানে। সে ভুলিয়া যায় যে সে নিজে পরম একেরই এক সচেতন রূপ, তাই বিশ্বের সকল চেতনা, সকল জ্ঞান, সকল ইচ্ছা, সকল ভোগ, সকল সত্তাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার নিজেরই পরম-সত্তা যে বিদ্যমান তাহা সে ভাবিতে পারে না। মনের কারাগারে বদ্ধ এই আত্মার

শাসন মানিয়া আমাদের মধ্যস্থিত বিশ্বপ্রাণও ব্যষ্টিক্রিয়ার শৃঙ্খলে নিজে বাঁধা পড়ে। সে তখন বিবিক্ত প্রাণরূপে অবস্থিত হয় এবং সীমাবদ্ধ অপ্রচুর সামর্থ্য লইয়া ক্রিয়া করে, বিশ্বব্যাপী সমগ্র প্রাণের আঘাত ও চাপ তখন তাহাকে গ্রহণ ও সহ্য করিতে হয়; তাহাদিগকে স্বাভাবিক ও স্বাধীনভাবে নিজের বলিয়া মনে করিতে পারে না। বিশ্বে যে শক্তির মধ্যে সতত অন্যোন্যবিনিময় চলিতেছে, দীন সীমাবদ্ধ এবং ব্যষ্টিসত্তারূপে প্রাণ যখন তাহার মধ্যে পড়ে, তখন সেই শক্তির খেলার প্রচণ্ড শাসন অসহায়ভাবে তাহাকে মানিয়া ও সহিয়া চলিতে হয় এবং যাহা কিছু তাহাকে আক্রমণ, ভক্ষণ, ভোগ, ব্যবহার ও পরিচালনা করে তাহার অভিঘাতে প্রথমতঃ শুধু যন্ত্রের মত সাড়া দেয়। কিন্তু চৈতন্যের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি-সত্তা যখন তাহার সংবৃতির অন্ধকারময় জড়ত্ব হইতে বিকাশ পাইতে থাকে, তখন তাহার নিজের মধ্যে যে শক্তি আছে তাহার অস্পষ্ট বোধ জাগিয়া উঠে এবং প্রথমতঃ স্নায়ু এবং তারপর মন দিয়া বিশ্বলীলাকে আপন বশে আনিতে, ব্যবহার ও সম্ভোগ করিতে চেষ্টা করে। নিজের মধ্যস্থিত শক্তির এই জাগরণে আত্মাও ক্রমশঃ জাগিয়া উঠে। কারণ প্রাণই শক্তি, শক্তিই বীর্য্য এবং বীর্য্যই ইচ্ছা এবং ইচ্ছা ঈশ্বরচৈতন্যের ক্রিয়ার ফল। ব্যষ্টিজীবের জীবন তাহার নিজের অন্তরের গভীরে ক্রমশঃ বেশী করিয়া অনুভব করিতে থাকে যে, সে নিজেও স্বরূপতঃ বিশ্বের সচ্চিদানন্দের ইচ্ছাশক্তি এবং তাহার নিজের ব্যক্তিজগৎকে নিজ শাসনে আনিবার অভীপ্সা জাগিয়া উঠে। নিজের শক্তিকে নিজে অনুভব করা, নিজের জগৎকে জানা এবং বশে আনার ক্রমবর্দ্ধমান আকুতি ব্যষ্টি জীবনে দেখা দেয়। বিশ্বের মধ্যে ভগবান যে ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করিতে চান এই আকুতিই তাহার মর্ম্ম-পরিচয়।

কিন্তু যদিও প্রাণই শক্তি এবং ব্যষ্টিপ্রাণের পুষ্টিতে ব্যষ্টিব্যক্তির শক্তিই পুষ্ট হয় তথাপি ব্যষ্টি জীবন ও শক্তি ভেদভাবাপন্ন বলিয়া ব্যষ্টিজীব কখনও তাহার জগতের উপর প্রকৃত প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারে না। সেইরূপ প্রভুত্বের অর্থই সর্ব্বশক্তির ঈশ্বর হওয়া; কিন্তু ভেদভাবাপন্ন ব্যষ্টিচৈতন্যের সর্ব্বশক্তির অধীশ্বর হওয়া অসম্ভব। যিনি সর্ব্বসঙ্কল্প ও সর্ব্বইচ্ছাস্বরূপ শুধু তাহার পক্ষেই ইহা সম্ভব; ব্যষ্টিব্যক্তির পক্ষে যদি তাহা সম্ভব হয় তবে তজ্জন্য তাহাকে সর্ব্ব-সঙ্কল্প এবং সুতরাং সর্ব্বশক্তির সহিত পুনরায় এক হইতে হইবে। নতুবা

ব্যষ্টিরূপে অবস্থিত ব্যষ্টিপ্রাণ তাহার সীমার তিনটী চিহ্ন, মৃত্যু, বাসনা এবং অসামর্থ্যের অধীন চিরকাল থাকিবেই।

তাহার আপন সত্তার স্বভাবের বশে এবং বিশ্বে যে সর্ব্বশক্তি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহার সহিত সম্বন্ধের নিয়মে ব্যষ্টিপ্রাণ মৃত্যুকবলিত হয়। কারণ ব্যষ্টি প্রাণে বিশ্বশক্তির একটী বিশেষ ধারাই প্রকাশ পায়, কোটি কোটি রূপের মধ্যে একটী রূপকে অবলম্বন করিয়া এ ধারা গঠিত, রক্ষিত, পুষ্ট ও বীর্য্যবন্ত হয়; আবার যখন ইহার বিশেষ কার্য্য শেষ হয় তখন ইহা ধ্বংস হইয়া যায়; এইভাবে প্রতিরূপ তাহার বিশিষ্ট দেশ কাল ও অধিকার অনুসারে সমস্ত বিশ্বলীলার কাজে লাগে; দেহমধ্যস্থ প্রাণের বীর্য্যের উপর তাহার বাহিরে অবস্থিত সমস্ত বিশ্বব্যাপী বীর্য্যের অভিঘাত ও আক্রমণ আসিয়া পড়িতেছে, প্রাণ এ সমস্ত সতত নিজের মধ্যে টানিয়া যেমন গ্রাস করিতেছে তেমনি সেও নিয়ত ইহাদের দ্বারা ভক্ষিত হইতেছে। উপনিষদের ভাষায় জড় মাত্রের নাম 'অন্ন', জড়জগতের বিধানই এই যে 'অন্নভোক্তা অন্নাদ নিজেই আবার অন্ন'। দেহের মধ্যে যে প্রাণ সংগঠিত, বাহিরে অবস্থিত প্রাণের আক্রমণে তাহার বিচূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা সর্ব্বদা রহিয়াছে, আহারসামর্থ্য যদি তাহার অপ্রচুর হয় বা যথোপযুক্ত আহার যদি না পায় অথবা তাহার একদিকে নিজের আহারসামর্থ্য এবং অন্যদিকে অপর প্রাণকে অন্ন যোগাইবার প্রয়োজনীয়তা এবং সামর্থ্য, এদুয়ের মধ্যে যথাযথ সাম্যের যদি অভাব ঘটে তবে সে দেহাধিষ্ঠিত প্রাণ আর আত্মরক্ষা করিতে পারে না এবং সে ভক্ষিত হয়, অথবা নিজেকে পুনরুজ্জীবিত করিবার শক্তিহারা হইয়া পড়ে, সুতরাং ক্ষয় হইয়া যায় বা ভাঙ্গিয়া পড়ে। পুনর্জ্জীবনের জন্য, পুনরায় দেহ গঠনের জন্য মৃত্যুরূপ ক্রিয়াধারার মধ্য দিয়া তাহাকে যাইতে হয়।

শুধু তাহাই নয়, আবার উপনিষদের ভাষায় বলা যায় 'প্রাণশক্তি যেমন দেহের অন্ন, তেমনি দেহও প্রাণশক্তির অন্ন'; অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যে প্রাণশক্তি রূপের গঠন, রক্ষণ এবং নবায়ণের জন্য উপাদান যোগায় বা সংগ্রহ করিয়া আনে, তাহাই আবার সঙ্গে সঙ্গে এই ভাবে যাহা গড়িয়া তোলে এবং রক্ষা করে তাহার অনেকখানি খরচ করিয়া ফেলে। এই দুই ক্রিয়াধারার মধ্যে সাম্যের যদি ব্যাঘাত বা ন্যূনতা ঘটে অথবা প্রাণশক্তির বিভিন্ন ধারার মধ্যে সামঞ্জস্য যদি নষ্ট হয়, তবে রোগ এবং ক্ষয় দেখা দেয় এবং ভাঙ্গনক্রিয়া আরম্ভ

হয়। সচেতনভাবে কর্ত্তৃত্ব স্থাপনের জন্য প্রচেষ্টা এমন কি মনের পুষ্টিসাধনও প্রাণের ধারণ ও পোষণকে আরও শক্ত করিয়া তোলে। কারণ ইহাতে রূপের উপর প্রাণশক্তিপ্রয়োগের দাবি বাড়িয়া যায়, এ দাবির পরিমাণ আধারে প্রথমে যে সঞ্চয় লইয়া প্রাণ চলিতেছিল তাহার চেয়ে বেশী হইয়া পড়ে, এবং দাবি ও তাহা মিটাইবার উপায়ের মধ্যে যে প্রাথমিক সাম্য ছিল তাহা নষ্ট হয় এবং নূতন অবস্থার সাম্য স্থাপিত হওয়ার পূর্ব্বে নানা গোলযোগ আসিয়া পড়ে, যাহা সামঞ্জস্যের এবং দীর্ঘকাল প্রাণ ধারণের শত্রুরূপে ক্রিয়া করে। তাহা ছাড়া কর্ত্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টার ফলে বহুশক্তিযুক্ত তাহার পরিবেশের মধ্যে সে চেষ্টার অনুপাতানুযায়ী একটা প্রতিক্রিয়া সর্ব্বদা জাগে; কারণ তথায় যে সমস্ত শক্তি আছে তাহারাও পূর্ণতা লাভের অভিলাষী, তাই যাহা তাহাদের উপর প্রভুত্ব করিতে চায় তাহার প্রতি অসহিষ্ণু হইয়া উঠে, তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা এবং তাহাকে আক্রমণ করে। সেখানেও সাম্য নষ্ট এবং তুমুলসংগ্রাম উপস্থিত হয়; প্রভুত্বপ্রয়াসী প্রাণ যতই শক্তিশালী হউক না কেন, যদি সে অসীম না হয় অথবা বাহিরের পরিবেশের সঙ্গে নূতন ভাবে সামঞ্জস্য ও সমন্বয় সাধন করিতে না পারে, তবে সে সর্ব্বদা বাধা দিতে ও জয়লাভ করিতে সক্ষম হয় না, পরন্তু এমন দিন আসে যখন সে পরাভূত হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে।

কিন্তু যে সমস্ত প্রয়োজনের কথা বলা হইয়াছে, তাহা ছাড়া দেহগত প্রাণের প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহার একটা মূল প্রয়োজন আছে—সে প্রয়োজন সান্তের ভূমিকায় সে চায় অনন্তের অভিজ্ঞতা বা আস্বাদন; এবং যেহেতু যে দেহ সে আস্বাদনের ভিত্তি তাহার গঠনপদ্ধতিই এমন যে তাহা সে অভিজ্ঞতাকে সীমিত করিয়া তোলে, সুতরাং দেহকে ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া তোলা ভিন্ন সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোন উপায় থাকে না। কারণ আত্মা এক বিশেষ ক্ষণ এবং ক্ষেত্রে নিজেকে কেন্দ্রীভূত করিয়া দেখিতে গিয়া যখন সীমার বাঁধনে বাঁধা পড়িয়াছে, তখন পুনরায় অনন্তকে খুঁজিতে গিয়া তাহাকে পরম্পরার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, এই ভাবে সে সময়-অভিজ্ঞতার একটি ভাণ্ডার গড়িয়া তোলে, ইহাকে সে অতীত বলে, কালের মধ্যে বিচিত্র ক্ষেত্র, বিচিত্র অভিজ্ঞতা বা বিচিত্র জীবন পরম্পরার মধ্য দিয়া চলিয়া তাহাকে

জ্ঞান, শক্তি, ভোগ বা আনন্দের সঞ্চয় পর পর যোগ করিয়া লাভ করিতে হয়। এই সমস্ত অতীতের উপার্জ্জন সে অবচেতন বা অতিচেতন স্মৃতির ভাণ্ডারে জমা করিয়া রাখে। এই ধারায় চলিতে গেলে দেহের পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে; এবং যে আত্মা দেহে সংবৃত আছে তাহার পক্ষে দেহের পরিবর্ত্তন অর্থই জড়ের মধ্যে যে বিশ্বপ্রাণ অনুস্যূত রহিয়াছে তাহার বিধান এবং অলঙ্ঘ্য অনুশাসন অনুসারে দেহের নাশ; বিশ্বপ্রাণ যেমন এক দিকে দেহের উপাদান সরবরাহ করে তেমনি অন্য দিকে তাহা ফিরিয়া পাইবার দাবি করে, তাহারই বিধানানুসারে যে জগৎ পরস্পরের ক্ষণ ক্ষেত্র, সেখানে দেহগত প্রাণকে আঘাত পাইয়া এবং আঘাত দিয়া এবং লড়াই করিয়া বাঁচিবার জন্য সতত চেষ্টা করিতে হয়। ইহা হইতেই আসে মৃত্যুর বিধান।

এইখানেই মৃত্যুর প্রয়োজন এবং সমর্থন পাওয়া যায়, মৃত্যু প্রাণের অস্বীকৃতি নহে, প্রাণেরই একটা ক্রিয়াপ্রণালী; মৃত্যুর প্রয়োজন আছে, কেননা সান্ত জীবদেহ যে একমাত্র অমরত্ব লাভ করিবার আশা করিতে পারে তাহা হইল রূপের নিরন্তর পরিবর্ত্তন; আর সজীব দেহে সংবৃত সান্ত মন যে একমাত্র অনন্তকে পাইতে পারে তাহা হইল তাহার অভিজ্ঞতার নিরন্তর পরিবর্ত্তন। এক জীবনের জন্ম এবং মৃত্যুর ভিতর যে এক ভঙ্গীতে গঠিত দেহ, শুধু তাহার নিরন্তর পরিবর্ত্তন যথেষ্ট পরিবর্ত্তন নয়, কেননা মূল রূপভঙ্গীর পরিবর্ত্তন না হইলে এবং দেশ কাল এবং পরিবেশের নূতন নূতন ঘটনার মধ্যে, নূতন নূতন দেহের মধ্যে সক্রিয় হইতে না পারিলে মনের পক্ষে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ, দেশ ও কালের ক্ষেত্র মধ্যে স্বভাবতঃ ঘটিতে বাধ্য, তাহা সাধিত হইতে পারে না। এই জন্যই দেহ নাশ বা মৃত্যু হয়, এই জন্যই প্রাণ প্রাণকে ভক্ষণ করে; কিন্তু যাহা এই প্রয়োজনীয় মঙ্গলময় পরিবর্ত্তন সাধন করে আমাদের নিকট তাহা অনাত্ম-সত্তা বলিয়া বোধ হয়; আমাদের চোখে পড়ে শুধু দুর্ব্বার নিয়তি, আমাদের পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যহীনতা এবং ইহার সঙ্গে বিজড়িত প্রবল দ্বন্দ্ব এবং মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা; তাই এমন শিবময় বিধান মরণধর্ম্মী আমাদের মনের কাছে অবাঞ্ছিত একটা বিভীষিকা হইয়া দাঁড়ায়। মৃত্যু যে ভক্ষণ করে, ধ্বংস ও চূর্ণ করে, আমাদিগকে এখান হইতে ছিনাইয়া লইয়া যায়, ইহার জন্যই মৃত্যু আমাদের কাছে এত জ্বালাময়। এমন কি মৃত্যুর পরে লোকান্তরে আমরা

বাঁচিয়া থাকিব এবিশ্বাস এবং আশাও এ দুঃখ পূর্ণরূপে বিলোপ করিতে পারে না।

আমরা দেখিয়াছি জড়ের মধ্যে প্রাণের প্রথম বিধান পরস্পরকে ভক্ষণ এবং মৃত্যু এই প্রয়োজনের সাধন। উপনিষদ বলিয়াছেন যে "অশনায়া মৃত্যুঃ" প্রাণ ,ক্ষুধারূপী মৃত্যু এবং মৃত্যুরূপী এই বুভুক্ষা দ্বারা জড় জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। প্রাণ এখানে নিজেকে জড় পদার্থের ছাঁচে ঢালিয়াছে এবং জড় পদার্থ অনন্ত ভাবে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে এবং অনন্তভাবে আবার সমাহৃত বা সঙ্কলিত হইতে চাহিতেছে। অনন্ত ভাবে বিভজন এবং সঙ্কলনের এই দুই প্রবেগের মধ্য দিয়া জগতের সমস্ত জড় সত্তা গড়িয়া উঠিতেছে। ব্যষ্টিজীব বা জীবপরমাণু বাঁচিয়া থাকিতে এবং নিজেকে বৃহৎ করিতে চায়, ইহাই বাসনার পূর্ণ অর্থ; একবার বিভক্ত এবং ব্যষ্টিভাবাপন্ন হইয়া পড়িলেও সে যে সর্ব্বব্যাপী অনন্ত সে বোধ গোপনে তাহার অন্তরে রহিয়াছে, তাই দেহ মন প্রাণ ও মনুষ্যত্বের মধ্য দিয়া বৃহৎ হইবার, ক্রমশঃ বেশী করিয়া সকলকে আলিঙ্গন ও অধিকার করিবার, সকলকে নিজের মধ্যে মিলাইবার, আপন করিয়া লইবার, সর্ব্বব্যাপী অভিজ্ঞতা লাভ ও ভোগ করিবার মৌলিক ও অপরিহার্য্য আকৃতি ও আবেগের একটা অনির্ব্বাণ শিখা তাহার মধ্যে সতত জ্বলিতেছে। এই নিগূঢ় চৈতন্যকে জাগাইয়া এবং ফুটাইয়া তুলিবার প্রবেগ দিব্য বিশ্বপুরুষের নিকট হইতেই আসিয়াছে, ইহাই দেহধারী ব্যষ্টিজীবের নিকট উদগ্র কামনা রূপে দেখা দিয়াছে। প্রথমে প্রাণ ক্রমশঃ উপচিত, বর্দ্ধিত এবং প্রসারিত হইয়া এ আকৃতির চরিতার্থতা চাহিবে ইহা অপরিহার্য্য, ন্যায়সঙ্গত এবং মঙ্গলকর। জড় জগতে পরিবেশকে কবলিত করিয়া অপরকে এবং অপরের বিত্তকে আত্মসাৎ করিয়াই শুধু ইহা সম্ভব হইতে পারে। এই প্রয়োজনের মধ্যে বহুরূপী বুভুক্ষার সার্ব্বভৌম সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু যে ভক্ষণ করে তাহাকেও ভক্ষিত হইতে হয়, কারণ জগতে আছে অন্যোন্যবিনিময়, ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া, ঘাতও প্রতিঘাতের বিধান এবং তাই শক্তি যেখানে সীমিত, সেখানে অবশেষে ক্ষয়, পরাভব এবং ধ্বংস আসিয়া পড়িবে, ইহাই জড় জগতের বিধান।

অবচেতনার মধ্যে যাহা প্রাণের ক্ষুধারূপে ছিল, তাহাই সচেতন মনের মধ্যে আসিয়া উচ্চতর আকারে রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। প্রাণে যাহা কেবল

বুভুক্ষারূপে ছিল মনোময় জীবনে তাহা বাসনার আকৃতির এবং বুদ্ধিশাসিত জীবনে ইচ্ছার আবেগরূপ ধারণ করে। ব্যষ্টিজীব যতদিন পর্য্যন্ত পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়া অবশেষে নিজে নিজের প্রভু হইতে না পারে এবং অনন্তের সঙ্গে ক্রমশঃ অধিকতর মিলনের ফলে জগতের উপর অধিকার বিস্তারের সামর্থ্য না পায়, ততদিন পর্য্যন্ত বাসনার এ গতি ও ক্রিয়া থাকিবে এবং থাকাই উচিৎ। কামনার সাহায্যেই দিব্য প্রাণতত্ত্ব বিশ্বে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। জড়ত্ব বশতঃ কামনার অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিতে চাহিলে সেই দিব্য প্রাণতত্ত্বকেই অস্বীকার করা হয়, তাহা কিছু-না-হওয়ার ইচ্ছা বা অসতের অভিনিবেশ সুতরাং অবিদ্যা; কারণ অনন্ত হইয়া উঠা ছাড়া ব্যষ্টিভাব কেহ ত্যাগ করিতে পারে না। বাসনার তখনই খাঁটিভাবে পর্য্যবসান হইতে পারে যখন সম্প্রসারিত হইয়া তাহা অনন্তের বাসনায় পরিণত হয়, তখনই কামনা দিব্য-পরিপূর্ণতা এবং সর্ব্বাবগাহী অনন্ত আনন্দের মধ্যে নিজের পূর্ণ চরিতার্থতা খুঁজিয়া পায়। মধ্যবর্ত্তী সময়ে পরস্পরকে আহার করা যাহার প্রধান লক্ষণ সেই ধরণের প্রাণের স্থানে, পরস্পরের নিকট আত্মদান যাহার চিহ্ন এমন ধরণের প্রাণকে প্রতিষ্ঠিত করিবার পথে জীবকে অগ্রসর হইতে হয়, যে পথে ক্রমশঃ অধিকতর আনন্দের সহিত আত্মোৎসর্গ এবং অন্যোন্যবিনিময় হয় জীবনের ধর্ম্ম। ব্যষ্টিজীব তখন অন্য জীবের মধ্যে নিজেকে ঢালিয়া দিয়া তাহাদিগকে নিজের মধ্যে লাভকরে, নিম্নতর যেমন উচ্চতরের নিকট নিজেকে দান করে, উচ্চতরও তেমনি নিম্নতরের কাছে আপনাকে বিলাইয়া দেয় এবং এই ভাবে উভয়ই পূর্ণতা প্রাপ্তির পথে অগ্রসর হয়; মানুষ ভগবানের নিকট আত্মোৎসর্গ করে এবং ভগবান মানুষের কাছে আপনাকে দান করেন; ব্যষ্টির মধ্যে যে সর্ব্ব আছে সে বিশ্বের মধ্যস্থিত সর্ব্বের নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং দিব্য প্রতিদান স্বরূপ সমষ্টি ভাবের নিজ সত্তাকে পায় তাহার ব্যষ্টিসত্তার মধ্যে। এই ভাবে ক্রমশঃ বুভুক্ষার বিধি প্রেমের বিধিতে, ভেদের রীতি একত্বের রীতিতে, মৃত্যুর বিধান অমরত্বের বিধানে রূপান্তরিত হইয়া যায়। জগৎ জুড়িয়া যে বাসনা রহিয়াছে এই তাহার প্রয়োজন, এই তাহার সমর্থন, এই তাহার শেষ পরিণতি, এই তাহার আত্মসম্পূরণ।

যেমন সান্ত অমরত্ব বা অমৃতত্বের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা চায় বলিয়া প্রাণ

মৃত্যুর মুখোশ পরিধান করে, তদ্রূপ কালের পরম্পরা এবং দেশের প্রসারণের মধ্যে সান্তের ভূমিকায় ক্রমশঃ অধিকতর রূপে তাহার নিজ স্বরূপ সচ্চিদানন্দের অনন্ত আনন্দকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে সংবেগ আছে, তাহাই বাসনার রূপ ধারণ করে। প্রাণের অসামর্থ্য নামক তৃতীয় বিধানের জন্যই এই সংবেগের পক্ষে বাসনার এ মুখোশ পরিবার প্রয়োজন সাক্ষাৎ ভাবে ঘটিয়াছে। স্বরূপতঃ অনন্ত শক্তি হইয়াও প্রাণকে ফুটিতে হইতেছে সান্তের আধারে ও আকারে; তাই সান্ত ব্যষ্টিভাবের মধ্য দিয়া তাহার প্রকটনলীলাতে তাহার সর্ব্বশক্তিমত্তাকে অপরিহার্য্য রূপে দেখা দিতে এবং ক্রিয়া করিতে হয়, সীমিত শক্তি বা অংশতঃ শক্তিহীনতা রূপে; অথচ যতই দুর্ব্বলতা, ব্যর্থতা বা স্খলনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হউক না কেন, ব্যষ্টিজীবের প্রতি ক্রিয়ার পশ্চাতে অতিচেতন বা অবচেতন ভাবে সমগ্র সর্ব্বশক্তিমত্তার উপস্থিতি এবং আবেশ আছেই আছে; পশ্চাতে সর্ব্বশক্তিমত্তার এই আবেশ না থাকিলে বিশ্বে অতি সামান্য কোন গতি বা ক্রিয়াও হইতে পারে না, যে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রতিপদার্থে অতিমানস রূপে অনুস্যূত হইয়া আছে, তাহার শাসন এবং বিধানে প্রত্যেক ক্রিয়া, প্রত্যেক গতি বিশ্বকর্ম্মের সমষ্টির মধ্যে স্থাপিত ও বিধৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ব্যষ্টিপ্রাণের শক্তি তাহার নিজ-চৈতন্যের কাছে সীমিত এবং অসামর্থ্যপূর্ণ; কারণ তাহার পরিবেশের মধ্যে অন্য যে সমস্ত ব্যষ্টিপ্রাণশক্তি আছে তাহাদের সঙ্গে লড়াই করিয়া যে তাহাকে কাজ করিতে হয় কেবল তাহাই নহে, সমষ্টিগত অনন্ত প্রাণশক্তির সমগ্র ইচ্ছা এবং কর্ম্মধারার সহিত নিজের ইচ্ছা এবং কর্ম্মধারার যেখানে তৎক্ষণাৎ মিল না হয়, সেখানে সমষ্টি প্রাণের অধীনতা এবং অস্বীকৃতি তাহাকে মানিয়া চলিতে হয়। তাই ব্যষ্টি এবং খণ্ডিত জীবনে শক্তির সীমাবদ্ধতা বা অসামর্থ্য নামক এই তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান থাকে। পক্ষান্তরে প্রাণের আত্মপ্রসারণ এবং সকলকে অধিকার করিবার যে প্রবল আবেগ রহিয়াছে তাহা তাহার বর্ত্তমান শক্তি বা সামর্থ্যের অনুপাতে নিজেকে সীমিত বা পরিমিত করে না, অথবা করিবার উদ্দেশ্য রাখে না। এইভাবে পাওয়ার আবেগ এবং পাওয়ার শক্তির দারুণ বৈষম্য হইতেই কামনা জাত হয়। যদি এরূপ বিষম অনুপাত না থাকিত, শক্তি যদি তাহার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে তৎক্ষণাৎ পাইত, যদি সর্ব্বদাই তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত, তাহা হইলে বাসনা আসিত না,

ভগবদিচ্ছার মত আকৃতিহীন প্রশান্ত এবং স্বপ্রতিষ্ঠিত একটা ইচ্ছা মাত্র থাকিত।

অবিদ্যা হইতে মুক্ত মনের শক্তিই যদি ব্যষ্টি জীবের শক্তি হইত তবে এরূপ সীমা থাকিত না, বাসনার উৎপত্তির কোন প্রয়োজনও থাকিত না। কারণ যে মন অতিমানস হইতে বিযুক্ত হয় নাই, যে মনের আছে দিব্যজ্ঞান, সে মন প্রত্যেক ক্রিয়ার উদ্দেশ্য, প্রসার বা অধিকার এবং অপরিহার্য্য পরিণাম কি তাহা জানে; তাহা আকৃতি বা আয়াসে ক্ষুব্ধ বা চঞ্চল হয় না, কিম্বা যে উদ্দেশ্য সম্মুখে রহিয়াছে তাহা সিদ্ধির জন্য যতটুকু বা যে ভাবে প্রয়োজন তদনুসারে নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ শক্তি প্রয়োগ করে। যদি তাহার কর্ম্মের উদ্দেশ্য বর্ত্তমানকে ছাড়াইয়া যায়, এমন কি আশু সফলতার সম্ভাবনাহীন কর্ম্মও যদি তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়, তবু বাসনা বা সীমার সঙ্কোচ তাহাতে দেখা দেয় না। কারণ দৈবী ক্রিয়ার বিফলতাও সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমত্তার ইচ্ছাকৃত খেলা, কারণ বিশ্বের প্রতিকার্য্যের প্রারম্ভ, বিচিত্র অবস্থা পরিবর্ত্তন, আপাত ও চরম সফলতা কোথায় কখন কিভাবে ঘটিবে তাহা সমস্তই সে শক্তির জানা থাকে। দিব্য অতিমানসের সঙ্গে এক সুরে বাঁধা জ্ঞানময় মনও এই বিজ্ঞান এবং এই সর্ব্বনিয়ামিকা শক্তির অংশ গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি জগতে ব্যষ্টিভাবাপন্ন যে প্রাণশক্তি রহিয়াছে তাহা, যে মন তাহার নিজস্বরূপ অতিমানস জ্ঞান হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে সেই ভেদ ও ব্যষ্টি-ভাব আনয়নকারী অজ্ঞানী মনেরই বীর্য্য। তাই জীবনের সর্ব্ব সম্বন্ধের মধ্যে বিশ্ববিধানের স্বাভাবিক নিয়মেই অপরিহার্য্যরূপে অসামর্থ্য আসিয়া পড়িবার প্রয়োজন ঘটিয়াছে। কারণ অজ্ঞানে আচ্ছন্ন একটা শক্তি, সীমিত পরিবেশের মধ্যেও সর্ব্বশক্তিমত্তা লাভ করিবে, ইহা ভাবা যায় না। কারণ তাহা হইলে সে শক্তি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমত্তার দৈবীক্রিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া বিশ্বের ঋতময় উদ্দেশ্য ও বিধানকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতে পারে—তাহা হইলে বিশ্বব্যাপারে একটা অসম্ভব অবস্থার সৃষ্টি হয়। সুতরাং সহজাত এবং অবচেতন অথবা সচেতন বাসনার আবেগের দ্বারা পরিচালিত হইয়া এই সমস্ত সীমিত শক্তি পরস্পরের সহিত দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে প্রবৃত্ত হইবে এবং সেই সংঘাতের ফলে তাহাদের পোষণ ও পুষ্টি হইবে ইহাই জীবনের প্রথম বিধান। বাসনার

রীতি ও পদ্ধতি যেরূপ, এ দ্বন্দ্ব ও সংঘাতেরও তাই। এ দ্বন্দ্বকেও উন্নীত হইয়া এমন অবস্থায় পৌছিতে হইবে যাহাতে ইহা পরস্পরের সাহায্যকারী একটী শক্তিপরীক্ষা হইয়া দাঁড়াইবে, এমন হইবে যেন ইহা আত্মীয় শক্তি সমূহের একটা মল্লযুদ্ধ মাত্র, যাহার ফলে জয়ী এবং পরাজিত অথবা বরং যাহা ক্রিয়া দ্বারা উপর হইতে প্রভাব বিস্তার করে এবং যাহা প্রতিক্রিয়া দ্বারা নিম্ন হইতে প্রভাবিত হয়, এ উভয়ই সমভাবে লাভবান হয়, উভয়েরই পুষ্টি সাধিত হয়। পরিণামে এ দ্বন্দ্ব ভাগবদ্ ভাবের একটা আনন্দ বিনিময়ের উচ্ছ্বাসে রূপান্তরিত হয়, সংঘাতের বিক্ষোভ পরিণত হয় প্রেমের নিবিড় আলিঙ্গনে। তবু দ্বন্দ্ব ও সংঘাত প্রাণের বিজয় যাত্রার পথে প্রয়োজনীয় এবং মঙ্গলময় আরম্ভ। মৃত্যু, বাসনা এবং সংঘাত খণ্ডিত জীবনের এই তিনটী, বিশ্বরচনাতে দিব্য প্রাণতত্ত্বের আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রথমে গৃহীত তিনটী মুখোশ।

একবিংশ অধ্যায়

প্রাণের ঊর্দ্ধায়ণ

বাক্ বা বাণীর পথ দেবগণের নিকট লইয়া চলুক, চলুক অপ্‌গণের দিকে মনের ক্রিয়ার আশ্রয়ে।......হে শিখা, তুমি স্বর্গ-সমুদ্রে, দেবতাগণের দিকে চলিয়াছ। তুমি নানা জগৎবাসী দেবতাদের সম্মিলিত কর, সম্মিলিত কর সূর্য্যের উপর অবস্থিত আলোকরাজ্যে এবং অবরলোকে যে সমস্ত অপ্‌ বাস করে তাহাদের।

ঋগ্বেদ (১০।৩০।১ ; ৩।২২।৩)

আনন্দের অধীশ্বর তৃতীয় ধাম জয় করেন; বিরাটের আত্মধারা অনুসারে তিনি সব নির্দ্ধারণ করেন। শ্যেনের মত শকুনীর মত তিনি আধারে অধিষ্ঠিত হন, তাহাকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরেন; আলোকের আবিষ্কারক তিনি চতুর্থ বা তুরীয় ধাম প্রকাশ করেন; সেই সমস্ত জলধারায় তরঙ্গিত সমুদ্রে তিনি সংসক্ত হইয়া থাকেন।

ঋগ্বেদ (৯।৯৬।১৮, ১৯)

বিষ্ণু ত্রিধা পদক্ষেপ করিলেন—আদিম ধূলিজাল হইতে তুলিয়া তাহার পদ স্থাপন করিলেন; তিন সোপানে তিনি পদক্ষেপ করিয়াছেন; তিনি রক্ষক তিনি অজেয়, ওপার হইতে তিনি তাহাদের বিধান ধারণ করিয়া আছেন; বিষ্ণুর ক্রিয়া চাহিয়া দেখ, দেখ কোথা হইতে তিনি তাহাদের বিধানসমূহ প্রকাশ করেন; সূরিগণ সেই বিষ্ণুর পরম পদ, আকাশে বিস্তৃত চক্ষুর মত সর্ব্বদা দেখেন, জাগ্রত বিপ্রেরা তাহাকে উজ্জ্বল অগ্নিশিখারূপে প্রজ্জ্বলিত করেন—বিষ্ণুর সেই পরম পদকে।

ঋগ্বেদ (১।২২।১৭-২১)

আমরা দেখিয়াছি যে সীমা, অজ্ঞানতা এবং দ্বৈতবোধ যাহা হইতে জাত হইয়াছে সেই খণ্ডিত মর্ত্ত্য মন, জ্যোতির্ম্ময় দিব্য চৈতন্যস্বরূপ অতিমানসের অন্ধকারময় প্রতিমূর্ত্তি, সেই চৈতন্য যে ক্রিয়াধারায় তাহার নিজেকে যেন হারাইয়া ফেলিয়া বিশ্বরূপে প্রকট হইয়াছে, মন তাহার প্রথম অভিব্যক্তি। ঠিক তেমনি এই জড়বিশ্বে মৃত্যু, বাসনা এবং অসামর্থ্যের জনক যে প্রাণ, জড়ের কারাগারে বদ্ধ ও নিমজ্জিত অবচেতন বিভাজক মনের এক বীর্য্যরূপে উদ্ভূত হইয়াছে সে প্রাণ অমৃতত্ব, নিত্য-তৃপ্ত-আনন্দ এবং সর্ব্বশক্তিমত্তা যাহার স্বরূপ সেই অতিচেতন দিব্য মহাশক্তির অন্ধকারময় প্রতিমূর্ত্তি। এই সম্বন্ধের দ্বারা আমরা যাহার অংশ সেই বিরাট বিশ্বলীলার প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট এবং আমাদের ক্রম-পরিণামের আদ্য, মধ্য এবং শেষ অবস্থা নিরূপিত হয়। প্রাণের প্রথম অবস্থায় দেখি তাহা বহুধা বিভক্ত, সেখানে জড়শক্তিচালিত একটা অবচেতন ইচ্ছা আছে বটে কিন্তু তাহাকে ইচ্ছারূপে প্রতীত হইতেছে না, তাহা যেন জড়শক্তিরই একটা অন্ধ আবেগ; রূপ ও তাহার পরিবেশের যে অন্যোন্যবিনিময় চলিতেছে তাহাতে পরিচালক জড়শক্তির নিকট প্রাণ যেন নির্বীর্য্য এবং অসাড়ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। জড়বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে এই জড় জগতের যে রূপ ফোটে, তাহাতে এই নিশ্চেতন, অন্ধ অথচ প্রবল শক্তির খেলা চলিতেছে এবং মূলতঃ এই খেলাই সমস্ত বিশ্বসত্তাতে বিস্তৃত ও অনুস্যূত রহিয়াছে ইহা তাহার বোধ হয়, ইহাই অন্নময় চেতনা এবং জড়ময় প্রাণের প্রতিষ্ঠিত রূপ। প্রাণ এই আধারের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া সচেতন মনের দিকে যতই অগ্রসর হইতে থাকে ততই তাহার মধ্যে অভিনব ভাব জাগিতে থাকে এবং একটা নূতন স্থিতি দেখা দেয়; ইহাই প্রাণের মধ্য অবস্থা যেখানে মৃত্যু, পরস্পরকে ভক্ষণ, ক্ষুধা এবং সচেতন কামনার ক্রিয়া দেখা দেয়, সংকীর্ণ সীমা এবং সামর্থ্যের জন্য একটা পীড়াবোধ উপস্থিত হয় এবং নিজেকে বাড়াইয়া তুলিবার, প্রসারিত করিবার, অপরকে জয় ও অধিকার করিবার একটা প্রবল প্রচেষ্টা জাগে। ডারউইনএর (Darwin) অভিব্যক্তিবাদে যে জ্ঞানের সঙ্গে মানুষের প্রথম স্পষ্ট পরিচয় হইয়াছে তাহাতে দেখি মৃত্যু, কামনা এবং বিরোধ বা সংগ্রামের ভিত্তিতেই সে মতবাদ গঠিত হইয়াছে। মৃত্যুরূপ যে ঘটনা ঘটে তাহাতেও বাঁচিয়া থাকিবার একটা ক্ষুব্ধ প্রয়াস বর্ত্তমান থাকে কেননা মৃত্যু প্রাণেরই নেতি বা অভাবাত্মক

রূপ যাহার পশ্চাতে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া প্রাণ তাহার ইতিবাচক সত্তা বা ভাবাত্মকরূপকে (positive beingকে) অমৃতত্ব খুঁজিবার জন্য উদ্‌বুদ্ধ করে। ক্ষুধা এবং বাসনার মধ্যেও নিরাপদ তৃপ্তি ও আনন্দের অবস্থায় পৌছিবার জন্য একটা সংগ্রাম চলে, কারণ কামনার উত্তেজনা দ্বারা প্রাণ তাহার ইতি সত্তাকে প্রলুব্ধ করে, যাহাতে অতৃপ্ত বুভুক্ষার নেতিরূপ হইতে মুক্ত হইয়া তাহার অস্তিত্বের পূর্ণ আনন্দ সে লাভ ও ভোগ করিতে পারে। তেমনি তাহার সামর্থ্যের সীমা ও সঙ্কোচের মধ্যেও প্রসারতা, প্রভুত্ব, আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং পরিবেশকে জয় ও ভোগের দিকে একটা দুর্দ্দম প্রচেষ্টা আছে, কেননা প্রাণশক্তির এই সীমা ও দৈন্য হইতেছে সেই নেতিরূপ, যাহা দ্বারা তাহার ইতিসত্তাকে, পূর্ণতা লাভের যে শাশ্বত সম্ভাবনা ও সামর্থ্য তাহার মধ্যে আছে, তাহা লাভের জন্য প্রবুদ্ধ করে। জীবন সংগ্রাম শুধু বাঁচিয়া থাকিবার সংগ্রাম নয়; তাহা অধিকার ও পূর্ণতা লাভের সংগ্রামও বটে ; যেহেতু পরিবেশের উপর অল্প বিস্তর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াই বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হয়, তাহার জন্য হয় নিজে পরিবেশের উপযোগী হইতে হয় অথবা পরিবেশকে নিজের উপযোগী করিয়া লইতে হয়; এ জন্য পরিবেশকে স্বীকার করিতে এবং তাহার অনুগত হইতে হয় অথবা তাহাকে জয় ও পরিবর্ত্তন করিতে হয়। একথা ঠিক তেমনি সত্য যে পূর্ণতা যত বেশী লাভ হইবে তত অধিক কাল বাঁচিয়া থাকিবার নিশ্চয়তা বাড়িয়া যাইবে। 'যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন' (survival of the fittest) এই সূত্রে ডারউইন এই সত্যই প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন।

কিন্তু বৈজ্ঞানিকমন জড় সত্তার যান্ত্রিক ক্রিয়াধারা প্রাণের উপর আরোপ করিতে এবং জড়ের মধ্যে লুক্কায়িত যান্ত্রিক চেতনা দিয়া প্রাণকে বুঝিতে চাহিল, দেখিল না যে একটী নূতন তত্ত্ব প্রাণের মধ্যে উন্মিষিত হইতেছে, যাহার সার্থকতা যান্ত্রিকভাবকে স্ববশে আনয়ন করা। সেইজন্য ডারউইনের সূত্রে জীবনের আক্রমণশীল তত্ত্বকে, ব্যষ্টিপ্রাণের স্বার্থপরতাকে, আত্মরক্ষার সহজাত সংস্কার ও প্রণালীকে এবং অপরকে আত্মসাৎ করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার প্রবৃত্তিকে অত্যন্ত বড় করিয়া দেখা হইয়াছে। কারণ জীবনের এই প্রথম দুইটী পর্ব্বের মধ্যে একটী নূতন তত্ত্ব বা নূতন অবস্থার বীজ রহিয়াছে, যাহা অঙ্কুরিত এবং ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়, যখন এবং যতটুকু পরিমাণে জড়ের মধ্যে সংবৃত মন, প্রাণধর্ম্মের মধ্য